তারুণ্যের আত্মপাঠ ও সমাজচিন্তা

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

সূচীপত্র

তারুণ্যের
আত্মপাঠ ও সমাজচিন্তা

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

তারুণ্যের আত্মপাঠ ও সমাজচিন্তা

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

محاسبة نفسية للشباب وأفكارهم الاجتماعية

تأليف: الدكتور أحمد عبد الله ثاقب

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-১৫০
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০
E-mail : tahreek@ymail.com
www.hadeethfoundationbd.com

১ম প্রকাশ

ফেব্রুয়ারী ২০২৩ খৃ.

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

মুদ্রণ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য

১২০ (একশত বিশ) টাকা মাত্র

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

জীবনটাকে গড়তে হবে	১১
জীবন এক নিরন্তর পরীক্ষা	১৭
লক্ষ্যপূর্ণ জীবন	২০
নৈতিক দৃঢ়তা	২৫
ইতিবাচকতা	২৮
ক্যারিয়ার ভাবনা	৩২
কিসের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত আমরা!	৩৬
অর্থ-বিত্ত নয়, আমাদের সম্বল ঈমান ও সৎআমল	৪০
ইসলামী মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির চর্চা	৪৩
ফিৎনা থেকে আত্মরক্ষা	৪৬
চোখের হেফাযত	৫১
চিন্তার মানহাজ	৫৫
মতভেদ নিরসন	৬০
তারুণ্যের আখলাকী নৈরাজ্য	৬৬
হতাশার দহন থেকে মুক্তি	৭৩
ঝরাপাতা জীবন ও মৃত্যুর অমোঘ বাস্তবতা	৮১
একজন দাঈ ইলাল্লাহ ডা. আব্দুর রহমান আস-সুমাইত্বের কথা	৮৫
দ্বীনের পথে আমূল পরিবর্তিত এক পথিক আলী বানাত	৮৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

আয়া সোফিয়ায় আযানের সুর... ৯৩
ইসলামী রাজনীতির গতি-প্রকৃতি ৯৬
সংঘবদ্ধ জীবন রহমতের জীবন ১০১
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সংগঠন বিরোধিতা ১০৪
সমাজ সংস্কার ও আমাদের সংগ্রাম ১০৯
যেতে হবে বহুদূর! ১১২
অহি-র আলোয় উদ্ভাসিত হোক বাংলার প্রতিটি ঘর ১১৫
বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কবে হবে প্রকৃত বিদ্যার আলয়? ১১৮
করোনাকাল আমাদের কী শেখালো? ১২২
নারীর প্রতি অশুভ দৃষ্টিভঙ্গি ১২৯
নাস্তিকতার ভয়ংকর ছোবল ১৩৩
আত্মপীড়িত তারুণ্য ও জঙ্গীবাদ ১৩৯
ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ১৪৩
ইসলামী বিচার ব্যবস্থার যৌক্তিকতা ১৪৭
মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ১৫৫
মূর্তি ও ভাস্কর্য সংস্কৃতি ১৬২
রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অব্যক্ত কান্না ও বিশ্ব সমাজের দায় ১৬৬
কিছু প্রশ্নোত্তর ১৬৯

ভূমিকা

বয়সের সাথে সাথে চোখের সামনে থেকে আমাদের চেনা পৃথিবীটার পরিবর্তন হতে থাকে। জন্মের পর যাদের দেখেছিলাম, যাদের সাথে ছিল নিত্য আলাপন, চলাফেরা, লেনদেন; একটা সময়ের পর তাদেরকে একে একে বিগত হতে দেখি। মনে হয় চোখের সামনে থেকে গোটা এক পৃথিবী যেন ধীরে ধীরে অপসৃয়মান। যেন জীবন্ত বায়োস্কোপ। ক্ষণকাল পূর্বে যাদেরকে যৌবনের ঋজুতা, সৌন্দর্য, বলিষ্ঠতা নিয়ে চলতে-ফিরতে দেখেছি তারা এখন সময়ের ফেরে বিগত-যৌবন। সাদা চুল-দাড়িগুলো জানান দিচ্ছে বিদায়ের বার্তা। রোগ-শোক-জরায় পরিপাটি জীবনটা হয়েছে কেমন এক ছন্নছাড়া, উদ্দেশহীন।

এভাবেই একদিন আমাদেরও ব্যস্ত সময়গুলো চলে যাবে। জীবনের প্রেক্ষাপটে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে থাকব আমরা। স্বেচ্ছাবন্দিত্ব মেনে নিয়ে বার্ধক্যজরার বদ্ধ জলাশয়ে দুলবে অসহায় কালের খেয়া। তারপর নির্ধারিত ক্ষণে হয়তবা কোন এক বৃষ্টিমুখর বিহানে কিংবা বিষণ্ন সাঁঝবেলায় বিদায় নেব চিরদিনের মত। অন্তিমযাত্রার অগ্রভাগে, শ্বেত-শুভ্র কাফনে সুশোভিত হয়ে। কোলাহল মুখর পৃথিবী ছেড়ে ঠাঁই নেব শুনশান ঘোর আঁধার মাটির বিছানায়। আহারে জীবন!

প্রশ্ন হ'ল, কেন এই যাওয়া-আসা? কেন এই ক্ষণকালের জীবন? এর লক্ষ্য কী? এর ফলাফল কী? এথেকে আমাদের চাওয়া-পাওয়া কী? কোথায় আমাদের আখেরী মনযিল? আমাদের প্রজন্মের বড় অংশের কাছেই এই প্রশ্নগুলো বড়ই অস্বস্তিকর, এমনকি ভীষণ অপ্রয়োজনীয়ও বটে। কেননা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা আমাদেরকে এমনভাবে বস্তুবাদী চিন্তাধারায় অভ্যস্ত করে তুলেছে যে জীবনের এই অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতা নিয়ে ভাববার দু'দণ্ড অবসর আমাদের নেই। নিদেনপক্ষে এই জীবনের পর আর কোন জীবন আছে কিনা, নিখিল বিশ্বজাহানের স্রষ্টা আদতেই আছেন কিনা- এমন মৌলিক প্রশ্নেই এই প্রজন্মের বিরাট একটি অংশ সংশয়ের দোলাচলে (!)। এভাবেই গোলকধাঁধার মধ্যে গড়ে উঠছে তাদের মানসগঠনের এই প্রারম্ভিককাল। বস্তুতান্ত্রিক লেখাপড়া, অর্থোপার্জন, বিনোদন, আমোদ-প্রমোদ আর হাযারো ঘাত-প্রতিঘাত নিয়ে নিদারুণ ব্যস্ততায় ভরা তাদের জীবন। পিছু ফিরে তাকাবার যেন ফুরসৎ নেই এক মুহূর্তও।

শৈশব ও কৈশরের অনিশ্চয়তাপূর্ণ ধাপ পেরিয়ে আজ যারা তারুণ্যের প্রতিনিধি, যাদের বয়স ১৬ থেকে ৩০, তাদের মনস্তাত্ত্বিক গঠন আগামীর পৃথিবী গড়ার পথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। কেননা মধ্যবয়স ও প্রৌঢ়ত্বকালের পূর্বে জীবনের এটাই সেরা সময়। জীবনকে পূর্ণতার পথে নিতে এই সময়ের সিদ্ধান্তগুলোই সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তারুণ্যের এই সময়গুলো আবার ষোল-আঠারো, আঠারো-পঁচিশ, পঁচিশ-ত্রিশ বছর পর্যন্ত কয়েকটি বয়সসীমায় বিভক্ত। এর প্রতিটি ধাপে বড় বড় পরিবর্তনের মুখোমুখি হয় আমাদের জীবন। আবেগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, মনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, পরিবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ইত্যাকার হাযারো জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে সুগঠিত হয় আমাদের মনোজাগতিক সাম্রাজ্য। এই সময়টাই সাধারণত নির্ধারণ করে দেয় আমাদের জীবনের গতিপথ। মরীচিকাময় বস্তুবাদী দুনিয়া নাকি চিরবাস্তব আখেরাত- কোনটি সামনে রেখে আমাদের জীবন পরিচালিত হবে- তা মীমাংসা করে নেয়ার সময় এটাই।

আলোচ্য বইটি এই প্রজন্মের সেসব তরুণ মন ও মননের খোরাক হতে পারে, যারা স্বপ্ন দেখে নিজের জীবনটাকে স্রষ্টার সমীপে পরিপূর্ণ উৎসর্গ করে দেওয়ার। যারা স্বপ্ন দেখে পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, সঙ্গী-সাথী সবাইকে নিয়ে মহান প্রভুর প্রদর্শিত চিরকল্যাণময় পথে চলার। যারা স্বপ্ন দেখে এমন এক প্রজন্ম গড়ার, যারা গড়ে উঠবে মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যৎ কর্ণধার রূপে। যারা স্বপ্ন দেখে পার্থিব জীবনসফর শেষে অনন্তজীবনের প্রথম ধাপে সৎআমলের আলোয় আলোকিত এক জান্নাতী সুবাস ভরা আশ্রয়ের। যারা স্বপ্ন দেখে ফলাফল দিবসের কঠিনতম মুহূর্তে চিরকাংখিত সেই মহা আহ্বান শোনার- 'হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি ফিরে যাও তোমার প্রভুর পানে, সন্তুষ্টচিত্তে ও সন্তোষভাজন হয়ে; তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর'। যারা স্বপ্ন দেখে জান্নাতুল ফেরদাউসের অকল্পনীয় নে'মতরাজির বাগিচায় প্রিয় মানুষদের সাথে একত্রে ভীষণ আনন্দমুখর অনন্ত জীবনের। সেই স্বপ্নবিভোর তরুণদের সাথী হয়ে পথচলার প্রেরণাই এই বইয়ের জন্মকথা।

মাসিক **'আত-তাহরীক'** ও দ্বি-মাসিক **'তাওহীদের ডাক'** পত্রিকায় অনেকদিন ধরেই সমসাময়িক নানা ঘটনা ও চিন্তাধারাকে উপজীব্য করে লেখালেখি করা হয়। কিন্তু সেগুলো যে কখনও মলাটবদ্ধ হতে পারে সে রকম ভাবনা কখনই ছিল না। আজ এই শুভ মুহূর্তে তাই গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রিয় ছোটভাই ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব ও আব্দুন নূরের প্রতি, যাদের ঐকান্তিক ইচ্ছাই এই প্রেক্ষাপট তৈরী করে দিয়েছে। হঠাৎই মনে পড়ছে আমার একান্ত শ্রদ্ধাভাজন মিসরীয় শিক্ষক এবং বর্তমানে মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আসইউত্ব শাখার আরবী ভাষা বিভাগের ডীন ড. রিফআ'ত আলী মুহাম্মাদের কথা, যিনি আমাদের বালাগাত (আরবী ভাষার অলংকার শাস্ত্র) বিষয়ে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে পাঠদান করতেন। আজও তার সেই কাব্যিক বর্ণনাভঙ্গি আমার কানে বাজে। ২০১৭ সালের কোন একদিন কোর্সের সর্বশেষ ক্লাস হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ইসলামাবাদের শরী'আহ ফ্যাকাল্টির সেমিনার কক্ষে।

ক্লাস শেষে আমাদের কয়েকজনের সাথে কথা বলছিলেন উস্তায। কি এক কথার ফাঁকে সহসা আমার দিকে না তাকিয়েই স্বগতোক্তির মত বললেন, الشيخ ثاقب سوف يكتب كتابا في الزهد والرقائق (ছাকিব অচিরেই দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা বিষয়ক একটি বই লিখবে)। তারপর অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। আমি হতচকিত হয়ে তাকিয়ে থাকলাম উস্তাযের দিকে। কিছু বলতে পারলাম না। শুধু ভাবলাম- কেন হঠাৎ এমন কথা বললেন উস্তায? তিনি তো জানেন না আমি লেখালেখি করি। মনে হ'ল, যাইহোক এ বিষয়ে লিখতে তো আমার আপত্তি নেই। আজ ছয় বছর পর এই বইটির প্রকাশকালে অনুভব করছি এ যেন উস্তাযের সেই অবচেতন বার্তা এবং দোআ'রই ফসল। আজও জানি না তিনি হঠাৎ কি মনে করে কথাটি বলেছিলেন। আমাদের জীবনে এমন অনেক বিস্ময়কর ঘটনাই ঘটে, যার কারণগুলো অব্যাখ্যাতই রয়ে যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন! আমীন!

বইটি প্রকাশে যারা যতটুকু সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা। বিশেষ করে নিত্য শুভার্থী ড. নূরুল ইসলাম, তাওহীদের ডাক পত্রিকার সহকর্মী ড. মুখতারুল ইসলাম, আসাদুল্লাহ আল-গালিবসহ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মী ভাইদের সহযোগিতা ও উৎসাহ সবসময় পেয়েছি। একান্ত আত্মজন শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতা, সুপ্রিয় ভাই-বোন, সহধর্মীনী ও আত্মীয়-স্বজনসহ দেশ-বিদেশের বহু প্রীতিভাজন গুরুজন, বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্খীকে সর্বদা সুপাঠক হিসাবে পাশে পেয়েছি। বিশেষ করে গাইবান্ধার নূরুল ইসলাম প্রধান চাচা, সাতক্ষীরার প্রফেসর নযরুল ইসলাম দাদা, হাজী আব্দুর রহমান চাচা প্রমুখদের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসার কোন প্রতিদান আমার জানা নেই। তাদের শুভকামনা ও দো'আ আমাকে সবসময় উজ্জীবিত করেছে। আজকের এই লগ্নে তাঁদের সকলের প্রতি রইল আমার পরম শ্রদ্ধা ও বিনম্র ভালোবাসা। এই বইটি যদি একজন পাঠকেরও উপকারে আসে, তবুও অকিঞ্চন লেখক হিসাবে নিজেকে কৃতার্থ মনে করব। আল্লাহ আমাদের সকলকে পার্থিব জীবনযুদ্ধের এই কঠিন ময়দানে সত্যকে জানা ও যথার্থভাবে মানার তাওফীক দান করুন। আমাদের ভুল-ত্রুটি মাফ করে দিন। রোজ হাশরের কঠিনতম ময়দানে আমাদের সবাইকে তাঁর সফল বান্দাদের কাতারভুক্ত করুন এবং তাঁর জান্নাতুল ফেরদাউসের কল্পনাতীত নে'মত সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

বিনীত
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
নওদাপাড়া, রাজশাহী
২১.০২.২০২৩ইং

উ ৎ স র্গ

পরম শ্রদ্ধেয় দাদা-দাদী ও নানা-নানীর প্রতি
জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে
যাদের ছাপ বহন করে চলেছি-

সেই সকল তরুণ ও যুবকের প্রতি
বাংলার আনাচে-কানাচে যাদের দৃপ্ত পদক্ষেপে
উৎখাত হয়েছে শিরক-বিদ'আতের কালো অমানিশা-
তাওহীদ ও সুন্নাহ্‌র রাজ পতাকাতলে
জান্নাতুল ফেরদাউসের পানে
নিরন্তর যাদের ছুটে চলা-

প্রথম অধ্যায়

আল্লাহ বলেন,

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ-

‘তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য।’

-আলে ইমরান ৩/১৩৩।

জীবনটাকে গড়তে হবে

দিন যায়, দিন আসে। স্বপ্নবিভোর মানুষ আপন গতিতে ছুটতে থাকে। অধরা জাগতিক স্বপ্নের পেছনে। ধোঁকাময় দুনিয়ার পিছনে। অন্যের সাথে লিপ্ত হয় হাস্যকর প্রতিযোগিতায়। পদ কিংবা সম্পদের। স্বার্থ কিংবা সুনামের। অর্থহীন কাজে আর খেল-তামাশায় ভীষণভাবে অপচয় করতে থাকে 'সময়' নামক মহামূল্যবান সম্পদ। ভুলে যায় তার আসল স্বপ্নের কথা। চিরন্তন গন্তব্যের কথা। ভুলে যায় জান্নাতের অফুরন্ত নে'মতের কথা, জাহান্নামের কল্পনাতীত শাস্তির কথা। এই আত্মভোলা মানুষকে সচকিত করতেই যেন মহান আল্লাহ্র দরদী সতর্কবার্তা- হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেকেরই ভেবে দেখা উচিৎ যে, সে আগামীকালের জন্য কী অগ্রিম পাঠিয়েছে। ...আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ্কে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহ্র তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন। তারাই হ'ল পাপাচারী *(হাশর ১৮-১৯)*। এই ভীষণ প্রতারণামুখর জগৎটাকে তিনি এক লাইনে সংজ্ঞায়িত করে বলেন- 'তোমরা জেনে রেখ যে, পৃথিবীর জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্ব প্রকাশ আর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়' *(হাদীদ ২০)*।

মূলতঃ পৃথিবীর এই জীবনের দু'টি রূপ। একটি তার দৃশ্যমান কিন্তু ধোঁকাময় রূপ। অপরটি অদৃশ্য কিন্তু বাস্তব রূপ। পর্দার সামনে বসে থাকা দর্শক যেমন জানে না পর্দার পিছনে কি হচ্ছে, তেমনি দুনিয়াবী নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা মানুষগুলো বোঝে না পৃথিবীর এই রঙ্গমঞ্চের পিছনে অলক্ষ্যে কী ঘটছে। যদিও সে নিজেকে বড়ই বুদ্ধিমান ভাবে। অতঃপর একদিন যখন সময় ঘনিয়ে আসবে, চোখটা বন্ধ হওয়া মাত্রই মুহূর্তে সে সবকিছু বুঝে ফেলবে। চোখের সামনে থেকে মরীচিকার পর্দা যেদিন উন্মুক্ত হয়ে যাবে, সবকিছুর বাস্তবতা যখন সে স্বচক্ষে দেখবে, তখন তার হতবুদ্ধি চেহারার দিকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলবেন, 'তুমি তো এই দিবস সম্পর্কে উদাসীন ছিলে, এখন তোমার সামনে থেকে পর্দা উঠিয়ে নিয়েছি। সুতরাং এখন তোমার দৃষ্টিতে সবকিছু পরিষ্কার' *(ক্বাফ ২২)*।

প্রিয় পাঠক, আমাদের এই পার্থিব জীবনটা নিরেট পরীক্ষার জীবন। এই পরীক্ষার সিলেবাস, পাঠ্যক্রম সবার জন্য একই। প্রশ্ন ও উত্তরপত্রও একই। হিন্দু হোক, খ্রীষ্টান হোক, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবাই আমরা একই পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থী। একজন সচেতন পরীক্ষার্থী যেমন সতর্কতার সাথে তার পরীক্ষার সিলেবাস সবচেয়ে সঠিক উপায়ে এবং যথাযথভাবে পূরণ করার জন্য সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালায়, হাযারো পরিকল্পনা সাজায়; ঠিক তেমনিভাবে একজন সচেতন মুসলিমকে নিজের জীবন পরীক্ষায় ভালোভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়ে নিজেকে তৈরী করতে হয়, গড়ে তুলতে হয়।

সুতরাং আমরা যারা সচেতন, যারা জীবনের প্রকৃত মূল্য অনুধাবন করি, তাদেরকে অবশ্যই আপন আপন জীবনকে সাজাতে হবে এই মহাপরীক্ষাকে কেন্দ্র করেই। যার কাছে এই জীবনপরীক্ষার গুরুত্ব যত বেশী, তার প্রস্তুতিও তত বেশী এবং তার অর্থহীন কর্ম ও সময়ের অপচয়ও তত কম। সে সর্বদা নিজেকে সে পথেই পরিচালনা করতে চায়, যেখানে সে নিজেকে আগামীতে দেখতে চায়।

এক্ষণে জানা আবশ্যক যে, কিভাবে আমরা এই প্রস্তুতি গ্রহণ করব? কিভাবে পরিকল্পনামাফিক জীবনটাকে সাজিয়ে তুলব? এর উপকরণগুলো কী হবে? হ্যাঁ, এই প্রস্তুতির উপকরণ ও সিলেবাসের প্রাপ্তি আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। এমনকি এর জন্য পবিত্র কুরআনের বড় অংশ অধ্যয়নেরও প্রয়োজন হবে না। কেননা অত্যন্ত সংক্ষেপে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা কুরআনের অন্যতম সংক্ষিপ্ত সূরা আল-আছর-এই উল্লেখ করেছেন। যা নিম্নরূপ-

(১) এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান আনা : জীবনটাকে গড়তে হ'লে আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য জীবনের মূল লক্ষ্য তথা গন্তব্য নির্ধারণ করা। কারণ এই গন্তব্যের শুদ্ধতাই আমাদের চলার পথের শুদ্ধতা নির্ণয় করে। গন্তব্য যদি ভুল হয়, তাহলে বাকী সবকিছুই ভ্রান্ত হয়ে যায়। এটাই হ'ল ছিরাতুল মুস্তাকীমের পথ, যার মূল উপজীব্য হ'ল, নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদা- যাতে এক আল্লাহ্‌র প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ থাকে এবং তাঁর ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকে। এই দর্শনের মূল কথা হ'ল- আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি, একমাত্র আপনার কাছেই সাহায্য চাই। এই দর্শনের মূল রস হ'ল- সবকিছু কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই হবে, যার নাম ইখলাছ। এই দর্শন মোতাবেক চলার পথ হ'ল- রিসালাত ও আখেরাত। রিসালাত হ'ল ছিরাতুল মুস্তাকীমের পথ আর গন্তব্য হ'ল আখেরাত। এই

তাওহীদ-রিসালাত-আখেরাত দর্শনই আমাদের জীবন গড়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক উপাদান। অত্যন্ত ভয়ংকর ব্যাপার যে, বিশ্বজাহানের সামান্য গুটি কয়েক মানুষ ব্যতীত বাকি সকলেই জীবন পরীক্ষার এই পয়লা সবকটি সম্পর্কে হয় বেখবর, নয়তো উদাসীন। অথচ এই জ্ঞান না থাকলে কোন অবস্থাতেই জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ নেই। এজন্য আল্লাহ বলেন, 'অতএব তুমি জেনে নাও, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই' *(মুহাম্মাদ ১৯)*। যাদের এই জ্ঞান নেই তাদেরকে আল্লাহ চতুষ্পদ জন্তুর সাথে তুলনা করে বলেন, 'আমরা বহু জিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে তা দ্বারা তারা দেখে না, আর তাদের কান আছে তা দ্বারা তারা শুনে না; তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তার চেয়েও বেশী বিভ্রান্ত। তারাই হ'ল উদাসীন' *(আল-আ'রাফ ১৭৯)*। চতুষ্পদ জন্তুর সাথে তুলনার কারণ হ'ল- একটি গরুকেও যদি লাঠিপেটা করা হয়, সে লাঠির দিকে নয়; বরং লাঠি বহনকারী লোকটির দিকে তেড়ে যায়। কারণ সেও জানে লাঠির মত জড়বস্তুর কোন ক্ষমতা নেই। অথচ একশ্রেণীর উদাসীন মানুষ জড় পৃথিবীর যিনি সৃষ্টিকারী, পরিচালনাকারী- তাকেই চেনে না। বরং তাঁর সৃষ্টবস্তুসমূহকে ক্ষমতাধর কল্পনা করে পুজা করে, অনুসরণ করে। সুতরাং শিরকমুক্ত বিশুদ্ধ ঈমান জীবনে সফলতা অর্জনের প্রথম পাঠ।

(২) সৎআমল করা : যা কিছু আল্লাহ করতে বলেছেন, তা করা; যা থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকার নামই সৎআমল। আল্লাহ কি করতে বলেছেন-না বলেছেন তা জানার জন্য অপরিহার্য হ'ল দলীল। আর সেই দলীল হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর আনীত দু'টি মৌলিক বস্তু- (১) পবিত্র কুরআন ও (২) ছহীহ হাদীছ। আবার এই দলীল অনুসরণের মানদণ্ড হ'ল- রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীদের তরীকা বা অনুসৃত পথ, যাকে বলা হয় সালাফে ছালেহীনের মানহাজ। অর্থাৎ ছাহাবীরা কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে যেভাবে বুঝেছিলেন, সেভাবে বোঝা। তাদের বুঝের বিপরীত কোন বুঝ ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। কোন আমল তখনই সৎআমল হিসাবে গণ্য হবে যখন তা উপরোক্ত মানদণ্ডসমূহে উত্তীর্ণ হয়। এর বাইরে কোন ধর্মীয় ও সামাজিক রসম-রেওয়াজ ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়, বরং তা বিদআ'ত এবং কুসংস্কার হবে, মানুষ সেটা যতই ভাল কাজ মনে করে করুক না কেন। সুতরাং সফল জীবন লাভের জন্য নিজের আমলনামাকে যেমন ফরয ও নফল ইবাদতসমূহ এবং সৎআমল দিয়ে সাজাতে হবে, তেমনি লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সৎআমলগুলো রাসূল (ছাঃ)

কর্তৃক অনুমোদিত হয়, কোন মনগড়া আমল বা রসম-রেওয়াজ না হয়। অনুরূপভাবে যাবতীয় প্রকার হারাম উপার্জন এবং পাপ ও অন্যায়ের কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। সেই সাথে তওবা-ইস্তিগফার, যিকির-আযকার ও দান-ছাদাক্বার মাধ্যমে নিজের অন্তর ও কর্মজগতকে সাধ্যতম শুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

(৩) মানুষকে কল্যাণের পথে দাওয়াত দেয়া : কেবল নিজেকে নয়, বরং অন্যকেও সুন্দর জীবন গঠনের কাজে সহযোগিতা করা আমাদের অন্যতম কর্তব্য। যাতে সমাজ জীবন পাপ-পঙ্কিলতামুক্ত হয়, অন্যায়-অবিচার দূর হয়। সমাজের মানুষ ভাল না থাকলে নিজে ভাল থাকা যায় না। সমাজে অনাচার-দুরাচার থাকলে তার প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা সম্ভব হয় না। সেজন্য এই সামাজিক দায়িত্ব পালনকে আল্লাহ মুসলিম উম্মাহর জন্য অপরিহার্য করে দিয়েছেন। এই দায়িত্ব যিনি যথাযথভাবে পালন করেন, তার নিজের জন্যও এতে রয়েছে অফুরান ছওয়াব। যাকে দাওয়াত দিয়ে সৎপথে চলার জন্য সহযোগিতা করা হবে, তার সমপরিমাণ ছওয়াব পাবেন তিনিও, যিনি সহযোগিতা করবেন। তবে শর্ত হ'ল- দাওয়াত হ'তে হবে একমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর দেখানো পথে, নিজের মনগড়া পথে নয়। দাওয়াত হ'তে হবে কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য, নিজের স্বার্থ হাছিলের জন্য নয়। তবেই এই দাওয়াত নিজের জন্য এবং জনসমাজের জন্য বৃহত্তর কল্যাণ বয়ে আনবে।

(৪) ধৈর্যধারণ করা : জীবন গড়ার এই পথ নিঃসন্দেহে মোটেই সহজ নয়। প্রতি মুহূর্তে এতে বাধা আসবে, প্রতিরোধ আসবে, চ্যালেঞ্জ আসবে। যে যত অবিচল গতিতে এগিয়ে চলবে, তাকে তত বেশী এই বাধা মোকাবিলা করতে হবে। এই বাধার মুখে প্রতিরোধ প্রাচীর হয়ে যেই বর্ম আমাদের সর্বাধিক সুরক্ষা দিতে পারে- তার নাম ধৈর্য, ধৈর্য এবং ধৈর্য। যে কোন মূল্যে জীবন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হবে-এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে দাঁতে দাঁতে চেপে এই পথে টিকে থাকার নামই ধৈর্য। ধৈর্য তিন প্রকার- (১) দুনিয়াবী বিপদাপদে ধৈর্য ধরা, (২) আল্লাহ্র আনুগত্যের উপর টিকে থাকার জন্য ধৈর্য ধারণ, (৩) পাপাচার ও কুপ্রবৃত্তির তাড়না থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখার যুদ্ধে ধৈর্য ধারণ। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে কোন না কোন ভাবে আমাদেরকে ধৈর্যের এই তিনটি রূপেরই মুখোমুখি হতে হয়। এজন্যই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ অসংখ্যবার ছবর বা ধৈর্যকে মুমিনের আবশ্যিক গুণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

জীবনকে সফলতার সাথে গড়ে তুলতে হলে উপরোক্ত চারটি মৌলিক উপকরণ আবশ্যক। যে অবস্থানেই আমরা থাকি না কেন, যদি উক্ত সূত্রগুলো প্রয়োগ

করতে পারি, নিঃসন্দেহে আমরা দুনিয়া ও আখেরাতে চূড়ান্তভাবে সফল হতে পারব ইনশাআল্লাহ।

মনে রাখতে হবে আমাদের জীবনে সফলতা অর্জনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হ'ল শয়তান। সে আমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আমাদের বিশ্বাসে সংশয় ঢুকিয়ে, অন্তরে কুমন্ত্রণা যুগিয়ে, শুবহাত ও শাহওয়াতের ঘোর লাগা চকচকে হাতিয়ার চালিয়ে সে সদা-সর্বদা ছুটছে তার ওয়াদা বাস্তবায়নের পথে। আল্লাহ্র কাছে তার চিরন্তন শপথ- 'আমি অবশ্যই পাপ ও অন্যায় কাজকে মানুষের কাছে সুশোভিত করে তুলব, তাদের সকলকেই বিপথগামী করে ছাড়ব। তবে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের ছাড়া' *(হিজর ৩৯-৪০)*।

তাওহীদী আক্বীদা-বিশ্বাসে কুমন্ত্রণা ঢোকাতে পারা তার সবচেয়ে বড় সফলতা। ভক্তি আর যুক্তির চোরাস্রোত দিয়ে কোনভাবে যদি সে বিশ্বাসের ফাটল ধরাতে পারে। যদি শিরক আর বিদ'আতের ফাঁদে আটকাতে পারে, যদি অন্তরে নিফাকীর ফর্মালিন মেশাতে পারে, তাহলেই সে সফল। যদি তাতে ব্যর্থ হয়, তখন সে শুরু করে আরেক মিশন। কখনও আমাদের চলার পথে কাঁটা বিছায়, কখনও আমল নষ্ট করার চেষ্টা চালায় আবার কখনও আমলের ঘাটতি ঘটানোর চেষ্টায় অবিচল থাকে।

সব চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন সে সর্বশেষ চাল হিসাবে নিয়তটাকে নষ্ট করার সুযোগ নেয়। ভালো কাজ থেকে বিরত রাখতে না পারলে সে আপ্রাণ চেষ্টা করে যেন সেই ভালো কাজ যেন কোন মতেই আল্লাহ্র জন্য না হয়। আর এভাবে ভালো কাজের মধ্যেও ইখলাছটাকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ ও নিফাকীর বিষবাষ্প ঢুকিয়ে দেয়। বান্দা যখন নিশ্চিত যে, এবার বোধহয় সে সফল হ'ল, শয়তানের হাত থেকে বোধহয় সে এখন নিরাপদ, ঠিক তখনই তাকে সর্বহারা করার এমন ভয়ংকর সূক্ষ্ম আয়োজন করে শয়তান *(কাহফ ১০৩)*।

শয়তানের এই মায়াজাল থেকে নিজেকে বাঁচাতে উপরোক্ত চার মূলনীতির চতুর্থ মূলনীতি ছবর বা নিরন্তর ধৈর্যের কোন বিকল্প নেই। যিনি যত বেশী ধৈর্য অবলম্বন করতে পারেন, তিনি তত বেশী ইস্তিকামাত অর্জন করতে পারেন। শয়তানের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা ততবেশী তার বৃদ্ধি পায়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, জীবনের সফলতাকে যেন আমরা ধন-সম্পদ, পদমর্যাদা, দুনিয়াবী প্রাচুর্য কিংবা সুখ-শান্তি দিয়ে না মাপি। কেননা দুনিয়াবী জীবন বড়ই বৈচিত্র্যময়। এখানে সফলতার সংজ্ঞা সবার জন্য এক নয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের মাঝে হাযারো রং ও বর্ণের মানুষ সৃষ্টি করেছেন। কাউকে

ধনী করেছেন, কাউকে করেছেন দরিদ্র। কাউকে সুবিধাভোগী করেছেন, কাউকে সুবিধাহীন। জীবনে কখনও আনন্দ আসবে, হতাশা আসবে। আক্ষেপ থাকবে, অভিমান থাকবে। পাপ থাকবে, ইস্তিগফার থাকবে। ভুল থাকবে, তওবা থাকবে। উত্থান আসবে, পতন আসবে। স্বচ্ছলতা আসবে, দারিদ্র্য আসবে। এসবই জীবনের নিত্য অনুষঙ্গ। ব্যক্তিভেদে প্রতিটি বিষয়ের মধ্যেই আল্লাহ কারো জন্য সফলতা রেখেছেন, কারো জন্য বিফলতা। সুতরাং কেউ দরিদ্র মানেই ব্যর্থ নয়; আবার ধনী হলেই সফল নয়।

অপরদিকে পার্থিব জীবনে পরম সুখ কিংবা চরম দুঃখ বলেও কিছু নেই। সবকিছু মিলেই মানবজীবন। তথাকথিত সুখের নেশায় ছুটে বেড়ানো মানুষ এক সময় নিশ্চিত অনুধাবন করে- জীবনে আসলে চূড়ান্ত সুখ বলে কিছু নেই। হ্যাঁ, এই পৃথিবীর জীবন সেই অর্থে পুরোপুরি সুখের কখনই হবে না। কেননা দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। চিরস্থায়ী সুখের জায়গা একমাত্র জান্নাত। তবুও এ জীবনে সর্বাবস্থায় একটা সুখময় অনুভূতির জায়গা আল্লাহ রেখেছেন। যার চাবিকাঠি জানা আমাদের জন্য যরূরী। আর তা হ'ল- (১) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করা, যা আসে তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস তথা আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্টি থেকে। (২) নিয়মিত ধৈর্য ধারণের অনুশীলন করা, যা আসে তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্র প্রতি আশাবাদপূর্ণ ভরসা থেকে। সুতরাং জীবনটাকে গড়তে হ'লে আমাদেরকে শুকরিয়া ও ছবরের ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে আসতে হবে, প্রতিনিয়ত অনুশীলনের মাধ্যমে তা অর্জন করতে হবে *(মুসলিম হা/২৯৯৯)*।

অতএব আসুন! আমরা আখেরাতের জন্য বাঁচি। প্রতিটি সময়কে আখেরাতের জন্য ব্যয় করি। জীবনের পরিকল্পনাটা এমনভাবে সাজাই, যেন আখেরাতের সফলতাই আমাদের মূল ভাবনা হয়। আমাদের এই সফলতা পূর্ণতা পাবে না, যদি না পরিবার ও সমাজ সবাইকে নিয়ে পরকালে মহাসফলতা অর্জনের পরিকল্পনা আমাদের থাকে। এটাই প্রকৃত সমাজ গড়ার সংগ্রাম। এই সংগ্রামে আমাদের অবতীর্ণ হ'তে হবে, যদি আমরা প্রকৃত সফল হ'তে চাই *(সূরা ছফ ১০-১৩)*। আমরা জীবনটাকে যেন এমনভাবে না সাজাই, যাতে পৃথিবীতে আমাদের আসা না আসা সমান হয়ে যায়। এমন জীবন যেন না হয়, যে জীবন খালি হাতে আসে, আবার খালি হাতে ফিরে যায়, কিছুই নিতে পারেনা। এমন মহাব্যর্থতা নিয়ে যেন আমরা জীবনটা শেষ না করি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে সঠিক পথে নিজের জীবন গড়ে তোলার তাওফীক দান করুন এবং চিরস্থায়ী জীবনের সর্বোচ্চ অর্জন তথা জান্নাতুল ফেরদাউসের পথে পরিচালিত করুন। আমীন!

জীবন এক নিরন্তর পরীক্ষা

দুনিয়াবী জীবনের রূঢ় বাস্তবতা, দৈনন্দিন জীবন-জীবিকার অবিশ্রান্ত মহড়া আমাদের এতটাই আত্মভোলা করে রাখে যে, প্রায়শঃই আমরা বিস্মৃত হই যে, দুনিয়াবী জীবন আমাদের জন্য পরীক্ষা ক্ষেত্র। আমাদের প্রাত্যহিক যাপিত জীবন, আমাদের উপর আপতিত বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, সুখ-আনন্দ সবকিছুই এই পরীক্ষার নিত্য অনুষঙ্গ। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি আচরণের অন্তরালে চলমান থাকে চুলচেরা হিসাব-নিকাশ *(যিলযাল ৯৯/৭-৮)*। সবকিছুর মধ্যেই নিহিত মহান স্রষ্টার এক নিখুঁত কর্মকৌশল, যার পশ্চাতে লুকিয়ে থাকে বইয়ের পৃষ্ঠার মত ধারাবাহিক একের পর এক এলাহী নিদর্শন আর কার্যকারণ। কখনও এই পরীক্ষা এতই সূক্ষ্ম যে, তার বাস্তবতা অনুভব করতে আমাদের সীমিত জ্ঞান ও বিবেক একান্তই অক্ষম। কখনও পরীক্ষার ধরনগুলোও এমন বিস্তৃত শাখা-প্রশাখাময় যে, বাস্তবিকপক্ষে তা যে কোন পরীক্ষার অংশ, তাও আমাদের ধারণার অতীত হয়।

কখনও মহান রব সুনিশ্চিত বিপদ কিংবা মৃত্যুর হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়ে পরীক্ষা নেন- আমরা কতটুকু রবের প্রতি শোকরগুযার; আবার কখনও কঠিন বিপদ চাপিয়ে পরীক্ষা নেন- কতটুকু আমরা রবের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট। কখনও আমাদের মধ্যে মতভেদের স্রোতে ছেড়ে দিয়ে পরীক্ষা নেন- কে আমাদের মধ্যে রবের বিধানের প্রতি আনুগত্যশীল আর কে সীমালংঘনকারী। কখনও মানুষকে দলে দলে বিভক্ত করে পরীক্ষা নেন- কে সঠিক পথের উপর অবিচল থাকতে চায় আর কে পথভ্রষ্ট। কখনও দুনিয়াবী প্রলোভনের বস্তুগুলো সামনে হাযির করে পরীক্ষা নেন- কে রবকে বেশী অগ্রাধিকার দেয় আর কে নিজের নফসকে। কার নিয়ত শুদ্ধ আর কার নিয়ত অশুদ্ধ। কখনও পারস্পরিক দুনিয়াবী স্বার্থ সামনে এনে পরীক্ষা নেন- দুনিয়ার মোহ আমাদের কাছে বড়, নাকি পরকালীন মুক্তি। অন্যের হক রক্ষা করা যরূরী, নাকি নিজের অন্যায় স্বার্থসিদ্ধি।

কখনও সফলতা দিয়ে পরীক্ষা নেন-আমরা অহংকারী, নাকি রবের রহমতের ভিখারী। কখনও বিফলতা দিয়ে পরীক্ষা নেন- আমরা বেসামাল অনুযোগকারী, নাকি কল্যাণের প্রত্যাশায় ধৈর্যধারণকারী। কখনও দারিদ্র্য চাপিয়ে দিয়ে পরীক্ষা নেন- আমরা হালাল নাকি হারাম উপার্জনের প্রত্যাশী। কখনও ধনাঢ্য করে পরীক্ষা নেন- আমরা হালাল পথে ও নেকীর কাজে ব্যয়ের অভিলাষী, নাকি হারাম বিলাস-ব্যাসনে সম্পদ অপচয়কারী। কখনও পাপের কাজের

সম্মুখীন করে পরীক্ষা নেন- কতটা আমরা রবের প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল ও তওবাকারী আর কতটা অবাধ্য ও স্বেচ্ছাচারী। কখনও নেকীর কাজ করিয়ে পরীক্ষা নেন- কতটা তা আল্লাহ্র জন্য ইখলাছপূর্ণ আর কতটা ব্যক্তিস্বার্থ কিংবা দুনিয়াবী প্রাপ্তির জন্য। কখনও দ্বীনদারীর পরীক্ষা নেন- কতটা আমরা আল্লাহ্র ভয়ে দ্বীন পালন করি, আর কতটা মানুষের প্রতি অন্ধ ভালবাসা, অধিকাংশের ভয় কিংবা ব্যক্তিগত গোড়ামি থেকে পালন করি। এরূপ হাযারো মাধ্যমে, হাযারো পদ্ধতিতে প্রতিনিয়ত আল্লাহ আমাদের পরীক্ষা নেন এবং নিচ্ছেন, সফলতা-ব্যর্থতার হিসাব রাখছেন। আমাদের অগোচরে।

দৈনিন্দন জীবনে আমাদের আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু থাকে দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, সম্পদহানি ইত্যাদি। অথচ এসব বিষয় মানবজীবনের একান্ত অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যা থেকে চাইলেই বের হওয়া সম্ভব নয়। বরং কারা আল্লাহ্র উপর প্রকৃত ভরসাকারী, কারা উত্তম ধৈর্যশীলতা অবলম্বনকারী, তা বাছাই করে নিতে আল্লাহ এটা আমাদের জন্য অবধারিত করে রেখেছেন। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু ধন-সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করব। (এমতাবস্থায়) আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন' *(বাক্বারাহ ২/১৫৫)*। কখনও আল্লাহ উপদেশ স্বরূপ বান্দার পরীক্ষা নেন। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আর তারা কি লক্ষ্য করে না যে, তারা প্রতি বছর একবার বা দু'বার কোন না কোন বিপদে পতিত হয়ে থাকে? তবুও তারা তওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণও করে না' *(তওবা ৯/১২৬)*।

আবার ঈমানদার ও দ্বীনদার হলেই যে আমরা আল্লাহ্র পরীক্ষা থেকে বেঁচে যাব, এমনটি ভাবার কোন সুযোগ নেই। বরং তাদের জন্য পরীক্ষাটা আরো বড়। আল্লাহ বলেন, 'মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি-এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেয়া হবে'? *(আনকাবূত ২৯/২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা নেয়া হয় নবীদের। তারপর বান্দার দ্বীনদারীর মাত্রার উপর পরীক্ষা করা হয়। যে যত দ্বীনদারীতে অবিচল, সে তত কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়' *(তিরমিযী হা/২৩৯৮; ইবনু মাজাহ হা/৪০২৩)*। কেন আল্লাহ ঈমানদারদের পরীক্ষা নেন? এর কিছু কারণ রয়েছে। যেমন-

ক. ঈমানের দাবীর সত্যতা ও নিয়তের ভালো-মন্দ যাচাই করা। আল্লাহ বলেন, 'আমি অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম। সুতরাং আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী' *(আনকাবূত ২৯/৩)*।

খ. ইখলাছ ও তাক্বওয়াশীলতা যাচাই করা। কারা আল্লাহ্র প্রকৃত মুখলিছ বান্দা আর কারা প্রকৃত আল্লাহভীরু, তার পরীক্ষা আল্লাহ নানা রূপে নিয়ে থাকেন। আমলের পরীক্ষায় অনেকে বিপুল সমৃদ্ধ হলেও ইখলাছ ও তাক্বওয়ার ঘাটতিতে

সে হারিয়ে ফেলে তার আমলের সুফল *(মায়েদাহ ২৭; কাহফ ১০৩; মুসলিম হা/২৫৮১)*।

গ. দ্বীনের ব্যাপারে অধিক অগ্রগামিতা যাচাই : দ্বীন পালনে সবাই সমান নয়। সবাই একই মর্যাদার অধিকারীও নয়। দ্বীনের প্রতি অগ্রগামিতার প্রতিযোগিতায় প্রাগ্রসরদের নির্বাচন করা এই পরীক্ষার অংশ *(নিসা ৪/৯৫; ফাত্বির ৩২)*।

ঘ. হককে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী নির্বাচন করা : ঈমানদারীর দাবী সত্ত্বেও বান্দা সত্যিই হকের অনুসরণকারী কি-না কিংবা কতটুকু অনুসন্ধানী তা যাচাই করা এই পরীক্ষার অংশ *(আলে ইমরান ৩/১০৫)*।

ঙ. জান্নাতে উচ্চতর স্থান নির্ধারণ : জান্নাতীরা সবাই সমান স্তরের হবে না। আমলের শুদ্ধতা ও পরীক্ষায় সফল হওয়ার মাপকাঠিতে আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতের বিভিন্ন স্তর নির্ধারণ করবেন *(আন'আম ৬/১৩২)*।

চ. পরিশুদ্ধ করা : আল্লাহ যাদের কল্যাণ চান, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করার জন্যও তাদেরকে বিপদগ্রস্থ রেখে পরীক্ষা নেন, যাতে একসময় সে গুনাহমুক্ত হয়ে যায় *(তিরমিযী হা/২৩৯৮; ইবনু মাজাহ হা/৪০২৩)*।

অনেক সময় ঈমানদারদেরকে পর্যন্ত দল-উপদলে বিভক্ত হতে দেখে আমরা হতাশা বোধ করি; আবার অতি দ্বীনদার কেউ নিজেকে দায়মুক্ত ভেবে সঙ্গোপনে আত্মতুষ্টিও লালন করি। অথচ এই দলে দলে বিভক্তি মূলতঃ আল্লাহ্‌র পরীক্ষারই অংশ, যার মাধ্যমে তিনি অধিকতর ভাল-মন্দ বাছাই করে নেন। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ চাইলে তিনি তোমাদের (ঐক্যবদ্ধ) এক জাতিতে পরিণত করতে পারতেন। তবে তিনি চান তোমাদেরকে যা কিছু প্রদান করেছেন, তা দিয়ে পরীক্ষা করতে। অতএব তোমরা কল্যাণের কাজে প্রতিযোগিতা কর' *(মায়েদাহ ৫/৪৮)*। অন্য আয়াতে তিনি বলেন, 'আল্লাহ চাইলে তোমাদেরকে এক জাতিতে পরিণত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। আর তোমরা যা করছ, সে বিষয়ে তোমাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে' *(নাহল ১৬/৯৩)*। সুতরাং মুসলমানদের মধ্যে একতা কাম্য হলেও তা হবার নয়। কেননা এই বিভক্তির মধ্য দিয়েই আল্লাহ তাঁর সৎ ও একনিষ্ঠ মুমিন বান্দাদেরকে অসৎ এবং কপট ঈমানদার থেকে বাছাই করে নেন।

সর্বোপরি এটাই স্বতঃসিদ্ধ যে, দুনিয়ায় আমাদের যাপিত জীবনের সবটুকু অংশই এক মহাপরীক্ষার অংশ এবং এতে সফল হওয়াই আমাদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এই সত্যটা আমরা যতই অনুধাবন করব এবং এর প্রভাব যত বেশী আমাদের জীবনাচরণে পরিলক্ষিত হবে, ততই আমরা সফলতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করতে পারব ইনশাআল্লাহ।

লক্ষ্যপূর্ণ জীবন

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষের চলার পথ ভিন্ন ভিন্ন রাখলেও সকলের গন্তব্য একই নির্ধারণ করে রেখেছেন। আমাদের জীবনের অবস্থানগত দিক হাযারো বৈচিত্র্যে ভরপুর থাকলেও পরিসমাপ্তির জায়গাটা সকলের জন্য এক। আমরা প্রত্যেকেই জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে একটি সুনির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে ছুটে চলেছি। এমনকি মহাকালের জীব-জড় সকল প্রাণী ও বস্তুই সেই একক মহাগন্তব্যের পথে ধাবমান। এসব কিছু থেকে সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, আমাদের জীবনটা কিছুতেই লক্ষ্যহীন নয়। প্রতিবার মৃতজনের অনন্তযাত্রার সংবাদপ্রাপ্তিতে *'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন'* (নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং তাঁর কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন) যে শব্দবন্ধটি আমাদের মুখ থেকে বের হয়, তা আমাদেরকে জীবনের সেই চূড়ান্ত লক্ষ্যের কথা গভীর উপলব্ধির সাথে স্মরণ করিয়ে দেয়।

মানবজীবন একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই নিবেদিত। আল্লাহ্‌র দাসত্বের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করাই হ'ল এ জীবনের মূল লক্ষ্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই বাস্তব জীবনে এসে এই মহাসত্যটি ভুলে যায়। জীবনের ঊষালগ্নে নবীন কিশোরের চোখের দ্যুতিতে পিতা-মাতা ও অভিভাবকগণ যে রঙিন স্বপ্নের ঝিলিক এঁকে দেন সযতনে, তা জাগতিক প্রয়োজনে কিংবা সামাজিক বলয়ে নিজের স্বতন্ত্র অবস্থানের জানান দেয়ার তাড়নায় বড় সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ধরা দেয় বটে; কিন্তু জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের পথে সেটি নিছক একটি নিমিত্ত ভিন্ন কিছুই নয়। তবুও জৈবিক স্বপ্ন পূরণের সাধনাই পরিশেষে আমাদের অধিকাংশের জীবনের চূড়ান্ত গন্তব্যে পরিণত হয়। যার অনিবার্য ফলস্বরূপ দুনিয়াবী প্রাপ্তির গর্ব অথবা অপ্রাপ্তির বেদনা আমাদের ভাবনাজগতকে সর্বদা বেসামাল করে রাখে। অথচ জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে কোন অবস্থাতেই এসব ক্ষণস্থায়ী লোভনীয় বস্তুতে প্রতারিত হাওয়ার কথা ছিল না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রয়োজন ব্যতিরেকে পৃথিবীতে কোন কিছুই সৃষ্টি করেননি। পৃথিবী পরিচালনার জন্য তিনি বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন মেধা দিয়ে প্রেরণ করেছেন। মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত এই মেধা ব্যবহারের মাধ্যমে পার্থিব

জীবনকে নানা মাত্রায় সুষমামণ্ডিত করে মানবসভ্যতাকে অগ্রযাত্রার পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতার কোন ছেদ ঘটবে না। সুতরাং সমাজের প্রত্যেকে আলেমে দ্বীন, কিংবা চিকিৎসক, প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী হবে; এমন কোন বাধ্যবাধকতা ইসলামে নেই। বরং যার যার মেধা ও আগ্রহ অনুযায়ী মানুষ পেশা বেছে নিতে পারে। তবে চূড়ান্ত বিচারে প্রতিটি কর্মের লক্ষ্য হতে হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি; এটাই হ'ল ইসলামী জীবনদর্শনের মূলকথা।

জীবনের মূল লক্ষ্যের এই তাৎপর্য অনুধাবন না করতে পারার কারণে অনেক দ্বীনদার ভাইকেও কখনও এমন হতাশায় নিক্ষিপ্ত দেখা যায় যে, তিনি ক্যারিয়ারের পিছনে সময় দিতে গিয়ে দ্বীনের কাজে যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না। অথচ এটাই সত্য যে, তিনি যে হালাল 'ক্যারিয়ার' গঠনে সময় দিচ্ছেন এবং এর মাধ্যমে জনগণের সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন, সেটিই তার জন্য 'ইবাদত' হ'তে পারে, যদি এর মাধ্যমে তিনি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও মানবতার সেবার সংকল্প করে থাকেন। অপরদিকে যে ব্যক্তি দ্বীনের খেদমতে ব্যস্ত রয়েছেন, অথচ তার লক্ষ্য হল দুনিয়া; তার দ্বীনের খেদমত আর 'ইবাদত' থাকে না। কেননা আল্লাহকে খুশী করা তার মূল লক্ষ্য নয়। তেমনিভাবে একজন ব্যক্তি যদি সর্বশ্রেষ্ট ইবাদত ছালাতও আদায় করে; অথচ ছালাতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সে সচেতন নয়, কেবল মানুষকে দেখানোর জন্য ছালাত আদায় করে; তার ছালাত আর 'ইবাদত' থাকে না; বরং 'আদাত' বা নিছক অভ্যাসগত কর্মে পরিণত হয়। এই লক্ষ্যহীন ছালাতে তার কোন ছওয়াব হয় না, চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনেও কোন উপকারে আসে না। মোদ্দাকথা, জীবনের মহান লক্ষ্যকে সামনে রাখতে পারলে মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপই অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে লক্ষ্য সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ও ঈমান না থাকলে অনেক সৎআমলও পরিশেষে অর্থহীন হয়ে যায়।

সুতরাং লক্ষ্যপূর্ণ জীবনই অর্থপূর্ণ জীবন। প্রতিটি কাজ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির খালেছ নিয়তে করার প্রতিজ্ঞাকে সামনে রেখে যদি আমরা জীবন পরিচালনা করতে পারি কিংবা বহুল আলোচিত 'ক্যারিয়ার' গঠন করতে পারি, তবে কর্মক্ষেত্র যেখানেই হোক না কেন, পেশা যা-ই হোক না কেন, আমাদের জীবন প্রকৃত লক্ষ্য অর্জনের পথেই ধাবিত হবে ইনশাআল্লাহ। আর এই লক্ষ্যকে বুকে ধারণ করা এবং সেই মোতাবেক নিজেকে পরিচালনা করতে পারা এবং না পারার মধ্যেই একজন মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা-ব্যর্থতা নির্ভর করছে।

একজন মুমিন তার জীবনের লক্ষ্যের উপর কতটা অটুট তার প্রাথমিক একটা প্রমাণ হয়ে যায় তার দৈনন্দিন ছালাত আদায়ের মধ্যেই। কেননা ছালাতই প্রভুর সাথে একান্ত সান্নিধ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এই ছালাত যে যত গুরুত্ব সহকারে এবং খুশ-খুযূ সহকারে আদায় করতে পারে, জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে তার সচেতনতা তত বেশী। এজন্য পবিত্র কুরআনে ছালাত আদায় নয়; বরং প্রতিবারই ছালাত কায়েমের কথা বলা হয়েছে। এই চেতনার উপর ছওয়াবেরও কম-বেশী হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, এমনও লোক আছে (যারা ছালাত আদায় করে বটে; কিন্তু সঠিকভাবে রুকন ও শর্তগুলো পূরণ না করায় এবং ছালাতে একাগ্রতা ও খুশু-খুযু না থাকায় ছালাতের পূর্ণ ছওয়াব পায় না) যাদের কেউ দশ ভাগের এক ভাগ, কেউ নয় ভাগের এক ভাগ, কেউ আট ভাগের এক ভাগ, কেউ সাত ভাগের এক ভাগ, কেউ ছয় ভাগের এক ভাগ, কেউ পাঁচ ভাগের এক ভাগ, কেউ চার ভাগের এক ভাগ, কেউ তিন ভাগের এক ভাগ, কেউবা অর্ধাংশ ছওয়াব পায় *(আবূদাঊদ হা/৭৯৬, সনদ হাসান)*। অর্থাৎ জীবনের লক্ষ্যের সাথে যেমন আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপের গভীর সংযোগ রয়েছে; তেমনিভাবে এর উপরই নির্ভর করে প্রতিটি ইবাদতের কুবুলিয়াত বা গ্রহণযোগ্যতা।

স্মর্তব্য যে, লক্ষ্য নির্ধারণ করার পর তা অর্জনের চেষ্টা করতে গিয়ে আমাদের তরুণরা প্রায়শই ভুল পথে হাটে। কখনও তারা কোন পছন্দের ব্যক্তিকে মানদণ্ড ধরে নিয়ে তাকে অন্ধভাবে হুবহু অনুসরণ করে। অথচ এটা সঠিক পদ্ধতি নয়। কেননা লক্ষ্য একই থাকলেও একেকজনের লক্ষ্য অর্জনের প্রকৃতি ও সফলতার ধরন একেক রকম। উদাহরণস্বরূপ আপেল গাছের নিচে বসে গবেষণা করলেই কেউ নিউটন হয়ে যায় না। মসজিদে নববীতে বসে পাঠগ্রহণ করলেই কেউ শায়খ উছায়মীন হয় না। সুতরাং কাউকে হুবহু অনুসরণ করাকে জীবনের লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ রক্ষা যাবে না। বরং ইখলাছ তথা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনই যেন আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য হয়, তাহলে যে কোন লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব ইনশাআল্লাহ।

লক্ষ্য অর্জনের পথে আধুনিক তরুণদের মধ্যে অপর যে সমস্যাটি প্রকট আকার ধারণ করেছে তা হল, খ্যাতি বা আত্মপ্রচারের নেশা। যার অনিবার্য ফলাশ্রুতি হ'ল ইখলাছের ঘাটতি, সফলতার জন্য শর্টকাট রাস্তা খোঁজা, কপটতা এবং শেষমেষ ব্যর্থতা ও হতাশার সাগরে নিমজ্জিত হওয়া। তথ্যপ্রযুক্তি এবং নিত্য-নতুন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যাপক প্রসার এতে যোগ করেছে অবক্ষয়ের এক নতুন অধ্যায়। জীবনে বড় স্বপ্ন থাকার গুরুত্ব অপরিসীম।

জীবনের যদি কোন বিশেষ লক্ষ্য না থাকে, মহৎ কিছুর স্বপ্ন না থাকে তবে সে জীবন সৃজনশীল ও সার্থক হয়ে গড়ে ওঠে না। সুতরাং তারুণ্যের স্বপ্নজগতের সীমা-পরিসীমা আকাশছোঁয়া থাকবে, এটাই প্রত্যাশিত। এপিজে আবুল কালামের মতে, 'স্বপ্ন তা নয় যা তুমি ঘুমিয়ে দেখ, বরং স্বপ্ন তা-ই যা তোমাকে ঘুমোতে দেয় না'। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, স্বপ্ন হবে বাস্তবতাবিবর্জিত, স্বপ্ন ছোঁয়ার পথ ও পদ্ধতি হবে কোন শর্টকাট রাস্তায় কিংবা অসদুপায় অবলম্বন করে। আত্মপ্রচার, আত্মপ্রশংসা, সমাজে নাম-ডাক, প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের গোপন প্রত্যাশা কখনই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথ নয়।

কোন মহৎ স্বপ্ন অর্জন করতে গেলে তার পিছনে অবশ্যই দীর্ঘ সময় দিতে হয়। কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। একাধারে তার পিছনে লেগে থাকতে হয়। তার প্রতি সৎ এবং বিশ্বস্ত থাকতে হয়। সর্বোপরি আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতা এবং তাঁর রহমতে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং কোন স্বপ্ন অর্জনে একনিষ্ঠতা, সৎনিয়ত এবং সঠিক কর্মপন্থার কোন বিকল্প নেই। পৃথিবীতে সফল ব্যক্তিমাত্রই এক বাক্যে বলেছেন, জীবনে সফল হওয়ার জন্য কোন শর্টকাট পথ নেই। মানুষ ততটুকুই পাবে, যতটুকু সে চেষ্টা করেছে। একনিষ্ঠতা ও অধ্যবসায় না থাকলে কেউই সফল হ'তে পারে না।

অতএব সফলতা অর্জনে ইখলাছের কোন বিকল্প নেই। পৃথিবীতে যারাই সফলতার শিখরে আরোহণ করেছেন, তাদের প্রত্যেকের মাঝেই সাধারণ যে গুণ বা বৈশিষ্ট্যটি সর্বাধিক লক্ষ্যণীয় তা হ'ল একনিষ্ঠতা। যারা যে কাজে একনিষ্ঠ ও সৎ থেকেছেন, বিশ্বস্ততার সাথে নিজের কর্তব্য সমাধা করেছেন, তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে আবশ্যকভাবে সফলতার মুকুট পরেছেন। যদিওবা কেউ জীবদ্দশায় সফল হননি, তবুও পরবর্তী প্রজন্ম তার ফসল যুগ যুগ ধরে ভোগ করে গেছে। অপরপক্ষে কোন কাজ যদি সততা, একনিষ্ঠতা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারিতার সাথে না করা হয়, তবে যত বড় কাজই হোক না কেন, তাতে সফলতা আসতে পারে না। সাময়িকভাবে তা কখনও রঙ চড়ালেও এক সময় তা বুদবুদের মতই হারিয়ে যায়।

ইখলাছহীন কর্ম যেমন দুনিয়াবী জীবনে সফলতা পায় না, তেমনি পরকালীন জীবনেও তার কোন মূল্য থাকে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, 'আল্লাহ কেবল মুত্তাকীদের আমলই গ্রহণ করে থাকেন' *(মায়েদা ৫/২৭)*। রাসূল (ছাঃ)-কে একদিন এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল, সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কী বলবেন যে আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করে নেকীও লাভ করতে চায় আবার মানুষের

মধ্যে প্রসিদ্ধিও অর্জন করতে চায়? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তার জন্য কিছুই নেই। সেই ব্যক্তি তিনবার একই প্রশ্ন করল, রাসূল (ছাঃ) একই জবাব দিলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহ সেই আমল ব্যতীত কোন আমল কবুল করেন না, যে আমল কেবল তাঁরই উদ্দেশ্যে এবং তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় করা হয় *(নাসাঈ হা/৩১৪০, সনদ ছহীহ)*। সুতরাং ইখলাছহীন আমল যে কত ভয়ংকর, তা এই হাদীছ থেকে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

একজন পশ্চিমা লেখকের ভাষায়, 'একনিষ্ঠতা একজন অতি সামান্য ব্যক্তিকেও 'প্রবল মেধাবী, অথচ কপট'-এমন ব্যক্তির চেয়ে অধিকতর মূল্যবান করে তোলে' (Sincerity makes the very least person to be of more value than the most talented hypocrite)। অর্থাৎ সুতরাং তরুণ সমাজ যারা আপন মেধা বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, তাদের প্রতি আহ্বান থাকবে, আত্মপরতা, আত্মপ্রচার, সমাজে নাম-ডাক লাভের আকাংখা প্রভৃতি আত্মবিনাশী রোগ যেন আমাদেরকে কোনমতেই গ্রাস না করে ফেলে। কেননা মেধার সাথে ইখলাছ, সততা ও আমানতদারিতা যদি যুক্ত না হয়, তবে সেই মেধা কখনই জাতির উপকারে আসবে না। খ্যাতির সাময়িক রঙিন জগত হয়ত পুলক যোগাবে, কিন্তু আদতে তা দুনিয়া ও আখেরাতে কোথাও সফলতার মুখ দেখবে না। এটাই আল্লাহ্র রীতি। সুতরাং সফলতা অর্জন করতে হলে অবশ্যই একনিষ্ঠ থাকতে হবে, নিজের অন্তর্জগতকে পরিশুদ্ধ রাখতে হবে, উদ্দেশ্যে সৎ থাকতে হবে এবং আমানতদারিতার সাথে নিজের দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। সর্বোপরি লক্ষ্যে অটুট থাকতে হবে। তবেই আল্লাহ্র রহমত নেমে আসবে এবং ব্যক্তি ও সমাজের জন্য তা একদিন কল্যাণময় পথের দিশারী হবে ইনশাআল্লাহ।

নৈতিক দৃঢ়তা

ঈমান আনার পর আল্লাহ রব্বুল ‘আলামীন যে বিষয়টিকে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তা হ’ল ঈমানের উপর দৃঢ় থাকা। পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঈমানী দৃঢ়তা অর্জনের জন্য আহ্বান করা হয়েছে মুমিনদেরকে। আল্লাহ বলেন, ‘হে মুহাম্মাদ! তুমি এবং তোমার সাথে যারা তওবা করেছে সবাই সরলপথের ওপর দৃঢ় থাক, যেভাবে তোমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর তোমরা সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু করছ তা তিনি দেখছেন *(হূদ ১১২)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই যারা বলেছে আমাদের প্রভু আল্লাহ এবং তার ওপর দৃঢ় থেকেছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না *(আহক্বাফ ১৩)*। অনুরূপভাবে রাসূল (ছাঃ) নিজেও ছাহাবীদেরকে সতর্ক করেছেন। সুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ ছাক্বাফী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে একবার জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি কথা বলুন, যে সম্পর্কে আমি আর অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করব না। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, ‘তুমি বল, আমি ঈমান এনেছি, অতঃপর তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাক’ *(মুসলিম হা/৬২)*।

ইস্তিক্বামাত তথা ঈমানী দৃঢ়তার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ‘ইস্তিক্বামাত এমন একটি শব্দ যা দ্বীনের সবকিছুকেই শামিল করে। এটি হ’ল আল্লাহ্র সম্মুখে পূর্ণ আমানতদারিতা এবং অঙ্গীকারাবদ্ধতা নিয়ে দণ্ডায়মান হওয়া। এর সম্পর্ক কথা, কর্ম ও নিয়তের সাথে। সবকিছু কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্য হওয়া, আল্লাহ্র পথে হওয়া এবং আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক হওয়ার মাধ্যমে ইস্তিকামাত অর্জিত হয়’ *(মাদারিজুস সালিকীন)*। অন্যত্র তিনি বলেন, অন্তরে নৈতিক দৃঢ়তা বা ইস্তিক্বামাত সৃষ্টির মাধ্যম হ’ল, আল্লাহ্র আদেশ ও নিষেধকে গুরুত্ব প্রদান করা। আর সেটা জাগ্রত হয় আদেশ ও নিষেধকর্তা তথা আল্লাহ্র প্রতি শ্রদ্ধা পোষণের মাধ্যমে *(আল-ওয়াবেলুছ ছাইয়েব)*। কোন কোন বিদ্বান বলেন, ইস্তিক্বামাত হ’ল রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা এবং প্রবৃত্তির পথে না চলা।

একজন মুসলমানের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় তার ইস্তিক্বামাত তথা নৈতিক ও আদর্শিক দৃঢ়তার মাধ্যমে। যিনি যত শক্তিশালী ঈমানদার, তার নৈতিক

দৃঢ়তা তত বেশী। শয়তানের প্রতারণা এবং দুনিয়াবী কোন লোভ-লালসার কাছে তিনি পরাজিত হন না। যদি কখনওবা নফসের প্ররোচনায় পদস্খলিত হনও, তবে সম্বিত ফিরে পাওয়া মাত্র নিজেকে সংশোধন করে নেন। অপরদিকে যিনি যত দুর্বল ঈমানদার, তার নৈতিক দৃঢ়তা তত কম। শয়তানের কাছে তিনি সহজেই পরাজিত হন। সামান্য দুনিয়াবী স্বার্থের টোকায় তিনি পথভ্রষ্ট হয়ে যান। এমনকি একসময় অন্তরে এমনভাবে মোহর পড়ে যায় যে, সংশোধনের পথ অনুসন্ধানের চেতনাটুকুও হারিয়ে ফেলেন।

সমাজে চলার পথে এমন ভুরি ভুরি উদাহরণ পাই, যারা একসময় দ্বীনের পথে চলতেন, কিন্তু দুনিয়াবী ব্যস্ততার অজুহাতে দ্বীন থেকে এত দূরে সরে গেছেন যে, ফরয ছালাতটুকুও নিয়মিত আদায় করেন না। অনেক মাদরাসা পড়ুয়া ছাত্রকে দেখা যায় কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারায় পরিবর্তিত হয়েছেন, এমনকি নিজের দ্বীনদারিতায় সমৃদ্ধ অতীতকে পর্যন্ত বেমালূম ভুলে গেছেন। অনেক ভাইকে দেখা যায়, তীব্র আবেগ নিয়ে দ্বীনের পথে এসেছেন, কিছুকাল পরই সে আবেগে ভাটা পড়ে আবার দ্বীন থেকে দূরে সরে গেছেন। জীবনের উষাকালে যে বোনটি পর্দার সাথে চলতেন এবং ধার্মিকা হিসেবে পরিচিত ছিলেন, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণ করার পর সহসাই তিনি এখন দ্বীনের সাথে সম্পর্কচ্যুত। কিছুকাল পূর্বে যে ভাইটি সমাজে আদর্শবান ও দ্বীনী ব্যক্তিত্ব হিসাবে বরিত হয়েছেন, সময়ের আবর্তে তিনি এখন ভিন্ন চিন্তাধারা, ভিন্ন বসনের মানুষ। একসময় যিনি ছিলেন দ্বীনদার তরুণদের আইকন; তিনি এখন আদর্শহীন, চেতনাহীন, নিফাকীর সমুদ্রে নিজেকে হাতড়ে ফেরা এক পচনুন্মুখ বর্জ্যসদৃশ। এসবই ইস্তিক্বামাত হারানোর পরিণাম। ভয়ংকর ব্যাপার এই যে, কোন ব্যক্তি একবার দ্বীনের পথ থেকে বিচ্যুত হলে, খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, তিনি ফিরে আসতে পেরেছেন। শয়তানের চক্রান্ত তাদের উপর এত শক্তিশালীভাবে বিজয়ী হয়ে যায়, যে তা থেকে তওবার পথ যেন তাদের জন্য চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন!

তারুণ্য ও যৌবনে পদার্পণকারী সত্যপিয়াসী ভাই ও বোনদের প্রতি বিনীত পরামর্শ- ইসলামকে প্রকৃত অর্থে জানুন এবং বুঝুন। দ্বীনকে স্বীয় চিত্তে দৃঢ়ভাবে ধারণ করুন। নিজেকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্র আনুগত্যের কাছে সঁপে দিন। রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশিত পথকে নিজের জন্য একান্ত আপন করে নিন। শয়তান ও প্রবৃত্তির পথে চলাকে নিজের জন্য কঠিন থেকে কঠিনতর করে দিন। আত্মসমালোচনা, তওবা-ইস্তিগফারকে নিজের দৈনন্দিন কর্মসূচীতে

পরিণত করুন। এভাবে নিত্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে নৈতিক ও আদর্শিক দৃঢ়তা সৃষ্টি হবে, তা-ই হকের উপর আমৃত্যু আমাদেরকে টিকিয়ে রাখবে। দুনিয়াবী স্বার্থের কাঁটা এবং শয়তানী চক্রান্ত সহজে গ্রাস করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। পবিত্র কুরআনে এসেছে, আল্লাহ মুমিনদের দৃঢ় বাক্য দ্বারা মযবূত রাখেন ইহকালীন জীবনে ও পরকালে (কবরে) এবং সীমালংঘনকারীদের পথভ্রষ্ট করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ যা চান তাই করেন' *(ইবরাহীম ১৪/২৭)*। নিঃসন্দেহে সেই 'দৃঢ় বাক্য' হ'ল তাওহীদের কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

এই নৈতিক দৃঢ়তা সৃষ্টির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হ'ল, আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করা। নফল ইবাদত, যিকির-আযকার, হালাল-হারামের সীমারেখা মেনে চলার মাধ্যমে যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্র যত নিকটবর্তী করে নিতে পারবে তার জন্য আল্লাহ্র উপর সর্বাবস্থায় ভরসা রাখা এবং দৃঢ় নৈতিক অবস্থান নিয়ে টিকে থাকা সহজ হয়ে যায়। সমস্ত দুনিয়াও যদি এরূপ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে চলে যায়, তবুও তারা বিচলিত হয় না, পদস্খলিত হয় না। এরূপ মুমিনদের লক্ষ্য করেই রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিনের ব্যাপারটি বড়ই বিস্ময়কর। তার সমস্ত বিষয়টিই কল্যাণময়। মুমিন ব্যতীত আর কারু জন্য এরূপ নেই। যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে শুকরিয়া আদায় করে। ফলে এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে ছবর করে। ফলে এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়' *(মুসলিম হা/২৯৯৯)*। আল্লাহ আমাদের সকল ভাই-বোনকে দৃঢ় নৈতিকতাসম্পন্ন ও আদর্শবান বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিন। আমীন!

ইতিবাচকতা

আমেরিকান শিক্ষাবিদ স্টিফেন কভেই (১৯৩২-২০১২)-এর মতে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণতঃ ১০% বিষয় এমন থাকে, যা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কিন্তু বাকি ৯০% বিষয় হল কোন ক্রিয়াকে কেন্দ্র করে আমাদের প্রতিক্রিয়ার ফলাফল। এটি তার '৯০/১০ তত্ত্ব' নামে পরিচিত। তিনি উদাহরণ দেন, যেমন আপনি সকালে নাশতার টেবিলে বসলেন। এ সময় আপনার সন্তানের হাতে লেগে কফির মগটি আপনার জামায় উল্টে পড়ল। এ বিষয়টির উপর না আপনার কোন নিয়ন্ত্রণ বা হাত ছিল, আর না আপনার সন্তানের। একটি অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা। কিন্তু এর পরবর্তীতে যা ঘটবে তা আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন। কীভাবে? যদি আপনি এ ঘটনায় তাৎক্ষণিক কঠোর প্রতিক্রিয়া দেখান, রাগান্বিত হন এবং আপনার সন্তানকে ধিক্কার দেন; তাহ'লে সন্তান কাঁদবে। আপনি হয়ত আপনার স্ত্রীকেও ধমক দেবেন কফির মগটি টেবিলের কিনারে রাখার জন্য। হয়ত মৌখিক তর্ক হবে দু'জনের মাঝে। তারপর আপনি ঘরে গিয়ে দ্রুত জামাটি পাল্টিয়ে নতুন জামা পরে অফিসের উদ্দেশ্যে বের হবেন। কিন্তু আপনার সন্তানটি তখনও কাঁদছে এবং স্কুলের বাস মিস করেছে। আপনি তাকে নিজের গাড়িতে করে স্কুলে নিয়ে গেলেন অতিরিক্ত গতিতে। ফলে আপনাকে ট্রাফিক আইন লংঘনের দায়ে জরিমানা দিতে হ'ল। অতঃপর আপনি ২০ মিনিট দেরীতে অফিসে পৌঁছে দেখলেন তাড়াহুড়োর মধ্যে আপনার ব্রিফকেসটি বাড়ীতে রেখে এসেছেন। এভাবে আপনার সকালটা ভয়ংকরভাবে শুরু হ'ল। দিন শেষে যখন বাড়ি এলেন, তখনও আপনার সন্তান এবং স্ত্রী আপনার সাথে আন্তরিকভাবে কথা বলবে না, আপনার সকালের রুক্ষ আচরণের কারণে।

এবার ভাবুন, কেন আপনার দিনটা মন্দভাবে গেল? কফির কারণে? আপনার সন্তানের কারণে? আপনার স্ত্রীর কারণে? ট্রাফিক পুলিশের কারণে? না, এর কোনটাই না, বরং এর কারণ আপনি নিজেই। যদি সকালে মাত্র ৫ সেকেণ্ডের ঐ অনাকাংখিত আচরণটি না করতেন, তাহ'লে পুরো দিনটি আপনার এমন নিরানন্দ হওয়ার কথা ছিল না। এর বদলে যদি আপনি ঐ পরিস্থিতি

সঠিকভাবে সামাল দিতে পারতেন সন্তানকে এরূপ কথা বলে যে, 'কোন সমস্যা নেই বাবা, তোমাকে পরবর্তীতে আরও সতর্ক থাকতে হবে'। তাহলে পুরো চিত্রটি ভিন্ন রকম হ'ত। কোন জটিলতার অবকাশ থাকত না। একটি সঠিক প্রতিক্রিয়া এভাবে বহু জটিলতা থেকে আমাদেরকে রেহাই দেয়, আবার ভুল প্রতিক্রিয়া তৈরী করে নানান অশান্তি এবং বিশৃংখলা।

প্রিয় পাঠক, উপরোক্ত ঘটনার মত জীবনে আমাদেরকে ছোট-বড় বহু ধরনের সংকট অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু প্রায়ই সেসব ঘটনায় আমরা অনর্থক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে বিষয়গুলো অসম্ভব জটিল করে তুলি। অথচ ইতিবাচক দৃষ্টিতে তার মোকাবিলা করতে পারলে জীবনের স্বচ্ছ-সরল গতিধারায় তেমন কোন ছেদ পড়ত না। আপনার বাস বা ট্রেন নির্ধারিত সময়ে ছাড়েনি? সময়টা অন্য কাজে লাগান। বই পড়ুন। কোন নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হন। নতুন কোন ভাবনার অর্গল খুলে দিন। আপনার চাকুরী চলে গেছে? নতুন কোন চাকুরী খুঁজুন। আরো বড় চাকুরীর জন্য প্রস্তুতি নিন। কেন হতাশায়, বিরক্তিতে নিমজ্জিত হবেন? তাতে কী লাভ? সেই সময়টা বরং জীবনের নতুন কোন বৈচিত্র্যের জায়গা অনুসন্ধানে ব্যয় করুন। এভাবে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ ঘটিয়ে সহজেই আমরা জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় ও অর্থপূর্ণ করে তুলতে পারি। নিজেকে সযতনে দূরে রাখতে পারি অনর্থক ঝামেলা আর বিবাদ-বিসম্বাদ থেকে। কোন বিষয়কে কঠিন করে তুলে নিজের উপর যুলুম চাপিয়ে দেবেন, নাকি তার সরল সমাধান খুঁজে নিজেকে প্রশান্ত রাখবেন, এ সিদ্ধান্তটা একান্তই আপনার নিজের।

বিশেষ করে যারা আখেরাতে বিশ্বাসী এবং পরকালীন সঞ্চয়ই জীবনের একমাত্র মিশন ও ভিশন হিসেবে নিয়েছে; তাদের জন্য দুনিয়াবী জটিলতা ও স্বার্থহানি কখনই এতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না যে, তা তাদের স্বাভাবিক মানবিকতা ও নৈতিকতাবোধকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, এমন অনেক ধর্মপ্রাণ মানুষকেও দেখা যায়, যারা জীবনের কোন সংকট মুহূর্তে নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি; বরং অবিবেচক ও ধৈর্যহীনভাবে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। যার খেসারত তাদেরকে সারাজীবন ধরে দিতে হয়েছে প্রচণ্ড হতাশাগ্রস্ততা, বিপন্নবোধ এবং অন্তর্জ্বালা নিয়ে। জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়ে এক অপচিত জীবন নিয়ে তারা ধুঁকতে থাকে আমৃত্যু। অথচ সময়মত একটুখানি ধৈর্যধারণ হয়ত এ অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারত।

সুতরাং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নেতিবাচক মানসিকতা, প্রতিক্রিয়া এবং কর্মকাণ্ড মানুষের জন্য ধ্বংস ডেকে আনে। আবার এর বিপরীতে ইতিবাচকতার ফলাফল হয় অতীব মধুর। ইসলামে ছবর বা ধৈর্যের ব্যাপারে এ জন্যই এত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কেননা ধৈর্য মানুষকে সবসময় ইতিবাচক রাখে, সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে শেখায়, সংকটের সময় সঠিক সমাধানের পথ বাতলে দেয়; সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের পথে দৃঢ় রাখে। এমন গুণসম্পন্ন মানুষের হাতে সমাজ কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। বরং পরার্থপরতা, সহমর্মিতা ও সহনশীলতাই হয় তাদের জীবনের মূলমন্ত্র। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কত চমৎকারভাবে না মানবজাতিকে ইতিবাচকতার পথ দেখিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, 'ভাল এবং মন্দ এক নয়, (হে রাসূল!) আপনি (মন্দের) প্রতিরোধ করুন সর্বোৎকৃষ্ট দ্বারা, তাহলে দেখবেন যে ব্যক্তির সাথে আপনার শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর এমন (মহৎ) চরিত্র কেবল তারাই লাভ করে যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং এই চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা মহা সৌভাগ্যবান *(ফুছছিলাত ৩৪, ৩৫)*। তিনি আরও বলেন, নিশ্চয়ই কঠিনের সাথে রয়েছে সহজতা *(ইনশিরাহ ৬)*। ইসলাম শিখিয়েছে- কোন বিপদ ও সমস্যার শুরুতেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারা ব্যক্তিই হ'ল প্রকৃত ধৈর্যশীল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى 'ধৈর্য তো সেটাই, যেটা (বিপদ বা সমস্যার) শুরুতেই ধারণ করা হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭২৮)*।

বস্তুতঃ মানবজীবন হ'ল পরীক্ষার জীবন। ফলে যে কোন সময় অনাকাঙখিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়াটাই স্বাভাবিক। এর মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন- কে কর্মে ও আচরণে অধিক উত্তম। সুতরাং যদি বিপদের সময় অধৈর্য না হয়ে আল্লাহ্‌র উপর প্রগাঢ় ভরসা রাখা যায় এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রেখে বলা যায়, 'হয়তবা আল্লাহ আমাদেরকে অধিকতর উত্তম বদলা দেবেন, নিশ্চয়ই আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে আশাবাদী' *(কলম ৩২)*, তাহলে বহু পারিবারিক ও সামাজিক বিশৃংখলার হাত থেকে আমরা রেহাই পেতে পারি। আর একজন মুমিনের জন্য আল্লাহ-নির্ভরতাই তো জীবনের পরমার্থ। আল্লাহ বলেন, '(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন! আল্লাহই তোমাদেরকে (ভয়-ভীতি) থেকে মুক্তি দেন এবং সকল দুঃখ-বিপদ থেকে' *(আনআম ৬৪)*। তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ খুলে দেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক দেন, যা সে চিন্তাও করে নি।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট' *(তালাক ২-৩)*। সুতরাং কথায়-কাজে, চলনে-বলনে যথাসাধ্য ইতিবাচকতা বজায় রাখাই আমাদের কর্তব্য। জীবনকে নির্ঝঞ্ঝাট ও লক্ষ্যের পথে অবিচল রাখতে চাইলে এই শক্তিশালী মূলমন্ত্রটি কখনও হাতছাড়া করা যাবে না। জীবনের প্রতি পদে মনে রাখুন রাসূল (ছাঃ)-এর এই চিরন্তন উপদেশ, 'মুমিনের ব্যাপারটি বড়ই বিস্ময়কর, তার সমস্ত বিষয়টিই কল্যাণময়। মুমিন ব্যতীত আর কারো জন্য এরূপ নেই। যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে শুকরিয়া আদায় করে। ফলে এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে ছবর করে, ধৈর্য ধরে। ফলে এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়' *(মুসলিম হা/২৯৯৯)*। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হবে- দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী যিন্দেগীকে স্রেফ পরকালীন উপার্জনের নিমিত্ত মনে করে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্মুখপানে অগ্রসর হওয়া। নিশ্চিন্ত ও নির্ভার জীবন যাপন করতে চাইলে এর চেয়ে উত্তম প্রভাবক আর নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

'ভাল এবং মন্দ এক নয়, (হে রাসূল!) আপনি (মন্দের) প্রতিরোধ করুন সর্বোৎকৃষ্ট দ্বারা, তাহলে দেখবেন যে ব্যক্তির সাথে আপনার শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর এমন (মহৎ) চরিত্র কেবল তারাই লাভ করে যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং এই চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা মহা সৌভাগ্যবান।

-ফুছছিলাত ৩৪, ৩৫।

ক্যারিয়ার ভাবনা

বাংলাদেশের সমকালীন প্রেক্ষাপটে শিক্ষিত মহলে পেশাগত ক্যারিয়ার এক অতীব আলোচিত ও চর্চিত বিষয়। সময়ের সাথে সাথে পিতা-মাতা ও অভিভাবকগণ নিজেদের সন্তানদের বস্তুগত ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্নকে এতদূর নিয়ে গেছেন যে, সন্তানের মুখে বোল ফোটার আগেই তারা তাদের শিশুমনে সেই স্বপ্নের আঁচড়রেখা টানার চেষ্টা করেন। তারপর শৈশবের আনন্দমুখর দিনগুলোকে যেন জেলখানায় বন্দী রেখে শুরু হয় পিতা-মাতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে শিশুদের উদয়াস্ত পরিশ্রমের পালা। স্কুল-মাদ্রাসায় বরাদ্দ সময়টুকুর পরও রাত-দিন চলে প্রাইভেট পড়ার মহাসংগ্রাম, আর কাঙ্খিত রেজাল্টের আশায় বন্যের মত হন্যে হয়ে অবিরাম পথ চলা। আবার যারা উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তারাও নানা ভাবনা-চিন্তায় গলদঘর্ম হয়ে পড়েন। মেডিকেল নাকি ইঞ্জিনিয়ারিং, আইন নাকি সোশাল সাইন্স- ইত্যাকার হাজারো হিসাব-নিকাশ মিলাতে ভীষণ ব্যস্ত আজকের প্রজন্ম ও তাদের অভিভাবকরা। অথচ এই সময়গুলোকে খুব কম সংখ্যকের মনেই জীবনের এই মৌলিক প্রশ্নগুলো জাগ্রত হয় যে, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যে আসলে কী? সফল ক্যারিয়ার বলতে কী বুঝায়? আর সেই ক্যারিয়ার গঠনের উপায়ই বা কী? শুধু কাঙ্খিত রেজাল্ট আর প্রত্যাশিত পেশাজীবন কিংবা পদ-পদবী, অর্থবিত্ত আর সামাজিক মর্যাদা লাভই কী ক্যারিয়ার গঠনের প্যারামিটার? দুনিয়ার ক্ষণিকের মিছে মায়ার জগৎ ছেড়ে যাওয়ার পর এই বহুল প্রত্যাশিত ক্যারিয়ারের কোন ভূমিকা থাকবে কি? নাকি তা বিপদ থেকে উত্তরণের কোন মাধ্যম হবে চিরস্থায়ী জীবনের ফলাফল নির্ধারণী সেই মহাদিবসে?

রাসূল (ছাঃ) প্রতিদিন সকালে তিনটি বিষয়ের প্রার্থনা করে একটি দো'আ পাঠ করতেন- 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে উপকারী জ্ঞান, কবুলযোগ্য আমল এবং পবিত্র রিযিক দান করুন'। উপকারী জ্ঞান, কবুলযোগ্য আমল ও পবিত্র রুযী- তিনটি মৌলিক বিষয়। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায় যে, আমরা যারা ঈমানদার, তাদের ক্যারিয়ার ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু তো এটাই হওয়া উচিৎ ছিল! কেননা যে ক্যারিয়ার ভাবনা ইহকাল ও পরকাল দু'টোকেই সামনে রাখে, সেটাই তো মুমিনের প্রকৃত ক্যারিয়ার ভাবনা। সফল ক্যারিয়ার তো তারই যে নিজেকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের সফলতার জন্য

প্রস্তুত করে। যদি কেউ একপাক্ষিকভাবে কেবল দুনিয়াবী ক্যারিয়ার গঠনকেই গুরুত্ব দেয়, আর পরকালকে গুরুত্বহীন মনে করে, নিঃসন্দেহে তার ক্যারিয়ার পরিকল্পনা শুধু অপূর্ণাঙ্গই নয়, বরং চরমভাবে ব্যর্থ। কেননা ইহকালীন জীবন যত সফলই হোক না কেন, পরকালের জীবন যদি বিফলতায় পর্যবসিত হয়, তবে এই সাময়িক সফলতার কানাকড়িও মূল্য নেই। পবিত্র কুরআনে সেই চিত্র উঠে এসেছে এভাবে- 'কিন্তু যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, হায়! আমাকে যদি দেওয়াই না হ'ত আমার আমলনামা এবং আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব! হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হ'ত! আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই আসল না! আমার ক্ষমতাও হারিয়ে গেছে!' *(হাক্কাহ ২৫-২৯)*।

প্রিয় পাঠক! রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতিদিনের প্রার্থিত বিষয়গুলির প্রতি খুব গুরুত্ব দিয়ে লক্ষ্য করুন। কী কী জিনিস তিনি চেয়েছেন এবং কেন চেয়েছেন? এগুলোই কি আমরা আমাদের ক্যারিয়ার ভাবনার বিষয়বস্তু হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়? চলুন, সেগুলোর প্রতি একবার নযর বুলিয়ে আসি।-

প্রথমতঃ **উপকারী জ্ঞান :** যে জ্ঞান মানুষের উপকারে আসে। সে জ্ঞান ইহলৌকিকও হতে পারে, পারলৌকিকও হতে পারে। তবে সেটা অবশ্যই উপকারী হতে হবে। কেবল মানবকল্যাণার্থেই ব্যবহৃত হতে হবে। অর্থাৎ জ্ঞান মাত্রই যে উপকারী ও কল্যাণকর হবে, তা নয়। বরং এমন অনেক জ্ঞান রয়েছে, যা আমাদের জন্য ক্ষতিকর; দুনিয়াবী কিংবা পরকালীন দিক থেকে। এজন্য রাসূল (ছাঃ) শুধু জ্ঞানার্জন নয়, বরং উপকারী জ্ঞান অর্জনের কথা বলেছেন। একজন মুসলমানের জন্য মুখ্য হ'ল পরকাল। সুতরাং যে কোন জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে পূর্ণ সচেতন থাকতে হবে যে, তা আসলে উভয় জগতের জন্য উপকারী কিনা কিংবা কতটুকু উপকারী। এই জ্ঞান কি সত্যের পথে পরিচালিত করবে? এই জ্ঞানে কি মানব কল্যাণ রয়েছে? এই জ্ঞানের মাধ্যমে কি আমি হালাল রিযিক উপার্জন করতে পারব? এই জ্ঞান কি আমাকে জান্নাত লাভে সহায়তা করবে?

যদি জ্ঞান হয় সূদ-ঘুষ-দূর্নীতির পাঠ, যদি তা হয় অন্যায়-অসত্য পথ অবলম্বনের, যদি তা হয় কুরআন ও হাদীছ তথা আল্লাহ প্রেরিত মহাসত্যের বিপরীত চেতনাধারী, যদি তা হয় তাওহীদ-সুন্নাহ পরিপন্থী ও শিরক-বিদ'আত মিশ্রিত, যদি তা হয় গান-বাদ্য, অসুস্থ আমোদ-প্রমোদ, বিনোদনের- তবে তা নিঃসন্দেহে অপকারী জ্ঞান। আর এই অপকারী ও মূল্যহীন জ্ঞানকে চিহ্নিত না করতে পারলে এবং তাকে পরিত্যাজ্য করতে না পারলে আমাদের ক্যারিয়ার ভাবনা মূল্যহীন।

দ্বিতীয়তঃ **কবুলযোগ্য আমল বা গ্রহণযোগ্য কর্ম :** উপকারী জ্ঞান অর্জনের পর কর্তব্য হ'ল- আমার জ্ঞান দ্বারা যে পেশা বেছে নিচ্ছি তাতে শুধু অর্থোপার্জনই মুখ্য? তাতে কি দুনিয়াবী ক্ষমতা ও পদমর্যাদাই মূল উদ্দেশ্য? মানুষের কাছে সম্মান-মর্যাদা লাভই অভীপ্সা? যদি তা-ই হয়, তবে তাতে দুনিয়াবী উপকার থাকতে পারে বটে, কিন্তু পরকালীন জীবনে তার কোন মূল্য আল্লাহ্র কাছে নেই। কেননা মানুষের প্রতিটি আমলই তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল। যদি নিয়ত হয় আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করা, তাঁর নৈকট্য হাছিল করা এবং তাঁর সৃষ্টির সেবা তবেই তা আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি তা হয় দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্যে, তবে তার ফলাফল দুনিয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে। পরকালীন জীবনে তা কোন উপকারে আসবে না। যে আমলের গ্রহণযোগ্যতা আল্লাহ্র কাছে নেই, তা চূড়ান্ত বিচারে অর্থহীন *(কাহাফ ১০৩-১০৫)*। এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনি কি বলেন, যে ব্যক্তি ছওয়াব ও সুনামের জন্য জিহাদ করে, তার জন্য কী রয়েছে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তার জন্য কিছুই নেই। সে ব্যক্তি তা তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে একটি কথাই বললেন, তার জন্য কিছুই নেই। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ বান্দার সেই আমলই কবুল করেন যা কেবল তাঁরই জন্য একনিষ্ঠভাবে করা হয় এবং যা তাঁর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয় না' *(নাসাঈ হা/৩১৪০, সনদ হাসান ছহীহ)*।

অনুরূপভাবে কোন কর্ম যদি আল্লাহ নির্দেশিত এবং রাসূল (ছাঃ)-এর প্রদর্শিত পথ ও পন্থা বহির্ভূত হয়, তবুও তা আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়; সে কর্ম আপাতদৃষ্টিতে যতই সৎকর্ম হিসাবে দৃশ্যমান হোক না কেন, কিংবা তার পিছনে যত সৎনিয়তই থাকুক না কেন। এজন্য ইসলামে কর্মের চেয়ে কর্মপন্থা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। সূরা ফাতিহার শেষাংশে বর্ণিত 'ছিরাতুল মুস্তাক্বীম' বলতে সেই কর্মপন্থাকেই নির্দেশ করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্র নির্দেশিত কর্মপন্থা তথা ছিরাতুল মুস্তাক্বীমের অনুসরণের মাধ্যমেই সৎআমল করতে হবে। তাওহীদ ও সুন্নাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ততা রেখেই আমল করতে হবে। নতুবা তা আল্লাহ্র কাছে কবুলযোগ্য আমল হিসাবে গণ্য হবে না *(আন'আম ১৫৩; হূদ ১১২; যুখরুফ ৪৩)*।

তৃতীয়তঃ **পবিত্র রিযিক :** আমাদের ক্যারিয়ার গঠনের সাথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি জড়িয়ে আছে রূযী বা আর্থিক ইনকামের সাথে। একজন মুমিনের জন্য তার ক্যারিয়ার ভাবনার শীর্ষে থাকতে হবে- তার কাংখিত পেশাটি মৌলিকভাবে হালাল কি-না তা নিশ্চিত করা। আর হালাল হ'লে তাতে

হারামের সংশ্রব আছে কি-না; দুর্নীতি, সূদ, ঘুষ, জুয়া, লটারী প্রভৃতি নিষিদ্ধ বিষয়ের কোন সম্পর্ক আছে কি-না- ইত্যাদি দিকসমূহ অবশ্যই ক্যারিয়ার ভাবনার মধ্যে থাকতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ঐ দেহ কখনও জান্নাতে যাবে না, যা হারাম দ্বারা পরিপুষ্ট হয়' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৭৮৭, সনদ ছহীহ)*।

প্রিয় পাঠক! আমরা যারা নিজেদের কিংবা পরবর্তী প্রজন্মের ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবছি, আগামীর পরিকল্পনা মনে মনে সাজাচ্ছি, তাদের জন্য উপরোক্ত তিনটি মৌলিক নীতিকে সামনে রাখা অত্যাবশ্যক। এর মাঝেই আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বাঙ্গীন সফলতা নিহিত রয়েছে। সুতরাং যদি এর ভিত্তিতে আমরা নিজেদের ভবিষ্যৎ ভাবনা ভাবি, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের চলার পথ নির্ধারণ করে দিতে পারি এবং পরকালীন সফলতা কেন্দ্রিক ক্যারিয়ার গঠনে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি, তবে একদিকে যেমন বস্তুবাদের মরীচিকাময় কুহেলিকা থেকে মুক্ত হয়ে তারা নিজের জীবনটাকে সঠিক লক্ষ্যে পরিচালনা করতে পারবে, অন্যদিকে দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বাঙ্গীন সফলতা অর্জনের পথ তাদের জন্য সুগম হবে ইনশাআল্লাহ।

আমাদের ঐকান্তিক আশাবাদ, আমাদের শিক্ষার্থী ভাই-বোনরা জীবনের প্রকৃত বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন হোক। দুনিয়াবী সফলতার সাথে তাদের ক্যারিয়ার ভাবনায় যুক্ত হোক সীমাহীন সুখময় জান্নাতের বাসনা। পরকালীন সাফল্যই হোক তাদের মনযিলে মাক্বছাদ। সোনালী ভোরের স্বর্ণালী আলোয় ভরে উঠুক তাদের জীবনের পবিত্র স্বপ্নগুলো। যে স্বপ্ন বিস্তৃত হয় ক্ষুদ্র পৃথিবী ছাড়িয়ে চিরন্তন আখেরাতের পানে। যে স্বপ্নের ব্যপ্তি হয় মহান প্রভুর একান্ত সান্নিধ্যের পরমতম মুহূর্ত অবধি। সে মহা দিন, মহা ক্ষণের প্রতীক্ষায় মহান প্রভু আমাদের পথ চলাকে সহজ করে দিন- সন্তুষ্টচিত্তে, সন্তোষভাজন হয়ে। আমীন ছুম্মা আমীন!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

'সেই ব্যক্তি সফলকাম যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে প্রয়োজন মাফিক রিযিক দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যতটুকু দিয়েছেন ততটুকুতে পরিতুষ্ট রেখেছেন'।

-মুসলিম হা/১০৫৪।

কিসের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত আমরা!

বলা হয়ে থাকে যে, Life is a race- জীবন হ'ল এক প্রতিযোগিতার নাম। হ্যাঁ, প্রতিযোগিতাই বটে। আমাদের নিত্যকার পথচলা, আমাদের দৈনন্দিন চিন্তাধারা, আমাদের জীবনের লক্ষ্য, কর্মপন্থা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সবকিছুর মধ্যেই এই প্রতিযোগিতার উপস্থিতি প্রবলভাবে বিদ্যমান। বিদ্যালয় পড়ুয়া শিশু, খেলার মাঠের তরুণ, চাকুরীর পরীক্ষায় অবতীর্ণ যুবক কিংবা বাসে ওঠার সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা পেশাজীবী, টিসিবির পণ্য পেতে লাইনে দাঁড়ানো শ্রমজীবী-এমন কেউই নেই যিনি এই বিরামহীন প্রতিযোগিতার চক্র থেকে বাইরে আছেন। এমনকি এই প্রতিযোগিতাই মানুষের জীবনের চালিকাশক্তি। অন্যকে টপকে সামনে যাওয়া কিংবা নিজেকে পিছনে পড়তে না দেয়ার জোর মানসিকতাই প্রতিযোগিতা, যা প্রতিটি মানুষের ভেতরকার সহজাত প্রবণতা। এই চাওয়া ইতিবাচক হ'লে নিঃসন্দেহে তাতে দোষের কিছু নেই। বরং তা প্রশংসার যোগ্য এবং কাম্য। কিন্তু যে প্রতিযোগিতা মানুষকে অন্যায়ের পথে পরিচালিত করে, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, যে প্রতিযোগিতা ন্যায়-ইনছাফের দণ্ডকে পদদলিত করে; যে প্রতিযোগিতা স্রেফ ভোগসর্বস্ব, আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থবাদী; যে প্রতিযোগিতা অর্থহীন ও অন্তঃসারশূন্য, সর্বোপরি যে প্রতিযোগিতা আখেরাতকে ভুলিয়ে দেয়- সে প্রতিযোগিতা নিঃসন্দেহে ব্যর্থ ও ধ্বংসাত্মক।

আজকের পুঁজিবাদী দুনিয়া এবং ভোগবাদী সমাজের দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহ'লে বিলক্ষণ দেখা যাবে যে, অধিকাংশ মানুষই এক অন্তহীন নেতিবাচক প্রতিযোগিতার ঘেরাটোপে বাধা। সবাই যেন কোন এক অপ্রদর্শিত নেশার ঘোরে ছুটে চলেছে- আরো চাই! আরো চাই! চাওয়ার যেন কোন শেষ নেই। হিসাবের খেরোখাতায় চাহিদাগুলো একটার পর একটা ধারাবাহিক যোগ হ'তেই থাকে। প্রলম্বিত হয় অন্ধের মত অবিশ্রান্ত ছুটে চলার পরিধি। হঠাৎ কখনও যদি পিছু ফিরে তাকানোর অবসর হয়, ভেতরকার কোন দূরাগত সত্ত্বার পরশে অশান্ত মনটা সহসা প্রশান্ত হয়, তখন ক্ষণিকের জন্য হ'লেও মনে হয় কিসের পিছনে ছুটছি আমি? এসবের পিছনে ছুটে দিন শেষে লাভটা কী? কেন

এসব করছি? কার জন্য করছি? লাভালাভের নিত্য হিসাবটা তখন কেমন যেন অর্থহীন, বিষাদময় মনে হয়। একসময় উদাসী মন সখেদে বলে ওঠে- নাহ, জীবনটা বোধ হয় ষোল আনাই মিছে।

বস্তুতঃ এটা মোটেই বেসুরো মনের ঔদাস্যভরা কথা মাত্র নয়। বরং ষোল আনা মিছে ব্যর্থ জীবনালেখ্য কিন্তু সত্যিই রচনা করে চলেছে মানব সংসারের অধিকাংশ জীবন। যে জীবন মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরিচালিত নয়, যে জীবন রাসূল (ছাঃ)-এর প্রদর্শিত পথের পথিক নয়, সে জীবন যত চকচকেই পরিদৃষ্ট হোক না কেন, তা আদতেই ব্যর্থ জীবন। পশু-পাখির মতই এ জীবন মূল্যহীন। পরকালের খাতায় যে জীবনের মূল্য যোগ হয় না, সে জীবন তো আসলেই মিছে! ষোল আনাই মিছে!

প্রিয় পাঠক! দুনিয়ার চাক্যচিক্য ও মোহে আমরা ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও প্রায়শঃই ভুলে যাই, আমরা আখেরাতের সন্তান, দুনিয়ার নই। আমাদের আসল বাসস্থান জান্নাত, দুনিয়া নয়। আমাদের প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু দুনিয়া নয়, আখেরাত। দুনিয়ায় তো আমরা এসেছি মাত্র ক'দিনের মুসাফির হয়ে। সময় ফুরানো মাত্র ফিরে যেতে হবে আসল গন্তব্যে। একজন পর্যটক যেমন রঙিন দুনিয়ার স্বপ্নাতুর মুহূর্তগুলো ক্ষণিকের জন্য আস্বাদন করে ফেরৎ যায়, তার থেকে বিন্দুমাত্র ভিন্ন নয় আমাদের এই জীবন। আখেরাতের আয়নায় দুনিয়াটা দেখলে এই মহাসত্যটি অনুধাবন করা মোটেই রহস্যময় কিছু নয়। কিন্তু আমরা যে গাফেল। চূড়ান্ত গাফেল। গাফলতির পর্দা চোখে টেনে তাই তো নির্বোধ গাধার মত পরিশ্রম করি এমন কিছুর পিছনে, যেসবের কোনই উপযোগিতা নেই আখেরাতে। নেই তাতে বিশেষ দুনিয়াবী প্রাপ্তিও। অপরদিকে স্বল্প পরিশ্রমেই যেখানে অপেক্ষা করছে আবারিত প্রাপ্তি, চিরস্থায়ী স্বপ্নপূরণের লোভনীয় হাতছানি, তার জন্য একদণ্ড সময় বের করতে গেলেও আসে হাযারো আলস্য আর অজুহাতের সমাহার।

অথচ আমরা নিজেদের কতই না বুদ্ধিমান ভাবি! আখের গোছানোর জন্য আমরা কতই না স্থিতধী পরিকল্পনাবিদ! কিন্তু কখনও কি ভেবেছি আখের গোছানোর নামে আমরা আসলে কি গোছাচ্ছি? আমাদের ভবিষ্যৎ ভাবনার চালাকি আর প্রশান্তিতে ভরপুর চেহারার বিপরীতে চূড়ান্ত বিচার দিবসে অপেক্ষমাণ কোন সে হতভাগ্য, নতমুখ চেহারা লুকিয়ে আছে? আফসোস শত আফসোস!

সেদিনের কথা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ আমাদেরকে অসংখ্যবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। দরদভরা ভাষায় তিনি জানিয়ে দিয়েছেন এই জীবনের মূল প্রতিযোগিতা আসলে কিসের? কী এর বিষয়বস্তু। তিনি আহ্বান জানান, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমা এবং এমন জান্নাত লাভের জন্য প্রতিযোগিতা কর, যার সীমানা আসমান এবং যমীনব্যাপী। কেবল মুত্তাকীদের জন্যই যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে' *(আলে ইমরান ৩/১৩৩)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা এগিয়ে চল তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের মত। আর তা প্রস্তুত রাখা হয়েছে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য' *(হাদীদ ৫৭/২১)*। মুমিনদের প্রশংসায় আল্লাহ বলেন, 'তারা হ'ল এমন বান্দা যারা কল্যাণের কাজে সর্বদা প্রতিযোগিতা করে এবং তাতে তারা অগ্রগামী থাকে' *(মুমিনূন ২৩/৬১)*। 'অতএব (জান্নাতে নে'মতলাভের জন্য) প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হোক' *(মুত্বাফফিফীন ৮৩/২৬)*।

কখনও ধমকের সুরে বলেন, 'অতএব তোমরা সৎকাজের প্রতিযোগিতা কর, তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সকলকে একত্র করবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান' *(বাক্বারাহ ২/১৪৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'অতএব সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা কর, আল্লাহ্র দিকেই সকলের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করেছিলে, সে সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন' *(মায়েদাহ ৫/৪৮)*। কখনও আগাম স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আমাদের পরকালের আফসোস বার্তা- 'হায়! যদি আবার দুনিয়ার জীবনে ফিরে যেতে পারতাম!' *(আনআম ২৭)*। 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি ছাদাকা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!' *(মুনাফিকুন ১০)*। 'হায়! যদি পরকালের জন্য অগ্রিম কিছু পাঠাতে পারতাম!' *(ফজর ২৪)*। 'হায়! যদি আমরা শুনতাম, নিজেদের বুদ্ধি-বিবেককে কাজে লাগাতাম!' *(মুলক ১০)*।

অতএব প্রিয় পাঠক! আমাদের জীবনটা এক নিরেট প্রতিযোগিতার মঞ্চ। এই মঞ্চের সত্যিকারের প্রতিযোগী কেবল তারাই যারা আখেরাতকে চিনেছে। ফলাফল পাবে কেবল তারাই যারা আখেরাতের জন্য প্রতিযোগিতা করে। এর বাইরে যারা রয়েছে, তারা কেউ প্রতিযোগীই নয়। কেননা প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তুই তাদের জানা নেই। অতএব আসুন! আমরা আমাদের প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু চিনতে শিখি। টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত, পদ-পদবী,

গাড়ি-বাড়ির ধোঁকায় আর দুনিয়াবী অসার প্রতিযোগিতায় নিজেকে বিলীন করে না দেই। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা জেনে রেখো যে, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পরস্পর গর্ব করা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্যের লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছুই নয়' *(হাদীদ ৫৭/২০)*। সুতরাং জেনেশুনে এসব জিনিসকে প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু বানানো নিরেট এবং নিরেট বোকামী ছাড়া কিছুই নয়। এজন্য হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, 'তুমি যখন কাউকে দুনিয়াবী দিক থেকে তোমার সাথে প্রতিযোগিতা করতে দেখবে, তখন তার সাথে তুমি আখেরাতের বিষয়ে প্রতিযোগিতা কর' *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৬৩৫১)*।

সুতরাং আমরা প্রতিযোগিতা করব। তবে তা যেন নির্বোধের মত দুনিয়ামুখী না হয়ে পরকালীন কল্যাণই একমাত্র লক্ষ্য হয়। প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজও যদি পরকালীন মুক্তির জন্য হয়, তাতেই আমাদের চূড়ান্ত সাফল্য নিহিত। আর এই প্রতিযোগিতাই আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দেবে আমাদের সেই চিরস্থায়ী সুখের ঠিকানা। আল্লাহ বলেন, 'তারা সকলে সমান নয়। আহলে কিতাবদের মধ্যে একটি হকপন্থী দল আছে, তারা রাত্রিকালে ছালাতরত অবস্থায় আল্লাহ্র আয়াত পাঠ করে। তারা আল্লাহ ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখে এবং তারা সৎকাজের আদেশ দেয়, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে এবং তারা কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা করে। তারাই সৎকর্মশীলদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত *(আলে ইমরান ৩/ ১১৪)*। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকল ভাই ও বোনকে ভোগবাদী দুনিয়ার মোহ থেকে রক্ষা করুন এবং আখেরাতমুখী জীবন যাপনের মাধ্যমে পরকালের পথে জীবনের মূল প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

অর্থ-বিত্ত নয়, আমাদের সম্বল ঈমান ও সৎআমল

দ্রব্যমূল্যের সীমাহীন উল্লম্ফন, আয়ের সাথে ব্যয়ের ক্রমব্যবধান, জীবন-জীবিকার ব্যাপক সংকোচন, ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনমন, তেল-গ্যাস-বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, বিশ্বব্যাপী দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি আমাদের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের মানুষের জীবনধারায় এক বড় ধরনের ধাক্কা দিয়েছে। করোনার পর আবার ঘুরে দাঁড়ানোর মুহূর্তে হঠাৎ এই ছন্দপতনে হতোদ্যম হয়ে পড়েছে নাগরিক জীবন। পার্শ্ববর্তী দেশ শ্রীলংকা ও পাকিস্তানের বেহাল দশায় যোগ হয়েছে বাড়তি ভীতি। অজানা আশংকায় ভীতচকিত মানুষের মনজুড়ে বিরাজ করছে এক ধরনের অজানা অস্থিরতা। মনে হচ্ছে এই বুঝি আর পেরে ওঠা হবে না। সন্তান-সংসার, পরিবার-পরিজন নিয়ে এমন অনিশ্চয়তা আর দুর্ভাবনায় দিন কাটাচ্ছে বহু নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবার। শুধু দক্ষিণ এশিয়াতেই নয়, করোনা এবং ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের জোড়া ধাক্কায় সমগ্র বিশ্বেই শুরু হয়েছে দ্রব্যমূল্যের ভয়াবহ উর্ধ্বগতি। বিশ্বজুড়ে শোনা যাচ্ছে নতুন করে অর্থনৈতিক মন্দার পদধ্বনি। *মা'আযাল্লাহ*।

প্রতিবার ধাক্কা আসে, আর আমরা নির্দিষ্ট কাউকে দোষারোপ করি। কখনও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে, কখনও বিশ্বব্যবস্থাকে। কিন্তু আমরা হয়ত কখনও ভাবার অবকাশ পাই না যে, এসব আমাদের জন্য অবধারিতভাবে প্রাপ্য কিংবা এসব আমাদেরই পাপাচারের ফল! সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত, অবিবেচকের মত তেল-বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে চলেছে- এটা নিঃসন্দেহে গুরুতর অপরাধ; কিন্তু একই অপরাধের অংশীদার কি আমরাও সমানভাবে নই? নইলে তেলের দাম বাড়তে না বাড়তেই অন্য সবকিছুর দাম এমন আকাশছোঁয়া কেন হ'ল? এই সিন্ডিকেটেড অপরাধের জন্য দায়ী কি কেবল সরকার? তেলের দরবৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি না রেখে রাতারাতি ইচ্ছেমত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বহুগুণ বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় তো সরকার নয়, আমরাই লিপ্ত। বলা হয়ে থাকে যে, সরকার জনগণের প্রতিচ্ছবি। সুতরাং যে দেশের জনগণ যেমন, সে দেশের সরকারও তেমন হবে-এটাই স্বাভাবিক।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এজন্যই ঘোষণা দিয়েছেন- 'মানুষের কৃতকর্মের ফল হিসাবেই স্থলে ও সমুদ্রে সর্বত্র বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের কর্মের কিছু শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা (আল্লাহ্র দিকে)

ফিরে আসে' *(সূরা রূম ৪১)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমাদেরকে যেসব বিপদাপদ স্পর্শ করে, সেগুলো তোমাদেরই কৃতকর্মের ফসল। অনেক গুনাহ তো আল্লাহ ক্ষমাই করে দেন' *(সূরা আশ-শূরা ৩০)*। অর্থাৎ দুনিয়াবী বিপদাপদ কখনও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পরীক্ষাস্বরূপ আসে; তবে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের নিজেদেরই কৃতকর্মের শাস্তিমূলক প্রতিফল।

প্রিয় পাঠক, একজন ঈমানদারের জন্য ব্যক্তি ও সমাজের উপর আপতিত বিপদাপদ বৃহত্তর অর্থে তার জীবন পরীক্ষারই অংশ। সেজন্য সে তাতে অস্থিরচিত্ত হয় না, হতাশায় মুহ্যমান হয় না। বরং নিজের অন্তরকে আল্লাহ্র প্রতি আরো বেশী প্রণত করে দেয়। হৃদয়কে আল্লাহ্র রহমতের আশায় প্রশস্ত রাখে। নিজেকে আরো সচেতনভাবে পরকালের জন্য প্রস্তুত করে। যেমন :

ক. তওবা ও ইস্তিগফার : যে কোন বিপদ থেকে মুক্তির জন্য যাবতীয় পাপাচার থেকে তওবা করা এবং আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনার বিকল্প নেই। এতে আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হয় এবং বিপদ থেকে দ্রুত মুক্তি লাভ করা যায়। সূরা হূদে এসেছে, (হূদ আঃ বলেন) তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তার দিকে ফিরে আস। (তাহ'লে) তিনি তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত উত্তম জীবনের স্বাদ দেবেন এবং প্রত্যেক অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য মোতাবেক অনুগ্রহ করবেন। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উপর মহা দিনের শাস্তির আশংকা করি *(হূদ ৩)*।

খ. ধৈর্য ধারণ : পরীক্ষায় ঘেরা মুমিন যিন্দেগীতে ধৈর্য সর্বোত্তম ঢাল। মানবচরিত্রে ধৈর্য ধারণের চেয়ে উত্তম গুণ আর নেই। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা নিব। আর আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদেরকে' *(বাক্বারা ১৫৫)*।

মুমিনের বৈশিষ্ট্যই হ'ল সে যেমন সুখের সময় আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট থেকে প্রাণভরে শুকরিয়া আদায় করবে, তেমনি দুঃখ-কষ্টের সময় আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ ভরসা রেখে ধৈর্য অবলম্বন করবে। কোন অবস্থাতেই সে আল্লাহকে ভুলে যাবে না, আল্লাহ্র প্রতি ভরসা হারাবে না। একথা সে সর্বদা মনে রাখবে যে, রিযিকের ফয়ছালা হয় আসমানে। যে রব সুসময়ে রিযিক দিয়েছেন, সেই রব দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দুঃসময়েও রিযিক দিতে পারেন। তিনিই সবকিছুর মালিক ও নিয়ন্ত্রণকর্তা *(বাক্বারা ২৪৫)*। এজন্য ইবরাহীম বিন আদহাম (রহ.) চমৎকারভাবে বলেছেন, আল্লাহ্র কসম! আমি মোটেই পরোয়া করি না যদি যবের প্রতিটি দানার মূল্য এক দিনারও হয়। কেননা আমার দায়িত্ব হ'ল

আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক ইবাদত জারি রাখা। আর আল্লাহ্‌র কাজ হ'ল আমাকে তাঁর প্রতিশ্রুত রিযিক দান করা'। সুতরাং দিশেহারা হওয়া নয়; বরং আমাদেরকে তওবা এবং ধৈর্যের মাধ্যমে বিপদাবস্থা থেকে পরিত্রাণ চাইতে হবে। এতেই আমাদের মুক্তি নিহিত রয়েছে ইনশাআল্লাহ।

অপরদিকে আমাদেরকে এ বিশ্বাস সুদৃঢ় রাখতে হবে যে, দুনিয়াবী জীবন-জীবিকা, ধন-সম্পদ, বাড়ি-গাড়ি কোনকিছুই আমাদের প্রকৃত সম্পদ নয়, বরং ক্ষণকালের ভোগসামগ্রী মাত্র। সুতরাং এসবের মূল্যবৃদ্ধি, ঘাটতি, ক্ষয়ক্ষতি যেন আমাদের হীনবল করে না দেয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'দুনিয়াই যার মূল লক্ষ্য এবং সবচেয়ে বড় চিন্তার কারণ, আল্লাহ তাআ'লা তার চোখের সামনে দরিদ্রতা স্থাপন করে দেন তথা যাবতীয় অভাব তার সামনে উপস্থিত করেন' *(তিরমিযী হা/২৪৬৫)*।

কেননা আমাদের মূল সম্পদ এবং আমাদের চিরস্থায়ী উপার্জন হ'ল আমাদের বিশুদ্ধ ঈমান এবং সৎআমল; যাতে কোন শিরক-বিদ'আত থাকবে না, থাকবে না রিয়া-প্রদর্শনীর সংমিশ্রণ। যিনি এমন দুই অমূল্য সম্পদের অধিকারী হয়েছেন, তার মত সৌভাগ্যবান আর কেউ নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের উদ্দেশ্যে সুসংবাদবাণী উচ্চারণ করে বলেন, 'তোমাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে আমার নৈকট্যশীল করবে না; বরং নৈকট্যশীল হবে তারাই, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎআমল করেছে। আর তাদের জন্য তাদের কর্মফলস্বরূপ রয়েছে বহুগুণ পুরস্কার। আর তারা সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে বসবাস করবে' *(সাবা ৩৭)*। উক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যতক্ষণ আমাদের ঈমান আছে এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সৎআমল করার তাওফীক আছে, ততক্ষণ আমরা শত বিপদের মধ্যেও সম্পদশালী। শত দুর্বলতার মাঝেও ক্ষমতাবান। শত দুঃখ-বেদনার মাঝেও সর্বংসহা প্রশান্ত হৃদয়। কেননা আমাদের মূল সম্বল, আমাদের মূল পুঁজি আমাদের হাতছাড়া হয়নি। এই সম্বল যার সংরক্ষণে থাকে, পৃথিবীর তাবৎ বিপদাপদের বার্তা তাকে আতংকিত করে না। বরং আখেরাতের চির প্রশান্তিময় গন্তব্যের জন্য জোগাড়-প্রস্তুতিই হয় তার জীবনের সবকিছু। অতএব দুনিয়ার সবকিছু চলে যাক, কিন্তু কোন অবস্থাতেই যেন ঈমান সম্পদটাকে না হারাই, সৎআমলের পাল্লা যেন লঘুতর না হয়ে পড়ে- এটাই হোক আমাদের দাঁতে দাঁত চাপা প্রতিজ্ঞা।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে দুনিয়াবী যাবতীয় বিপদাপদ থেকে রক্ষা করুন! সর্বাবস্থায় একমাত্র তাঁর প্রতি ভরসা রেখে তাঁর মহা অনুগ্রহ লাভের মাধ্যম তথা ঈমান ও সৎআমলের পথে পরিচালিত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

ইসলামী মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির চর্চা

একজন সভ্য মানুষের জীবন মানে বিশ্বাস ও মূল্যবোধের চমৎকার সুসমন্বয়। মানুষ যা বিশ্বাস করে, যা অন্তরের গহীনে লালন করে, তা-ই মূল্যবোধ আকারে প্রকাশ পায়। ইসলাম যেমন স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ করেছে, ঠিক তেমনি মানুষের প্রতি মানুষের পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্যও নির্ধারণ করে দিয়েছে। মানবসত্তার অন্তর্নিহিত মর্যাদাকে যথাযথ মূল্য দেয়ার মাধ্যমেই এই সামাজিক দায়িত্ববোধ ও মূল্যবোধের জন্ম হয়। পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন থেকে শুরু করে অধীনস্থ কর্মচারী, প্রতিবেশী, মেহমান, পথচারী, গরীব-দুখী তথা সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রতি আলাদাভাবে কর্তব্য নির্ধারণ করেছে ইসলাম। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সদ্ব্যবহার কর তোমাদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-পরিজন, ইয়াতীম-মিসকীন, আত্মীয় বা অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সহচর সাথী, মুসাফির ও দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী ও গর্বিতজনকে ভালবাসেন না' *(নিসা ৪/৩৬)*। এই আয়াতে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি সামাজিক সম্পর্কের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করে তার প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা থেকে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, ইসলামে সামাজিক দায়িত্ববোধের স্থান কতটা সুপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ।

একটি সমাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যেমন আইন-আদালত ও প্রশাসনের নিত্য প্রয়োজন পড়ে; তেমনি প্রয়োজন হয় ব্যক্তিমানুষের মূল্যবোধের চর্চা। সামাজিক রীতিনীতি ও আচরণবিধির জন্ম হয় এই মূল্যবোধের জায়গা থেকেই। উত্তম আচরণ, সৌজন্যবোধ, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা, ক্ষমাপরায়ণতা, সহানুভূতি, পরোপকার, ভাল-মন্দ বাছবিচার, দানশীলতা, মানুষের বিপদে-আপদে এগিয়ে আসা, নিজের এবং অপরের অধিকারের প্রতি সচেতনতা, শৃংখলাবোধ, কারো কোন প্রকার ক্ষতি না করা, মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি লক্ষ্য রাখা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা ইত্যাদি মানবজাতির এমন অত্যাবশ্যক কিছু আচরণবিধি, যার উপস্থিতি একটি সমাজকে কল্যাণময় মানবীয় সমাজে পরিণত করে। বিনির্মাণ করে সভ্যতার সুরম্য প্রাসাদ। অপরদিকে এর অনুপস্থিতিতে সৃষ্টি হয় চরম সামাজিক অবক্ষয়ের।

একটি সমাজ সুরক্ষায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সরকার ও প্রশাসন নিয়ামক শক্তি হলেও জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া তা কখনই সফল হয় না। যে সকল দেশকে উন্নত দেশ হিসাবে দেখা হয়, সেসব দেশে সরকারের পাশাপাশি জনসচেতনতাই কিন্তু সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আধুনিক মুসলিম সমাজের দিকে তাকালে মোটাদাগে যে সমস্যাগুলো চোখে ধরা পড়ে, তার একটা বড় অংশেরই উদ্ভব ঘটেছে সামাজিক মূল্যবোধ চর্চার ঘাটতি থেকে। বিশ্বাসে ও সংস্কৃতিতে শ্রেষ্ঠ উম্মত হলেও সেই বিশ্বাস ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটানোয় আমাদের যে বিরাট গাফলতি ও ঘাটতি রয়েছে, তা স্বতঃসিদ্ধ এবং প্রমাণিত। পাশ্চাত্য বিশ্ব এবং মুসলিম বিশ্বের মধ্যে আজ সভ্যতার সূচকে যে আনুপাতিক ব্যবধান তৈরী হয়েছে, তার জন্য বহুলাংশে দায়ী হল বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে সামাজিক সংস্কৃতি ও দায়িত্বশীলতার প্রবল অভাব। এ কারণেই ১৮৮১ সালে প্যারিস সম্মেলন থেকে ফিরে মুফতী মুহাম্মাদ আবদুহু (১৮৪৯-১৯০৫ খৃ.) মুসলিম জাতির এই দুর্দশার দিকে ইঙ্গিত করে বেদনার্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, ذهبت للغرب، فوجدت إسلاما، ولم أجد مسلمين، ولما عدت للشرق، وجدت مسلمين، ولكن لم أجد إسلاما ‘আমি পশ্চিমে গেলাম, সেখানে পেলাম ইসলাম, কিন্তু মুসলমান পেলাম না; আবার যখন প্রাচ্যে ফিরলাম, তখন মুসলমান পেলাম কিন্তু ইসলাম পেলাম না’।

পাশ্চাত্য বিশ্ব তাদের সমাজে অভ্যন্তরীণ শৃংখলা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে সভ্যতার মাপকাঠিতে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। অপরপক্ষে মুসলিম বিশ্ব ধর্মীয় চেতনায় সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও দায়িত্ব ও চেতনাবোধের প্রবল দুর্বলতার কারণে প্রায় সর্বত্রই বিশৃংখলা ও পশ্চাদগামিতার স্রোতে খাবি খাচ্ছে। আমরা আদর্শের কথা বলি, কিন্তু তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করি না। সততার দাবী করি, কিন্তু নিজেকে অসততা থেকে বের করে আনতে পারি না। মানুষের কাছে বিশ্বস্ততা কামনা করি, অথচ নিজে বিশ্বস্ত হ’তে পারি না। অপরের কাছ থেকে ন্যায়ের প্রত্যাশা করি, কিন্তু নিজে ন্যায়পরায়ণ হ’তে পারি না। অপরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নছীহত করি, অথচ নিজের পরিমণ্ডল অপরিচ্ছন্ন রাখি। ঘর কিংবা গাড়ির জানালা থেকে টুপ করে ময়লা নিক্ষেপ করতে কিংবা যত্রতত্র থুথু ও সিগারেট নিক্ষেপ করতে আমরা একটুও দ্বিধাবোধ করি না। কি অশিক্ষিত, কি শিক্ষিত- প্রত্যেকেই আমরা কমবেশী এই দ্বিচারিতার মধ্যে ডুবে

আছি। ফলে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম সমাজ আধুনিক বিশ্বে পশ্চাৎপদ হিসাবেই পরিগণিত।

আশার কথা হ'ল, আধুনিক মুসলিম যুবসমাজ এখন বেশ সচেতন হয়ে উঠছে। তারা এই পশ্চাৎপদতার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে মুসলিম সমাজকে কথায়-কাজে, চলনে-বলনে একটি সুসভ্য সমাজ হিসাবে গড়ে তোলার তাকীদ অনুভব করছে। তারা চেষ্টা করছে একটু একটু করে মানুষের মাঝে সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে। নিঃসন্দেহে এ কাজ কঠিন। তবুও শক্ত হাতে সকল বাধা পেরিয়ে যাবার হিম্মত থাকলে এই প্রয়াস অবশ্যই একদিন সফলতার মুখ দেখবে ইনশাআল্লাহ। তরুণ সমাজের প্রতি তাই আমাদের আহ্বান, আসুন! সামাজিক মূল্যবোধ চর্চায় আমরা নিজেরা যত্নবান হই এবং মানুষের মাঝে সততা, কল্যাণ ও ন্যায়ের বার্তাগুলো সাধ্যমত ছড়িয়ে দেই। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সাহায্যার্থে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি। নিদেনপক্ষে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং পরিবেশ রক্ষার মত অতি সাধারণ বিষয়গুলোতেও যদি গণজাগরণ তৈরী করা যায়, তবুও সমাজে কার্যকর ও টেকসই পরিবর্তন আসতে খুব বেশী সময় লাগার কথা নয়। সর্বোপরি এর মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদের অবস্থানকে অনেক উঁচু করবেন ইনশাআল্লাহ। প্রিয় তরুণ সমাজ! আমরা কি এই দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছি?

ফিৎনা থেকে আত্মরক্ষা

বিগত বছরগুলোতে যুবসমাজের মধ্যে দ্বীনের ব্যাপারে সচেতনতা যথেষ্ট বেড়েছে আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তাদের মধ্যে অস্থিরতা এবং উদ্বিগ্নতা। তাদের সামনে নানামুখী চ্যালেঞ্জ। ক্যারিয়ার গঠনের চ্যালেঞ্জ। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার চ্যালেঞ্জ। সামাজিক অবস্থান তৈরীর চ্যালেঞ্জ। পরিবারকে সন্তুষ্ট রাখার চ্যালেঞ্জ। সর্বোপরি নিজেকে পাপাচারমুক্ত রেখে দ্বীনের ওপর টিকে থাকার চ্যালেঞ্জ। অথচ এতসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নেই তাদের যথাযথ নৈতিক ও মানসিক প্রস্তুতি। নেই তাদেরকে পথপ্রদর্শন করার মত কোন শক্তিশালী সমাজ কাঠামো। ফলে কিভাবে নিজেদের দ্বীনদারী অক্ষুণ্ন রেখে এসব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে এবং সফলভাবে তা উৎরানো যাবে–এটাই হ'ল সমকালীন দ্বীনদার যুবকদের প্রধান ভাবনা।

বস্তুতঃ একদিকে বস্তুবাদী সমাজের চাকচিক্যময় হাতছানি, চারিত্রিক অধঃপতন ঘটানোর জন্য যাবতীয় উপায়-উপকরণের সহজলভ্যতা; অন্যদিকে নানামুখী মতবাদ ও আদর্শের ডামাডোল। এর মধ্যে একজন দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী এবং লক্ষ্যে অবিচল ব্যক্তির পক্ষেও যেখানে নিজেকে ধরে রাখা সহজসাধ্য নয়, সেখানে একজন সাধারণ দ্বীনদার যুবকের পক্ষে তা কতটা কঠিন; সেটা বলাই বাহুল্য। এজন্যই বোধহয় রাসূল (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীদের লক্ষ্য করে বলেছেন, তোমাদের পরে এমন একটি সময় আসছে, যখন দ্বীনের উপর অটল থাকা ব্যক্তিদের প্রতিদান হবে তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশজন শহীদের সমপরিমাণ *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৯৪)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তোমাদের পর আসছে এমন একটি সময় যখন দ্বীনের উপর ধৈর্যসহকারে টিকে থাকা হবে হাতের মুঠোয় জ্বলন্ত অঙ্গার ধরে থাকার মত সুকঠিন *(ঐ)*।

এই সর্বগ্রাসী চ্যালেঞ্জ ও ফিৎনাসমূহকে বিদ্বানগণ মৌলিকভাবে দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন, যা মানুষের নফস বা অন্তরের সাথে সম্পর্কিত।- (১) শাহওয়াত বা পাপপ্রবণতা (২) শুবহাত বা সন্দেহপ্রবণতা। পাপপ্রবণতার মধ্যে পড়ে যাবতীয় কুপ্রবৃত্তিমূলক কর্ম, অন্যায় ও পাপাচার। আর সন্দেহ প্রবণতার মধ্যে পড়ে আল্লাহ্র দ্বীন সম্পর্কে যাবতীয় ভ্রান্ত সংশয়, অবিশ্বাস, সত্য দ্বীনকে খুঁজে পেতে ব্যর্থ হওয়া কিংবা মিথ্যাকে সত্য ভেবে দিশেহারা

হওয়া। নিজেকে যারা ফিৎনামুক্ত রাখতে চান, তাদেরকে এই ফিৎনা দু'টির পরিচয় অবশ্যই জানতে হবে এবং হৃদয়জগত সাধ্যমত এতদুভয়ের প্রভাব থেকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। যেমন ভবিষ্যৎ বংশধরকে সকল ফিৎনা থেকে রক্ষার জন্য পিতা ইবরাহীম ও ইসমাঈল দো'আ করে বলেছিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাদের মধ্য থেকেই তাদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াত সমূহ পাঠ করবেন, তাদেরকে কিতাব ও সুন্নাত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের (অন্তরসমূহকে) পরিচ্ছন্ন করবেন *(বাক্বারাহ ২/১২৯)*।

মানুষের নফস বা অন্তরের একাধিক চরিত্র আছে। যেমন কখনও তা মানুষকে অন্যায়ের প্রতি প্রলুব্ধ করে। একে নফসে আম্মারাহ বলা হয়, যার প্রভাব থেকে আমরা কেউই মুক্ত নই। আবার এই একই নফস মানুষকে অনুশোচনায় নিক্ষেপ করে এবং তার বিবেকশক্তিকে জাগ্রত করে দেয়, যখন সে কোন মন্দ কাজে লিপ্ত হয়। একে বলা হয় নফসে লাওয়ামাহ। আরেক ধরনের নফস রয়েছে, যা মানুষকে আল্লাহ্র কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করায় এবং তাঁর আনুগত্যেই প্রশান্তি পায়। একে বলা হয় নফসে মুত্বমাইন্নাহ। এটাই হ'ল নফসের পরিশুদ্ধ ও পবিত্র অবস্থান। যার জন্য প্রয়োজন নিরন্তর সাধনা। কুপ্রবৃত্তি থেকে বাঁচার তীব্র সংগ্রাম। মনের উপর যে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে, সেই সফল হ'তে পারে। এর প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আত্মাকে কুপ্রবৃত্তি হ'তে অবদমিত রাখল, তার বাসস্থান হল জান্নাত' *(নাযি'আত ৪০)*।

প্রিয় পাঠক, নফসকে পরিশুদ্ধ করতে চাইলে ক্রমাগতভাবে শাহওয়াত ও শুবহাতের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়। পরিশুদ্ধি ও পরিচর্যার মাত্রা অনুযায়ীই নির্ধারিত হয় নফসের আচরণ। ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, 'এই অনুশীলন করার সময় ব্যক্তিকে জানতে হবে যে, আজ সে যতবার আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, আগামীদিন তা তার জন্য ততটাই স্বস্তির কারণ হতে যাচ্ছে। আর যতবার সে শিথিল হচ্ছে, আগামী দিন তার জন্য ততটাই কঠিনভাবে ধরা পড়ার উপলক্ষ্য হ'তে যাচ্ছে। তাকে মনে রাখতে হবে যে, তার কর্ম থেকে অর্জিত মুনাফা হ'ল জান্নাতুল ফেরদাউসের সীমাহীন প্রশান্তিময় আবাসস্থল এবং মহান প্রভুকে দর্শনের সৌভাগ্য। আর লোকসান হওয়ার অর্থ নিশ্চিত জাহান্নাম ও প্রভুর দর্শন থেকে বঞ্চিত হওয়া। যে ব্যক্তি এই মানসিকতায় দৃঢ়প্রত্যয়ী হ'তে পারে, পার্থিব জীবনের হিসাব-নিকাশ তার নিকট গৌণ হয়ে পড়ে। অতএব একজন প্রকৃত মুমিনের কর্তব্য হ'ল আত্মসমালোচনায় গাফলতি না করা এবং অন্তরের

গতি-প্রকৃতি ও প্রতিটি পদক্ষেপকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। কেননা আত্মা এমন এক অমূল্য সম্পদ, যা দ্বারা মানুষ সেই গুপ্তধনের অধিকারী হ'তে পারে যা অনন্তকাল ধরে কখনই নিঃশেষ হয় না। এই অমূল্য আত্মাকে যারা কলুষময় করে ধ্বংস করে ফেলে এবং তুচ্ছ প্রাপ্তির বিনিময়ে তার জন্য অবর্ণনীয় ক্ষতি ডেকে আনে সে ব্যক্তি পৃথিবীর সর্বাধিক নির্বোধ ও বিচারজ্ঞানহীন ব্যক্তি। শেষ বিচারের দিনে সে তার পরিণতি জানতে পারবে। আল্লাহ বলেন, 'সেদিন প্রত্যেক আত্মা যে সৎকর্ম করেছে ও বদকর্ম করেছে তা উপস্থিত পাবে' *(আলে ইমরান ৩০; ইগাছাতুল লাহফান মিন মাছায়িদিশ শয়তান ১/৮৫ পৃঃ)*।

সর্বোপরি নফসকে যাবতীয় ফিৎনা থেকে হেফাযত করা এবং সার্বক্ষণিক পরিচর্যার মধ্যে রাখার জন্য পবিত্র কুরআনে কয়েকটি ব্যবহারিক পদক্ষেপ উল্লেখ করা হয়েছে, যার অনুশীলন করা আমাদের জন্য অত্যন্ত যরূরী। যেমন :

ক. কুরআন অধ্যয়ন করা : দুনিয়াতে মানুষের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সর্বাধিক জীবন্ত নিদর্শন হ'ল আল-কুরআন। কুরআন তেলাওয়াত মানুষের অন্তর প্রশান্ত করে। তাই নফসের পরিশুদ্ধির জন্য নিয়মিত কুরআন পাঠ করা ও তা অনুধাবন করা আমাদের কর্তব্য। সেই সাথে কুরআনী বিধান অনুযায়ী নিজের জীবনকে ঢেলে সাজানোর অনুশীলন আমাদেরকে যাবতীয় ফিৎনা থেকে সুরক্ষা দিতে পারে। কেননা আল্লাহ এই কুরআন দ্বারাই মানুষের অন্তরকে সুদৃঢ় করেন এবং বাতিল থেকে সুরক্ষা দান করেন *(ফুরক্বান ২৫/২২)*।

খ. রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনী পাঠ করা : পবিত্র কুরআনে নবী-রাসূলদের ঘটনাবলীসহ বহু শিক্ষণীয় কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। এসব ঘটনাসমূহ মানুষকে বাস্তবতা অনুধাবনে সহায়তা করে। রাসূল (ছাঃ)-এর সীরাত এমন অসংখ্য ঘটনায় পরিপূর্ণ, যা একজন মুমিনকে প্রতিটি মুহূর্তে ঈমানী চেতনায় উদ্দীপ্ত রাখে। ন্যায় ও কল্যাণের পথে অটল থাকার জন্য প্রেরণা যোগায়। এজন্য নিয়মিত সীরাত পাঠে অভ্যস্ত হ'তে হবে। অনুরূপভাবে আল্লাহ প্রেরিত অন্যান্য নবীদের কাহিনীসমূহও পাঠ করা যরূরী। কেননা এ সকল ঘটনা নানামুখী বিপদাপদে মানুষকে কী করতে হবে তা স্মরণ করিয়ে দেয়, যা তাকে ফিৎনা থেকে আত্মরক্ষার ঐকান্তিক আত্মবিশ্বাস যোগায়। আল্লাহ বলেন, 'রাসূলদের ঐ সকল বৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট বর্ণনা করছি। এর দ্বারা আমি তোমার হৃদয়কে সুদৃঢ় করি' *(হূদ ১১/১২০)*।

গ. ইলম অনুযায়ী আমল করা : ফরয ও নফল আমলসমূহ আমাদের ঈমানের সবচেয়ে বড় খাদ্য। ফিৎনা থেকে নিজের ঈমানকে রক্ষার জন্য আমলে

অগ্রগামী হওয়ার কোন বিকল্প নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আঁধার রাতের মত ফিৎনা ঘনিয়ে আসার পূর্বেই তোমরা সৎআমলের দিকে ধাবিত হও। সে সময়ে সকালে একজন মুমিন হ'লে বিকালে কাফের হয়ে যাবে। বিকেলে মুমিন হ'লে সকালে কাফের হয়ে যাবে। মানুষ দুনিয়াবী লাভের কিংবা স্বার্থের জন্য তার দ্বীনকে বিক্রি করে ফেলবে' *(মুসলিম হা/২১৩)*। সুতরাং ইবাদতে মনোযোগী হওয়া ও প্রতিনিয়ত সৎআমলের অনুশীলন করা, মসজিদের সাথে অন্তরকে সংযুক্ত রাখা, কুরআনকে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা, দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করা প্রভৃতি সৎকর্মের মাধ্যমে নিজের ঈমানকে সুরক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে। আবার আমরা অধিকাংশ সময় জেনেশুনেও হারাম কর্ম ছাড়তে চাই না কিংবা গড়িমসি করি। ফলে সহজেই আমাদের ঈমান দুর্বল ও অরক্ষিত হয়ে পড়ে। এজন্য সৎআমলের সাথে সাথে অসৎআমল পরিত্যাগ করাও সমভাবে কিংবা অধিকতর যরূরী *(নিসা ৪/৬৬)*।

ঘ. আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করা : আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ ব্যতীত জীবনের কোন মহৎ লক্ষ্যই অর্জিত হয় না। এজন্য আল্লাহ কুরআনে বার বার নিজের ধন-সম্পদ থেকে খরচ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। যখন কেউ নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহ্র পথে খরচ করে, তখন তার অন্তর্জগতে পরিশুদ্ধিতা আসে, খুলূছিয়াতের ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়। সে হকের উপরে দৃঢ় থাকার শক্তি অর্জন করে *(বাক্বারাহ ২/২৬৫)*।

ঙ. সৎব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক গড়া : সমাজে চলার জন্য মানুষের সাথে মিশতেই হয়। আর সেই মানুষ যদি সৎ হন এবং সুপথপ্রদর্শনকারী হন, তবে নিজেকে আল্লাহ্র আনুগত্যের উপর ধরে রাখা অনেক সহজ হয়ে যায়। এজন্যই ইসলামে সৎসঙ্গী নির্বাচনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে *(তওবা ৯/১১৯, কাহফ ১৮/২৮)*। সুতরাং ফিৎনা থেকে বাঁচতে নেককার মানুষদের সান্নিধ্যে থাকা খুবই যরূরী। দ্বীনী সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততা বা জামাআ'তবদ্ধ জীবন যাপনের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য হাছিল করা সম্ভব।

চ. আল্লাহ্র কাছে দো'আ করা : একজন মুমিনের নিষ্ঠা এবং আল্লাহ্র প্রতি তাওয়াক্কুল প্রকাশ পায় তার দো'আর মাধ্যমে। এজন্য দো'আকেই ইবাদত বলা হয়েছে। অতএব ফিৎনা থেকে বাঁচার জন্য সর্বদা আল্লাহ্র নিকট কায়মনোবাক্যে সাহায্য চাইতে হবে। তাঁর খাছ রহমতই কেবল আমাদের ফিৎনা থেকে বাঁচাতে পারে *(ইউসুফ ১২/৫৩)*।

এজন্য রাসূল (ছাঃ) এই দো'আটি সর্বদা পাঠ করতেন– *'ইয়া মুক্বাল্লিবাল কুলূব ছাব্বিত ক্বালবী আলা দ্বীনিকা'* (হে অন্তর সমূহের পরিবর্তনকারী! তুমি আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর অবিচল রাখ)। আনাস (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা ঈমান এনেছি আপনার প্রতি এবং আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার প্রতি। তবুও কি আপনি আমাদের ব্যাপারে আশংকা করেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ! কেননা মানুষের অন্তরগুলো আল্লাহ্র দুই আঙ্গুলের মাঝে রয়েছে। তিনি যেভাবে খুশী অন্তরের পরিবর্তন ঘটান *(তিরমিযী হা/২১৪০, সনদ ছহীহ)*। সুতরাং নিজেকে দুনিয়াবী ফিৎনার জোয়ার থেকে রক্ষা করতে হ'লে থেকে উপরোক্ত পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে নিরন্তর সাধনা করে যেতে হবে। নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে হবে। তবে এজন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হ'ল ফিৎনা থেকে বাঁচার জন্য নিজের অন্তরের প্রচণ্ড তাকীদ এবং সদিচ্ছা। আমি না চাইলেও ফিৎনায় জড়িয়ে যাচ্ছি অর্থ আমার প্রতিজ্ঞা সবল নয়। যদি কেউ সত্যিকার অর্থে ফিৎনা থেকে বাঁচতে চায় এবং সর্বান্তঃকরণে প্রচেষ্টা চালায়, তবে আল্লাহ তাকে সুপথ প্রদর্শন করবেনই ইনশাআল্লাহ। আর এটা আল্লাহ্র ওয়াদা *(আনকাবূত ২৯/৬৯)*।

চোখের হেফাযত

আধুনিক যুগে ফেৎনার যে জোয়ার প্রবাহিত হচ্ছে তার মধ্যে মুসলিম যুবকদের জন্য সবচেয়ে বড় ফেৎনা হ'ল সাংস্কৃতিক ফেৎনা। হাযারো মিডিয়ায় বিনোদন ও সংস্কৃতির নামে নারী-পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক ও যৌনতাকে তথাকথিত শিল্পিত রূপ দিয়ে যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয় ও চারিত্রিক অধঃপতনকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এর সাথে বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া যুক্ত হয়ে পরিস্থিতি আরো ভয়ংকর উঠেছে। ফেসবুক বা ইউটিউবের মত আপাত নিরীহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রবেশ করলেও যেকোন মুহূর্তে অন্যায়ের সাথে জড়িয়ে যাওয়ার ভুরি ভুরি হাতছানি তরুণদেরকে সহজেই বিভ্রান্ত করে দেয়। কোন অনৈতিক আহ্বান তাকে অতি সহজেই প্রতারিত করে ফেলে। আর নিয়মিতভাবে এমন প্রতারণার শিকার হ'তে থাকলে একটা সময় আসে, যখন নৈতিকতার দৃঢ় বাঁধনগুলো আলগা হ'তে থাকে। কলুষতা আর পঙ্কিলতায় মিইয়ে যেতে থাকে অন্তরের পবিত্র আভা। অবশেষে একসময় সে হারিয়ে যায় অধঃপতনের করাল গ্রাসে।

চোখ হ'ল মানুষকে দেয়া আল্লাহ এক গুরুত্বপূর্ণ নে'মত। এক মহাসম্পদ। পবিত্র কুরআনে এসেছে, 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেট থেকে এমন অবস্থায় বের করেছেন যখন তোমরা কিছুই জানতে না এবং তোমাদের জন্য শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও হৃদয় সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর' *(নাহল ৭৮)*। তাই এই নে'মতের অপব্যবহার করলে একদিন আল্লাহ্র কাছে কঠোর জবাবদিহিতার সম্মুখীন হ'তে হবে। আল্লাহ বলেন, 'কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়- প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩৬)*।

সুতরাং চোখের হেফাযত করা বিশেষত বর্তমান যুগের তরুণ সমাজের জন্য অতীব যরূরী। কেননা হাল যামানায় সংঘটিত প্রায় সকল সামাজিক পাপের জন্য মূলত চোখই দায়ী। চোখের জানালা দিয়েই মনের দুয়ারে করাঘাত করে পাপের সব পসরা। নিম্নে চোখের পাপ থেকে বাঁচা এবং চোখের হেফাযতের জন্য কিছু পদক্ষেপ উল্লেখ করা হ'ল-

(১) দৃষ্টি সংযত রাখা : দৃষ্টি হ'ল শয়তানের বিষাক্ত তীরের মত, যা দিয়ে শয়তান খুব সহজেই মানুষকে পাপের ফাঁদে আটকাতে পারে। এজন্য আল্লাহ বলেন, (হে মুহাম্মাদ!) বিশ্বাসীদের বল, তারা যেন দৃষ্টিকে সংযত করে এবং যৌনাঙ্গকে হেফাযত করে। এটাই তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র। তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবগত *(আন-নূর ৩০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, চোখের যেনা হল দৃষ্টিপাত করা, জিহ্বার যেনা হল কথা বলা এবং অন্তরের যেনা হল কুপ্রবৃত্তি ও কুকামনার বশবর্তী হওয়া। আর যৌনাঙ্গ তা সত্য বা মিথ্যা প্রমাণ করে *(বুখারী হা/৬২৪৩; মুসলিম হা/২৬৫৭)*।

মনে রাখতে হবে, কেউ না জানলেও আল্লাহ বান্দার চোরা চাহনি, গোপন দৃষ্টি, অন্তরসমূহের গোপন কামনা সবই জানেন *(ফুছ্ছিলাত ১৯)*। সুতরাং আমাদেরকে সাধ্যমত তাক্বওয়া অবলম্বন করতে হবে এবং রাস্তাঘাটে চলাফেরা, পত্র-পত্রিকা ও মিডিয়ায় পদচারণা, ইন্টারনেটে ব্রাউজ করা সর্বক্ষেত্রে দৃষ্টি সংযত রাখার জন্য কঠোর অনুশীলন করতে হবে। যদি সেটা সম্ভব হয়, তবে চোখের খেয়ানত নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়ে ওঠে। আর এমন ব্যক্তিদের জন্যই রাসূল (ছাঃ) সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন- তিন ব্যক্তির চোখ কখনো জাহান্নাম দর্শন করবে না- (এক) যে চক্ষু আল্লাহর পথে (জিহাদে) পাহারা দিয়ে রাত্রি যাপন করেছে, (দুই) যে চক্ষু আল্লাহ্র ভয়ে কেঁদেছে এবং (তিন) যে চক্ষু আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বস্তু দর্শন করা থেকে বিরত থেকেছে *(তাবারাণী কাবীর হা/১০০৩, ছহীহ)*।

(২) একাকী নির্জনে না থাকা : একাকিত্ব ও কর্মহীনতা মানুষকে সহজেই পাপের পথে ধাবিত করে। মানুষের অধিকাংশ পাপ একাকিত্বের সময়ই সংঘটিত হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যদি লোকেরা একাকিত্বের মাঝে কি ক্ষতি আছে তা জানত, যা আমি জানি; তবে কোন আরোহী রাতে একাকী সফর করত না' *(বুখারী হা/২৮৯৮)*।

বর্তমান ফেৎনার যুগে গোপন পাপ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর একটি ভয়ংকর হুঁশিয়ারী বার্তা আমাদের মনে রাখা অতীব যরূরী। তিনি বলেন, 'আমি আমার উম্মতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা কিয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালার সমতুল্য নেক আমলসহ উপস্থিত হবে। আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন। রাবী ছাওবান (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হই। তিনি বলেন, তারা তোমাদেরই

ভাই এবং তোমাদেরই সম্প্রদায়ের। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক যে, একান্ত গোপনে সুযোগ পেলে আল্লাহ্র হারামকৃত বিষয়ে লিপ্ত হয় *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৫)*। আল্লাহ বলেন, 'তারা মানুষ থেকে গোপন করতে চায় কিন্তু আল্লাহ্র থেকে গোপন করে না; অথচ তিনি তাদের সংগেই রয়েছেন, যখন তারা রাতে আল্লাহর অপসন্দনীয় কোন কথা নিয়ে পরামর্শ করে। আর তারা যা করে তা সবই আল্লাহ্র জ্ঞানায়ত্ত' *(নিসা ১০৮)*।

(৩) শয়তানের প্রতারণা থেকে সদা সতর্ক থাকা : তরুণ সমাজকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, শয়তান আমাদের সবচেয়ে বড় ও প্রকাশ্য শত্রু। তাই নিজেকে কখনোই শয়তানের ফিতনা থেকে নিরাপদ ভাবা যাবে না। সেই সাথে নিজের ভেতরকার নৈতিকতাবোধকে সদা জাগ্রত ও সুদৃঢ় রাখতে হবে, যেন কোন অসতর্ক মুহূর্তেও শয়তান কোনভাবে প্রতারিত করতে না পারে। শয়তানের করাঘাত অনুভূত হওয়া মাত্রই শয়তানকে পরাজিত করার তীব্র স্পৃহা যেন সজাগ হয়ে ওঠে। এভাবে নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে একসময় অবচেতনভাবে নিজের আত্মনিয়ন্ত্রণ শক্তি ও বিবেকের বন্ধন প্রবল হয়ে উঠবে। মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিজের মধ্যে তাক্বওয়ার প্রতিরোধবর্ম তৈরী হবে। তখন যে কোন অনৈতিক কাজের প্রলোভন তাকে আর পাপের পথে নিতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

আর যদি শয়তানকে প্রশ্রয় দেয়া হয় এবং পাপ করাটা সহজ হয়ে যায়, তাহলে প্রবৃত্তির কাছে সে নিয়মিতই পরাজিত হতে থাকবে, এমনভাবে যে, সেখান থেকে বের হয়ে আসা তার জন্য হয়ে উঠবে ভীষণ কঠিন থেকে কঠিনতর। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, চাটাইয়ের বুনন বা ছিলকার মত এক এক করে ফেৎনা মানুষের অন্তরে আসতে থাকবে। যে অন্তরে তা গেঁথে যাবে তাতে একটি করে কালো দাগ পড়বে। আর যে অন্তর তা প্রত্যাখ্যান করবে তাতে একটি উজ্জ্বল দাগ পড়বে। এমনি করে দুই অন্তর দু'ধরনের হয়ে যায়। একটি হয়ে যায় মসৃণ সাদা পাথরের ন্যায়; যে অন্তর আসমান ও যমীন যতদিন থাকবে, ততদিন কোন ফেৎনা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আর অপরটি হয়ে যায় কলসির উল্টা পিঠের ন্যায় ধূসর কালো, যে অন্তর ভালোকে ভালো বলে জানবে না; আবার খারাপকেও খারাপ মনে করবে না, কেবল প্রবৃত্তির দাসত্ব ছাড়া। অর্থাৎ ভালো-মন্দ পার্থক্যের অনুভূতি হারিয়ে ফেলে সে প্রবৃত্তির অনুসরণে যা ইচ্ছা তাই করবে *(মুসলিম হা/১৪৪)*।

সুতরাং যদি নিয়মিত বিবেক ও হৃদয়ের এই প্রতিরোধ শক্তি জাগ্রত রাখতে পারা যায়, তবে একসময় তা আল্লাহ্র রহমতে হৃদয়ে স্থায়ী হয়ে যাবে। আর এমন হৃদয়ে সহজে কোন পাপ-পঙ্কিলতা প্রবেশ করতে পারবে না। যেমনটি উপরোক্ত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। অতএব মনকে নিয়ন্ত্রণ করার এই কৌশল আমাদেরকে অবশ্যই আয়ত্ত করতে হবে, যদি আমরা পাপমুক্ত অবস্থায় আল্লাহ্র কাছে উপস্থিত হতে চাই। সবশেষে যাবতীয় প্রতিরোধ ও অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোনক্রমে পাপ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করতে হবে এবং কোন একটি ভালো কাজ দ্বারা সেটির কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। যেন তার প্রভাব কোনভাবেই অন্তরে বিস্তার লাভ করতে না পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তুমি যেখানেই থাক, আল্লাহকে ভয় কর এবং পাপের পর পুণ্য কর, যা পাপকে মুছে ফেলবে' *(তিরমিযী হা/১৮৯৭)*।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে তাক্বওয়াশীল বান্দা হওয়ার তাওফীক দিন। আমাদেরকে চক্ষু হেফাযতের মত এই গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক প্রতিরোধবুহ্যটি ধারণ করা ও তার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আয়ত্ত করার তাওফীক দান করুন এবং ছোট-বড় যাবতীয় পাপকর্ম থেকে আত্মরক্ষার তাওফীক দান করুন। আমীন!

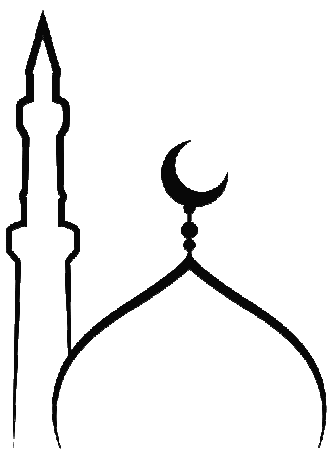

চিন্তার মানহাজ

তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে কোন বিষয়ে জানা বা সঠিক জ্ঞান অর্জন খুব একটা আয়াসসাধ্য কর্ম নয়। মানুষের মেধা ও ইচ্ছাশক্তির সাথে যদি একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা থাকে, তবে সে যে কোন বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জনের সম্ভাবনা রাখে। কিন্তু সঠিক গন্তব্যে পৌঁছতে কেবল জ্ঞানার্জনই কি যথেষ্ট? নাকি তাতে আরো বিশেষ কোন পন্থা অবলম্বন করা যরূরী!

বর্তমান যুগে আমরা এমন অনেক যুবক ভাইকে দেখি যারা জ্ঞানার্জন করছে বটে, কিন্তু জ্ঞানার্জন তাদের বিশেষ উদ্দেশ্য নয় অথবা জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে প্রকৃতার্থে তারা কোন সমস্যার সমাধান খুঁজছে না। বরং তারা পড়ছে বা জানার চেষ্টা করছে নিছক বিনোদনের জন্য কিংবা অন্যের সাথে বিতর্ক করার জন্য। আবার এমন কিছু বিষয় নিয়ে তারা জ্ঞানার্জনে ব্যস্ত, যা কিনা বাস্তব জীবনের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। আবার কেউবা ভুল পথে জ্ঞানার্জনের ফলে উল্টো পথভ্রষ্টও হচ্ছে। যার জ্বলন্ত উদাহরণ হ'ল জিহাদের নামে জঙ্গীবাদ। হয়তবা এসব তরুণদের মধ্যে আবেগ আছে, ভাল কিছু করার প্রেরণা আছে, কিন্তু জ্ঞানচর্চায় কোন সুশৃংখল ও নিয়মতান্ত্রিক কোন পদ্ধতি তারা অবলম্বন করতে চায় না। দু'একজন বক্তা কিংবা দু'একটি মোটিভেশনাল লেখনীকে সম্বল করে তারা তাদের চিন্তাধারা গড়ে তোলে। সেখানে না থাকে কোন বিশ্লেষণী শক্তি, আর না থাকে কোন ভারসাম্য। ফলে তাদের জ্ঞান তাদের বিশেষ উপকারে আসছে না। সুতরাং আধুনিক যুগে দ্বীনের সঠিক পথ ও পন্থা অনুসন্ধানের জন্য জ্ঞানার্জন যেমন যরূরী, তেমনি যরূরী হ'ল জ্ঞানার্জনের সঠিক পথ ও পদ্ধতি জানা। নতুবা জ্ঞানার্জন করার পরও পথভ্রষ্ট হওয়ার জোরদার সম্ভবনা থেকে যায়।

সুতরাং সঠিক পথে যদি জ্ঞান অর্জন করতে হয়, তবে অবশ্যই আমাদেরকে চিন্তার মানহাজ বা গতিপথ আগে নির্ধারণ করতে হবে। বিশ্লেষণী শক্তি অর্জন করতে হবে। জ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ক্ষমতা থাকতে হবে। সৃজনশীলতা ও সামগ্রিকতা থাকতে হবে। সঠিক ফলাফল নিয়ে ভাবতে হবে। সর্বোপরি সারলীকরণ থেকে মুক্ত থেকে দৃষ্টিভঙ্গিকে নির্মোহ ও নিরপেক্ষ অবস্থানে রাখতে হবে। তবেই জ্ঞানার্জন আমাদের জন্য উপকারী হয়ে উঠবে।

আর সেটা অর্জন করতে গেলে কিছু নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক। যেমন-

(১) কুরআন ও হাদীছ অনুযায়ী জ্ঞানকে যাচাই করে নেয়া : এটাই হ'ল ইসলামে জ্ঞানার্জনের মূল সূত্র। বিশেষতঃ দ্বীনের কোন বিষয়ে সঠিকভাবে জানা ও বোঝার জন্য কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে যুগপৎভাবে সামনে রাখতে হবে। সেই সাথে ছাহাবীরা কিভাবে সেটি বুঝেছেন ও ব্যাখ্যা করেছেন, তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে *(নিসা ৫৯, ১১৫; আশ-শূরা ৫২)*।

এটাই হ'ল শরী'আত গবেষণার মূলনীতি। একজন গবেষক যত বড় জ্ঞানী এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হন না কেন, গবেষণাকালে তিনি যদি এই মূলনীতি মাথায় না রাখেন এবং সেই সাথে নিরপেক্ষ ও নির্মোহ অবস্থান বজায় রাখতে না পারেন, তবে নিঃসন্দেহে তিনি ভুল করবেন। অবধারিতভাবে ভুল করবেন। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা দেখি, মানুষ কোন বিষয়ের সমাধান পূর্ব থেকেই নিজের মনের মধ্যে এঁকে রাখেন কিংবা নিজস্ব পরিমণ্ডল ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব থেকে একটা ধারণা বা অনুসিদ্ধান্ত তৈরী করে নেন। অতঃপর তার স্বপক্ষে কুরআন ও হাদীছের দলীল খোঁজেন। এটা নিরেট স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বার্থদুষ্টতা। কোন ব্যক্তি জ্ঞানবান হওয়া সত্ত্বেও গবেষণা পদ্ধতিতে এই সূত্রগত ভুল থাকায় তিনি স্বভাবতই ভুল পথে পরিচালিত হন *(জাছিয়াহ ২৩)*।

(২) নির্ভরযোগ্য আলেমদের মতামত নেয়া : কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নিজের জ্ঞানকে সর্বেসর্বা মনে করলেই বিপদ। কোন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা গেছে তা বোধগম্য হওয়ার পরও পুনরায় নিশ্চিত হওয়ার জন্য অন্যান্য নির্ভরযোগ্য ও তাক্বওয়াশীল আলেমদের সাথে পরামর্শ প্রয়োজন *(ইউসুফ ৭৬; নাহল ৪৩-৪৪)*। বিষয়টি যত বেশী জটিল ও বিতর্কপূর্ণ হবে, তত বেশী আলোচনা-পর্যালোচনার প্রয়োজন। পরিশেষে যেটি কুরআন ও হাদীছের সর্বাধিক অনুকূলে ধারণা হবে সেটিকেই অনুসরণ করতে হবে, যদিও তা নিজের চিন্তাধারা কিংবা নিজের পছন্দের মানুষের বিপরীত মত হয় *(যুমার ১৮)*।

(৩) চিন্তায় সামগ্রিকতা থাকা : চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের একটি বড় ত্রুটি হ'ল সমস্যার মূলে না গিয়ে শাখা-প্রশাখা নিয়ে পড়ে থাকা। এতে সমস্যার সমাধান তো হয়ই না, বরং নিত্য-নতুন সমস্যার ডালপালা গজিয়ে উঠতে থাকে। সুতরাং ফলপ্রসূ চিন্তাধারা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন সর্বদা মূল সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দেয়া। একমুখী বা একদেশদর্শী চিন্তা না করে সামগ্রিকভাবে চিন্তা

করা। যেমন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে যখন আমরা পরস্পর বিপরীত কোন অবস্থার মুখোমুখি হই, তখন যে কোন একটি প্রান্তিকের উপর নির্ভর না করে বিষয়টিকে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করা উচিৎ। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, আমরা সাধারণতঃ নিজ নিজ অবস্থান থেকে এবং আপন স্বার্থ দ্বারা তাড়িত হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি। এমনকি তখন কুরআন ও হাদীছকে পর্যন্ত নিজের স্বার্থে এবং নিজের মতকে প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহার করা হয়। আর এভাবেই ইখতিলাফ বা মতভেদের সৃষ্টি হয়। যদি স্বীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে মুসলিম উম্মাহ্র সামগ্রিক স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি থাকত, যদি সাময়িক আবেগের উর্ধ্বে মুসলিম উম্মাহ্র স্বায়ী কল্যাণের চেতনা জাগ্রত থাকত, সর্বোপরি কুরআন বা হাদীছ তথা শরীআ'তের মূল মাকছাদ যদি নযরে থাকত, তবে নিঃসন্দেহে আমাদের চিন্তাধারা এভাবে ক্ষুদ্র স্বার্থের কাছে বলি হ'ত না। প্রয়োজনে নিজের ক্ষতি বা পরাজয় স্বীকার করে হলেও আমরা উম্মাহ্র বৃহত্তর স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতাম। সুতরাং স্বার্থবাদিতা নয়, বরং মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর কল্যাণার্থে সামগ্রিক চিন্তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(৪) সমাধানমূলক চিন্তা করা : কোন বিষয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে কিংবা আবেগতাড়িত হয়ে জ্ঞানার্জন করা বর্তমান যুগে দ্বীনদার যুবকদের পথভ্রষ্টতার অন্যতম কারণ। সাময়িক কোন প্রেক্ষিতকে কেন্দ্র করে ভাসাভাসা জ্ঞানার্জন করেই তারা বিরাট কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে। এদের মধ্যে যারা জঙ্গীবাদ ও চরমপন্থার সাথে জড়িত, তাদের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তারা কী উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করছে এবং এর ফলাফলই বা কী- সে সম্পর্কে তাদের ধারণা খুবই অগভীর। কোন প্রকার বিচক্ষণতা ও সমাধানমূলক চিন্তাধারা তাদের মধ্যে কাজ করে না। স্বল্পজ্ঞান আর নির্বুদ্ধিতা নিয়ে তারা এত বড় বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে যা কিনা একজন নিবিষ্ট গবেষক বিদ্বানেরও চিন্তার বাইরে।

আরেক শ্রেণীর যুবক আবার ছুটছে অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানের পিছনে। রাসূল (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এমন কিছু বিষয় যেমন গাযওয়াতুল হিন্দ, ইমাম মাহদী, দাজ্জাল, ইয়াজুজ-মাজুজ ইত্যাদি তাদের চূড়ান্ত আকর্ষণের বিষয়। অথচ একজন ঈমানদারের জন্য এসবের উপর বিশ্বাস স্থাপনই যথেষ্ট। কবে নাগাদ এগুলো বাস্তবে রূপ লাভ করবে তা নির্ণয় করা আমাদের দায়িত্ব নয়। এদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল কথায় কথায় অলীক কল্পনা আর ষড়যন্ত্রতত্ত্ব খুঁজে বেড়ানো, যার কোন বাস্তবতা নেই। ভুমিকম্পের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে পর্যন্ত তারা ষড়যন্ত্রতত্ত্বের জালে ফেলে মানবসৃষ্ট বানিয়ে দেয়। এদের মাঝেও কোন সমাধানমূলক চিন্তাধারা দেখা যায় না। কেবল সমস্যা খুঁজেই তারা

জীবনপাত করে দেয়। সুতরাং পথভ্রষ্টতা থেকে আত্মরক্ষার জন্য উদ্দেশ্যহীন জ্ঞানার্জন থেকে বেঁচে থাকা অতীব যরূরী। সেই সাথে প্রয়োজন ধ্বংসাত্মক ও সমাধানহীন চিন্তাধারা থেকে ফিরে আসা।

এতদ্ব্যতীত আরেক শ্রেণীর যুবক রয়েছে যারা তথাকথিত উদারতাবাদ নামের এক অবাস্তব ইউটোপিয়ার পিছনে ছুটছে বিরামহীন। অবস্থানহীনতার মাঝেই তারা অবস্থান খোঁজে। অনৈক্যের মাঝেই তারা ঐক্য খোঁজে। বিশৃংখলতার মধ্যে শৃংখলা খোঁজে। নিজের ছোট্ট পরিবারের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতেই যারা হিমসিম খায়, তারাই কিনা সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে এক সূতোয় বাঁধতে চায়। কখনও একই দিনে ঈদ ও রামাযান পালন, কখনও আহলেহাদীছ না বলে শুধু মুসলিম বলার দাবী, কখনও ক্ষমতাসীন শাসকের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণের দাবী, কখনও এক পৃথিবী এক খিলাফতের দাবী, কখনও হাদীছ বাদ দিয়ে শুধু কুরআন মানার দাবী- ইত্যাকার আপাতঃজনপ্রিয় শ্লোগান মুখে আওড়িয়ে মিথ্যা আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চায়। অথচ বাস্তবতা হল এই যে, শিরক-বিদ'আত জর্জরিত মুসলিম উম্মাহ যদি তাওহীদ ও সুন্নাহের আলোয় আলোকিত না হয়, আক্বীদা-বিশ্বাসে প্রকৃত মুসলিম না হয়, তবে কোন অবস্থাতেই এই ঐক্য সম্ভব নয়। এমনকি সেই হক-বাতিল মিশ্রিত ঐক্যের কোন প্রয়োজনও নেই। কারণ ইহুদী-খৃষ্টানরাও ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু তাদের ঐক্য কি তাদেরকে হকের অনুসারী বানাবে কিংবা তাদেরকে জান্নাতী করবে? সুতরাং ঐক্যই মুখ্য নয় বরং বিশুদ্ধ ঈমান ও আমলই মুখ্য।

সুতরাং তথাকথিত কাল্পনিক নিরপেক্ষতা নয়, বরং সত্যের পক্ষে তথা তাওহীদ ও সুন্নাতের পক্ষেই দৃঢ় অবস্থান নিতে হবে। কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানের অবস্থান যেমন পরিষ্কার, তেমনই মুশরিক-বিদ'আতীদের বিরুদ্ধেও তাওহীদপন্থীদের অবস্থান পরিষ্কার থাকতে হবে। এর মাঝামাঝি অবস্থানের কোন সুযোগ নেই। সেটা বৃহত্তর ঐক্যের নামেই হোক কিংবা অন্য যে কোন নামে হোক। সুতরাং বৃহত্তর ঐক্য বলে কিছু নেই। সত্য ও মিথ্যা যেমন একীভূত হয় না, জান্নাত ও জাহান্নামের পথচারীদের অবস্থানও কখনও এক হয় না। হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব চিরকালীন। ঐক্য কেবল সম্ভব হকপন্থীদের মাঝেই। এই সত্যকে অনুধাবন না করে অন্ধ আবেগের বশে 'বিশ্ব মুসলিম এক হও' শ্লোগানে বিশ্বাস রেখে পথ চলা দ্বীনদার যুবকদের বিপথগামিতার অন্যতম কারণ।

(৫) চিন্তার ভারসাম্য বজায় রাখা।

দলীল ও বিশ্লেষণী শক্তির ব্যবহারে নিজের চিন্তাকে যেমন শাণিত করতে হবে, তেমনি ভিন্ন চিন্তার জন্যও একটি ভারসাম্যপূর্ণ স্পেস বা সুযোগ রাখতে হবে। এছাড়া কোন কথা বা কাজ করার সময় কেন সেটি করলাম, সে বিষয়ে নিজের কাছে পরিষ্কার ধারণা রাখতে হবে। সৎ ও যুক্তিপূর্ণ অবস্থান থাকতে হবে। এতে চিন্তার ক্ষেত্রে একটি শৃংখলা ও সাযুজ্য তৈরী হবে। কোন হঠকারিতা সেখানে স্থান পাবে না। সেই সাথে আত্মপরতা তথা নিজের মতকে চূড়ান্ত ভাবার প্রবণতা থাকবে না ইনশাআল্লাহ। এ প্রসঙ্গে একটি বক্তব্য উল্লেখ করা যায়, যেটি ইমাম শাফেঈর মন্তব্য হিসাবে প্রবাদতুল্য হয়েছে- قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول المخالف خطأ يحتمل الصواب 'আমার কথাটি সঠিক, তবে তা ভুল হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে এবং বিপক্ষে অবস্থানকারীর কথাটি ভুল, তবে তা সঠিক হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে'। এভাবে ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তাধারা বজায় রাখলে পারস্পরিক মতভেদগুলো অনেক ক্ষেত্রেই দূর করা সম্ভব।

পরিশেষে বলব, একটি সভ্য ও সুশীল সমাজ যেমন গড়ে উঠে জ্ঞানচর্চার উপর, তেমনি জ্ঞানের সঠিক চর্চা ও প্রয়োগ নির্ভর করে সুস্থ, স্বাভাবিক ও গঠনমূলক চিন্তাধারার উপর। সেজন্য চিন্তার মানহাজ সম্পর্কে জানা অতীব যরূরী। বিশেষত আধুনিক সমাজে যখন নানামুখী জ্ঞানচর্চার সুযোগ অবারিত হয়েছে, নানামুখী দল ও মতের সয়লাবে প্লাবিত হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্র, তখন নিজের জ্ঞানচর্চাকে সঠিক পথে রাখার জন্য চিন্তার শৃংখলা ও ইস্তিকামাত ধরে রাখা অপরিহার্য। নতুবা যে কোন সময়ে বিভ্রান্তির খপ্পরে পড়ে নিজের আক্বীদা ও আমল বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন!

মতভেদ নিরসন

মতভেদ এমন একটি বিষয়, যা মানবজাতির সৃষ্টিগত স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। নানা মুনির নানা মত- প্রবাদটির মত আমাদের জীবনের প্রতিটি ধাপে মতপার্থক্য এক অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। এই নানান মতের রহস্য ও পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন- 'আল্লাহ চাইলে তোমাদের সবাইকে এক দলভুক্ত করে দিতেন। কিন্তু তিনি চান তোমাদেরকে যে বিধানসমূহ দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা নিতে। অতএব তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্যপূর্ণ কর্মসমূহে প্রতিযোগিতা কর। (মনে রেখ) আল্লাহ্র নিকটে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন স্থল। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন যেসব বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে' *(মায়েদা ৫/৪৮)*। অন্য আয়াতে এসেছে, 'আপনার রব চাইলে সকল মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন। কিন্তু তারা সদা মতভেদ করতেই থাকবে। তবে তারা নয়, যাদের প্রতি আপনার রব অনুগ্রহ করেছেন এবং তাদেরকে এজন্যই সৃষ্টি করেছেন' *(হূদ ১১/১১৮-১৯)*। মানুষের বিবেক-বুদ্ধি, আবেগ-অনুভূতি, চর্চা-অভিজ্ঞতার আলোকে জ্ঞান-বুদ্ধির তারতম্য ঘটে। নিত্য-নতুন ভাবের উদয় হয়। সুতরাং মানবসমাজে মতভেদ থাকবেই। বরং মতের এই বিভিন্নতা আল্লাহ্র অসীম কুদরতের বহিঃপ্রকাশ। নইলে মানবজীবনধারা আমাদের চোখে এতটা বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে ধরা দিত না।

মতভেদ ও মতপার্থক্যের এই স্বভাবজাত বিষয়টি যখন আমরা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি, তখন লক্ষ্য করি আমাদের অধিকাংশই এ ব্যাপারে যথেষ্ট অস্পষ্টতা এবং বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত। একদল মনে করেন মতপার্থক্যই ইসলামের সৌন্দর্য। সুতরাং যত মত তত পথ। যে যে পথেই চলুক না কেন, শেষ ঠিকানা আরাধ্য সত্তার সান্নিধ্য। আর অপর দল মনে করেন, ইসলামে কোন প্রকার মতপার্থক্যের স্থান নেই। সুতরাং ভিন্নমত মানেই ভ্রষ্টতার পথ, বিভ্রান্তির পথ। অথচ সত্য লুকিয়ে আছে এতদুভয়ের মধ্যখানে।

মতভেদের ক্ষেত্রে ইসলামের অবস্থান হ'ল- কোন বিষয়ে মতভেদ থাকা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু যথাসাধ্য তার নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করতে হবে। আর যদি নিষ্পত্তি করা একান্ত সম্ভব না হয়, তবে তা নিয়ে বাড়াবাড়ি কাম্য নয়; বরং সহনশীলতার সাথে তা সমাধা করতে হবে। এক্ষেত্রে নীতিমালা হ'ল-

প্রথমতঃ কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মাধ্যমে মতভেদের নিষ্পত্তি করতে হবে। আল্লাহ বলেন- 'আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, সে বিষয়টি আল্লাহ এবং রাসূল (কুরআন ও সুন্নাহ)-এর দিকে ফিরিয়ে দাও। এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম' *(নিসা ৪/৫৯)*।

দ্বিতীয়তঃ কোন বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান বা দলীল পাওয়া গেলে সে বিষয়ে মতভেদ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও বিভক্ত হয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে মতভেদ করেছে। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি' *(আলে ইমরান ৩/১০৫)*।

তৃতীয়তঃ মতভেদ করে পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য ও বিভক্তি সৃষ্টি করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সকলে আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*।

চতুর্থতঃ কোন বিষয়ে স্পষ্ট দলীল না পেলে যদি মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়, তবে তার স্বীকৃতি দিতে ইসলাম নিষেধ করেনি। যেমন ইজতিহাদী মাসআলাগত বিষয়। কেননা মানুষ অসীম জ্ঞানের অধিকারী নয়। তাই তার অজ্ঞতা ও স্বল্পজ্ঞান থেকে জন্ম নিতে পারে ভিন্নমত। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন কোন বিচারক ইজতিহাদ করে এবং সঠিক মতে উপনীত হয়, তখন তাঁর জন্য রয়েছে দু'টি পুরস্কার। আর যদি সে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তবে তার জন্য রয়েছে একটি পুরস্কার (কেননা সে সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য চেষ্টা চালিয়েছে) *(বুখারী হা/৭৩৫২; মিশকাত হা/৩৭৩২)*। অনুরূপভাবে বনু কুরায়যায় আছরের ছালাত আদায় সম্পর্কে ছাহাবীদের মতভেদ থেকেও বুঝা যায় যে, সব মতভেদ বাতিলযোগ্য নয় *(বুখারী হা/৯৪৬; মুসলিম হা/১৭৭০)*। এবং ছাহাবীদের মধ্যেও মতভেদ ছিল। সুতরাং অসঙ্গত মতপার্থক্য যেমন ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়; তেমনিভাবে মতপার্থক্য মানেই যে নিন্দনীয়, তা নয়।

বর্তমান যুগে সচরাচর যে চিত্রটি আমাদের খুব পরিচিত তা হ'ল, ছোটখাটো কোন বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলেও আলেম সমাজ ও ধর্মীয় মহলে দেখা দেয় পারস্পরিক দূরত্ব এবং কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির অধৈর্য ও কদর্য প্রতিযোগিতা। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে তো বিষয়টি প্রায় মহামরির আকার ধারণ করেছে। অনেক সময় এই বাকযুদ্ধ এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, মনে হয় কেবল খুনোখুনিটা বাকি। এর পিছনে মূল যে কারণটি নিহিত, তা হ'ল- মতপার্থক্যের

প্রকৃতি না বুঝা এবং কোন মতপার্থক্য গ্রহণযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তাকে মতবিরোধের হাতিয়ার বানিয়ে নিজেদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভক্তি সৃষ্টি করা। অথচ অন্তরে ইখলাছ ও তাক্বওয়ার যথাযথ চর্চা থাকলে এবং উপরোক্ত মূলনীতিগুলো মনে রাখলে এধরনের মতবিরোধ সহজেই এড়ানো যেত। নিম্নে আমরা আরো কয়েকটি আচরণ ও পদ্ধতিগত মূলনীতি উল্লেখ করতে চাই, যেগুলো আমাদের মধ্যকার এই অনৈক্য দূরীকরণে ভূমিকা রাখতে পারে। যেমন :

(১) ধৈর্য, সহনশীলতা ও পরমতসহিষ্ণুতা অবলম্বন করা : এই শিষ্টাচার অনুসরণ করা মতভেদ দূরীকরণে সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র। আমাদের মনে রাখা ভাল যে, ভিন্নমত মানেই ভুল মত নয়। বরং বাহ্যদৃষ্টিতে কোন সময় একটি মতকে সঠিক মনে হলেও এমনও হ'তে পারে যে, ভিন্ন মতই সঠিক। মূসা (আঃ) ও খিযির (আঃ)-এর ঘটনা এক্ষেত্রে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় *(কাহফ ৬০-৮২)*। ইবনে তায়মিয়া বলেন, আমাদের যুগে যত নতুন নতুন ঘটনাবলী ও একের পর এক ফিতনাসমূহ বিস্তৃত হচ্ছে তার পিছনে মৌলিক দুটি কারণ- (১) জ্ঞানের স্বল্পতা। (২) ধৈর্য ও সহনশীলতার ঘাটতি'। তিনি বলেন, عامة الفتن التي وقعت من أعظم أسبابها قلة الصبر؛ إذ الفتنة لها سببان: إما ضعف العلم، وإما ضعف الصبر، فإن الجهل والظلم أصل الشر، وفاعل الشر إنما يفعله لجهله بأنه شر، وتكون نفسه تريده فبالعلم يزول الجهل، وبالصبر يحبس الهوى والشهوة فتزول تلك الفتنة 'মৌলিকভাবে ফিৎনা যেসব কারণে হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ হ'ল সহনশীলতার অভাব। যদিও ফিৎনার পিছনে দু'টি কারণ ক্রিয়াশীল। হয় তা জ্ঞানের কমতি, নতুবা ধৈর্যের ঘাটতি। অজ্ঞতা ও যুলুম সকল অকল্যাণের মূল। যে পাপ করে বা অন্যায় করে, সে মূলতঃ অজ্ঞতার কারণে এবং নিজের খাহেশাতের কারণেই তা করে। জ্ঞানের মাধ্যমে অজ্ঞতা দূর হয় আর ছবর বা সহনশীলতার মাধ্যমে খাহেশাত, স্বেচ্ছাচারিতা, কুপ্রবৃত্তির নিবারণ হয়। ফলে ফিৎনা দূরীভূত হয়' *(আল-মুসতাদরাক আলা মাজমূঈল ফাতাওয়া ৫/১২৭)*।

(২) সর্বদা পরামর্শ ও আলোচনার দুয়ার খোলা রাখা : যে কোন সমস্যা সমাধানের সর্বোত্তম পদ্ধতি হ'ল ভিন্ন মতাবলম্বীর সাথে আন্তরিকতা ও সত্যনিষ্ঠার সাথে আলোচনা করা। যদি সদিচ্ছা নিয়ে পর্যালোচনার দুয়ার উন্মুক্ত রাখা হয়, তবে যে কোন জটিল বিষয়ের সমাধানও সহজ হয়ে যায়।

এজন্য সর্বোত্তম পন্থায় আলোচনা-পর্যালোচনার পথ খোলা রাখতে হবে *(আলে ইমরান ৩/১৫৯; নাহল ১৬/১২৫)*। আল্লাহ বলেন, 'আর আমার বান্দাদেরকে বল, তারা যেন এমন কথা বলে- যা উত্তম। নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য উস্কানী দেয়; নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৫৩)*।

(৩) অধিকতর শক্তিশালী দলীলকে প্রাধান্য দেয়া : শরী'আতের কোন বিষয়ে উভয় মতের স্বপক্ষে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য দলীল উপস্থিত থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে অধিকতর শক্তিশালী মতটিকে প্রাধান্য দেয়া উচিৎ। আল্লাহ বলেন, 'যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে, অতঃপর তার মধ্যে যেটা উত্তম সেটার অনুসরণ করে, তাদেরকে আল্লাহ সুপথে পরিচালিত করেন এবং তারাই হ'ল জ্ঞানী' *(যুমার ৩৯/১৮)*।

(৪) ব্যক্তিস্বার্থ বা কারো প্রতি বিদ্বেষভাব দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া : আমাদের সমাজে মতবিরোধ সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম কারণ হ'ল ব্যক্তিস্বার্থ দ্বারা তাড়িত হওয়া এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করা। সমাজে অধিকাংশ মতভেদ বিষাক্ত আকার ধারণ করে মূলতঃ স্বার্থপরদের কারণে, যারা যে কোন মূল্যে ব্যক্তিস্বার্থকে চরিতার্থ করতে চায়। যে কোন মতবিরোধ নিরসনের পূর্বশর্ত হ'ল এই মহা ব্যাধি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা *(নিসা ৪/১৩৫; মায়েদা ৫/৮; শূরা ৪২/৪০)*।

(৫) বৃহত্তর ও সামগ্রিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া : বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনের জন্য অনেক সময় ক্ষুদ্রতর বিষয়গুলো ত্যাগ করতে হয় কিংবা এড়িয়ে যেতে হয়। এটা দুর্বলতা নয় বরং দূরদর্শিতার পরিচায়ক। মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইসহ খারেজী যুল-খুয়াইছিরার সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর আচরণ এই দূরদর্শিতারই সাক্ষ্য দেয়। রাসূল (ছাঃ) চাইলে তাদেরকে হত্যা করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি ছাহাবীদের বললেন, 'তাকে ছেড়ে দাও, ভবিষ্যতে কেউ যেন না বলতে পারে যে, মুহাম্মাদ তাঁর সাথীদের হত্যা করেন' *(বুখারী হা/৪৯০৫)*। হোদায়বিয়ার সন্ধি কিংবা মক্কা বিজয়কালে রাসূল (ছাঃ)-এর ভূমিকা এই মূলনীতির জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

(৬) আত্ম-অহংকারে লিপ্ত না হওয়া : অনেক সময় জ্ঞানী হিসাবে পরিচিত ব্যক্তিরাও নিজেদের অহংবোধ ধরে রাখতে গিয়ে স্বীয় মতের বাইরে ভিন্ন কোন মতকে সামান্য অবকাশও দিতে চান না। বরং অন্যায় যিদ ও হঠকারিতার মধ্যে ডুবে যান। অথচ দ্বীনের স্বার্থে অন্যের জ্ঞানকেও স্বীকৃতি দেয়ার উদারতা রাখতে পারলে বহু মতভেদপূর্ণ বিষয় সহজেই সমাধান করা সম্ভব হয়। মনে রাখা ভাল

যে, নিজের বিজ্ঞতাকে সর্বেসবা ভাবার চেয়ে বড় অজ্ঞতা আর নেই। আল্লাহ্র বাণী আমাদের জন্য অনেক বড় নছীহত- 'প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর অধিক জ্ঞানী আছে' *(ইউসুফ ১২/৭৬)*।

(৭) সর্বদা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি রুজু থাকা : কেননা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত পৃথিবীর কারো বক্তব্যই শতভাগ গ্রহণীয় নয়। ব্যক্তি যত জ্ঞানী ও যত বড় ইমাম বা নেতা হোন না কেন, যত বড় আকাবির-বুযুর্গ হোন না কেন, তার কথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথার বিপরীত হ'লে তা সর্বতোভাবে বর্জনীয় *(আন'আম ৬/১৫৩; আ'রাফ ৭/৩; নূর ২৪/৫১)*। কোন দূরতম ব্যাখ্যা দিয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

(৮) আত্মসংশোধনকে হীনতা মনে না করা : কারণ ইছলাহ বা সংশোধনই ঈমানদারদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যত নেককার ব্যক্তিই হোক, কেউই ভুলের ঊর্ধ্বে নয় *(ইউসুফ ১২/৫৩; নাজম ৫৩/৩২)*। সুতরাং ভুলের উপর টিকে থাকায় কোন কৃতিত্ব নেই; বরং আত্মসংশোধনেই রয়েছে সফলতা। আল্লাহ বলেন, 'যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে এবং নিজেদের সংশোধন করে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিতও হবে না' *(আ'রাফ ৭/৩৫)*।

(৯) অপরের কল্যাণকামী হওয়া : মানবতার বৃহত্তর কল্যাণচিন্তা যার মনে বিরাজ করে, মতবিরোধে লিপ্ত হওয়া তার জন্য প্রায় অসম্ভবই। বরং সংশোধন ও সংস্কারের প্রবল আকুতি উল্টো তাকে মতবিরোধ নিষ্পত্তির জন্য তাড়িত করে। তার ভাবনা জুড়ে প্রতিধ্বনিত থাকে আল্লাহ্র বাণী- মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে দাও। আর তাক্বওয়া অবলম্বন কর। যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হ'তে পার *(হুজুরাত ৪৯/১০)*। এমনকি অমুসলিমের প্রতিও সে থাকে দয়ার্দ্রচিত্ত *(মুমতাহিনা ৮)*। মানুষকে ক্ষমা করা, ছাড় দেয়া, সহমর্মিতা প্রকাশ করা ইত্যাদি হয় তার নিত্য বৈশিষ্ট্য *(আলে ইমরান ৩/১৩৪; নূর ২৪/২২)*। কোন অবস্থাতেই সে অন্যের সম্মানহানির চিন্তা করতে পারে না। কখনই মিথ্যা ও শঠতার আশ্রয় নিতে পারে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, একজন মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের সম্পদ, সম্মান ও জীবনের উপর হস্তক্ষেপ করা হারাম। কোন ব্যক্তির মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ মনে করবে *(মুসলিম হা/২৫৬৪)*। তিনি আরো বলেন, 'দ্বীন হ'ল কল্যাণকামিতার নাম' *(মুসলিম হা/৫৫)*।

(১০) মধ্যপন্থা অবলম্বন করা : একজন মুসলমানের জীবন হবে ভারসাম্যপূর্ণ। অতি অনুরাগ কিংবা অতি বিরাগ তাকে কখনই বিভ্রান্ত বা লক্ষ্যচ্যুত করবে না।

কোন অবস্থাতেই সে চরমপন্থা অবলম্বন করবে না। বাড়াবাড়ি করবে না। বরং সাধ্যমত মধ্যপন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে সমঝোতার পথ খোলা রাখবে *(বাক্বারাহ ২/১৪৩; ফুরক্বান ২৫/৬৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা সহজ পন্থা অবলম্বন করা, কঠিন পন্থা অবলম্বন করো না। মানুষকে সুসংবাদ দাও, দূরে ঠেলে দিও না *(বুখারী হা/৬৯; মুসলিম হা/১৭৩২)*।

বর্তমান যুগে আলহামদুলিল্লাহ দ্বীনের দাওয়াতের ময়দান যেমন প্রসারিত হচ্ছে, তেমনি এর বিপরীতে আলেম-ওলামা ও ধর্মীয় দল-উপদলের মধ্যে বাড়ছে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও কলহ-বিবাদ। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে ধার্মিক তরুণদের একটা বড় অংশ একে অপরের বিরুদ্ধে জবাব-পাল্টা জবাব, রদ-পাল্টা রদে মহা ব্যস্ত। কারো বিরুদ্ধে সামান্য ত্রুটি পাওয়া মাত্রই তার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগা, সম্মানহানি করা এগুলো এখন স্বাভাবিক কালচারে পরিণত হয়েছে। কোন বিষয়ে স্বচ্ছ জ্ঞান কিংবা প্রকৃত তথ্য না জানা থাকলেও তারা বড় বড় মন্তব্য, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যপূর্ণ বক্রোক্তি করতে দ্বিধা করছে না। ফলে মতভেদের বিষবাষ্প বাড়ছে বৈ কমছে না।

এর ফলে ক্ষতি হচ্ছে আমাদের দ্বীনদারিতার। হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের ইখলাছ। বিনষ্ট হচ্ছে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির পরিবেশ। বিপথগামী হচ্ছে আমাদের সমাজ। সর্বোপরি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর সার্বিক অগ্রযাত্রা। আল্লাহ বলেন, 'আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর ও নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করো না। করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি ও প্রতিপত্তি হারিয়ে ফেলবে। আর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন' *(আনফাল ৮/৪৬)*। সুতরাং যদি আমরা আল্লাহ্র প্রকৃত আনুগত্যশীল বান্দা হ'তে চাই, আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে ইসলামী সংস্কৃতির সুসভ্য বাতাবরণে সাজাতে চাই, ঐক্য ও সংহতির সুন্দর পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে চাই এবং মুসলিম উম্মাহকে বিজয়ী শক্তি হিসাবে দেখতে চাই, তবে আমাদেরকে অবশ্যই মতবিরোধের এই অশুভ বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ধৈর্য, সহনশীলতা ও পরমতসহিষ্ণুতার কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। পারস্পরিক সমঝোতার পথ খুঁজে নেয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে। অনাকাংখিত কারণে আমাদের মধ্যে শয়তান যেন কোনরূপ বিভেদের দরজা খুলতে না পারে, সে ব্যাপারে আমাদের সদা সতর্ক থাকতে হবে। আর এর মাঝেই নিহিত রয়েছে আমাদের দুনিয়াবী ও পরকালীন সাফল্য ও মর্যাদা। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন। আমীন!

তারুণ্যের আখলাকী নৈরাজ্য

তরুণ সমাজের একটি অংশ যখন বস্তুবাদের রঙিন নেশায় মত্ত হয়ে দুনিয়ার পিছনে অন্ধের মত ছুটছে, পুঁজিবাদের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার মরণ প্রতিযোগিতায় নেমেছে, ঠিক তখনই দ্বীনদার তরুণদের অপর একটি অংশ বস্তুবাদের নয়া টোপ গিলে দ্বীনকে বিক্রি করে, আখেরাতমুখিতাকে একপাশে রেখে অন্ধের মত দুনিয়ার পিছনে ঘুরছে। এ যেন এক নয়া ঈমানী বস্তুবাদ। দ্বীনদারিতার পোষাকে এই ঈমানী বস্তুবাদীদের প্রধান আলামত হ'ল ইখলাছহীনতা এবং আখলাকহীনতা। শয়তান যখন তাদের দ্বীনের পোষাক খুলতে পারেনি, তখন ইখলাছ আর আখলাকের ছিদ্র দিয়ে ঈমান ছিনতাইয়ের সুযোগ গ্রহণ করেছে। সরাসরি ঈমান হরণ করতে না পেরে বান্দার আখলাকী বর্মে আঘাত হেনে সঙ্গোপনে ঈমান হরণের আয়োজন করেছে। আর শয়তানের এই সূক্ষ্ম ফাঁদগুলো এমনই ধ্বংসাত্মক যে, যা থেকে নিজেকে রক্ষা করা তরুণদের জন্য যেন এক কঠিনতম যুদ্ধের শামিল। বাহ্যিক লেবাস-পোষাক, এমনকি ইলম ও আমলের প্রাচুর্য দিয়েও তা যেন ঠেকানো যাচ্ছে না। প্রাণান্ত চেষ্টা করতে করতে একসময় তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে। দ্বীনদারিতা, আল্লাহভীতি, জীবনের মহৎ লক্ষ্য, আখেরাতে মুক্তির তীব্র ইচ্ছা কোন কিছুই তাকে আগলে রাখতে পারছে না। নিমিষে হারিয়ে যাচ্ছে ঈমানী বস্তুবাদের চোরাস্রোতে। তরুণ সমাজের এই আখলাকী নৈরাজ্যের চিত্রগুলো দিনে দিনে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে। নিম্নে তার কিছু চিত্র তুলে ধরা হ'ল।

(ক) ভাইরাল হওয়ার আকাঙ্খা : বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে পরিচিতি পাওয়াটা খুব সহজ। সেজন্য ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক যেকোনভাবে ভাইরাল হওয়ার নেশা তরুণদের মধ্যে উন্মাদনা ছড়িয়েছে। মাল ও মর্যাদার লোভ এর সাথে যুক্ত হয়ে পুরো পরিবেশটা এখন ইখলাছ ও আত্মমর্যাদাহীন প্রদর্শনীতে গম গম করছে। যে যা নয়, তার চেয়ে বেশী প্রদর্শনের ইচ্ছা ও চেষ্টা আর কথায় কথায় আমিত্বের প্রতিষ্ঠার বিপুল আগ্রহ নিয়ে আত্মপ্রচারের ফুলঝুরি চলছে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে। পড়াশোনা কিছু দূর যেতে না যেতেই শায়খ, মুফতী বনে যাওয়া বকওয়াস তরুণদের ভিড়ে প্রকৃত

আলেমদের খুঁজে পাওয়া এখন ভীষণ দুষ্কর। রাসূল (ছাঃ) ইখলাছহীন লোক দেখানো আমলকারীদের হুঁশিয়ার করে বলেন, إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوا : وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : الرِّيَاءُ 'আমাদের তোমাদের জন্য সবচেয়ে যে বিষয়টি ভয় করি তা হ'ল ছোট শিরক। ছাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, ছোট শিরক কী? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, রিয়া বা লোক দেখানো আমল' *(ছহীহুল জামে' হা/১৫৫৫)*।

(খ) মাল ও মর্যাদার লিপ্সা : তরুণদের মধ্যে এই দু'টি রোগ এখন সবার শীর্ষে। দ্বীনের কাজে নেমে অর্থলিপ্সা, যশ-খ্যাতি আর পদ-পদবীর পিছনে ছোটার এই নেশা তরুণদের আমল-আখলাকের মধ্যে এক বিশাল নৈরাজ্য তৈরী করেছে। দাওয়াতী ময়দান এখন যেন আর দ্বীনের দাওয়াতের কেন্দ্র নয়, বরং ব্যবসাকেন্দ্র। পুঁজিবাদী, বস্তুবাদী সমাজের মত এখানেও যে যার মত নিজের দর বাড়াতে হাযারো অসুন্দর, অসৎ কৌশল ও ধোঁকাবাজির আশ্রয় নিচ্ছে। দ্বীনদারিতা এখানে কেবল মুখোশ। 'আল্লাহ কবুল করুন'-এর মত আল্লাহ্র সন্তুষ্টির আলাপও এখানে কেবলই মুখের বুলি। দিন শেষে মাল ও মর্যাদার গোপন প্রতিযোগিতাই সবকিছু। এ এক অন্তহীন নেশাগ্রস্ত পথ, যার পিছনে ছোটা মানুষটা শেষ পর্যন্ত জানে না, তার গন্তব্য কোথায়। ইন্নালিল্লাহ! রাসূল (ছাঃ) বোধহয় এজন্যই মুসলিম উম্মাহকে বার বার সতর্ক করেছেন, إِنَّ أَخْوَفَ ما أخاف عليكم الرياء والشَّهْوة الخَفِيَّة 'তোমাদের উপর আমার সবচেয়ে অধিক যে জিনিসের ভয় হয়, তা হ'ল লোক দেখানো আমল ও গোপন কুপ্রবৃত্তি' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫০৮)*। রাসূল (ছাঃ) স্পষ্ট হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ، بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ 'দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছাগলের পালে ছেড়ে দেয়া হ'লে তা যতটুকু না ক্ষতিসাধন করে, কারো সম্পদ ও ক্ষমতার লোভ এর চেয়ে বেশী ক্ষতিসাধন করে তার ধর্ম ও ধার্মিকতায়' *(তিরমিযী হা/২৩৭৬)*।

(গ) স্বার্থবাদিতা : মাল-মর্যাদার লোভের সাথে স্বার্থদুষ্টতা তরুণদের আখলাকী নৈরাজ্যে এনেছে এক নতুন মাত্রা। কবির ভাষায়- 'কথায় সবাই সবার, স্বার্থে যে যার'। ভদ্রবেশী এই স্বার্থদুষ্টদের কাছে নিজের স্বার্থটাই সবকিছু। সামান্য স্বার্থহানিতে তাদের ঈমান টলটলায়মান। নিজের ব্যক্তিস্বার্থে জাতির বৃহত্তর স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে তারা এক মুহূর্ত দেরী করে না। নিজের দীর্ঘ লালিত

নৈতিক অবস্থান ও আদর্শকে সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে এক লহমায় বিলিয়ে দিতে তারা বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করে না। যে কোন মূল্যে স্বার্থ উদ্ধারই তাদের প্রধান লক্ষ্য। নিজের স্বার্থ ধরে রাখতে সমাজে বিভেদের দুয়ার খুলতেও তাদের বিন্দুমাত্র বাধে না। এতে যদি সমস্ত দুনিয়াও ধ্বংস হয়ে যায়, তাতে তাদের যায়-আসে না। মুসলিম উম্মাহ ও সমাজের প্রতি দায়-দায়িত্বহীন এই মানুষগুলো আপাত ধার্মিক হ'লেও প্রচণ্ড রকম আত্মকেন্দ্রিক, নিষ্ঠুর এবং হৃদয়হীন। স্বার্থের জন্য হেন কিছু নেই, যা তারা করতে পারে না। এমন কিছু নেই, যা বলতে পারে না। এমন কোথাও নেই, যেখানে যেতে পারে না। যত নীচেই নামা লাগুক, তারা দ্বিধাবোধ করে না। মুহূর্তেই বন্ধুকে শত্রু, শত্রুকে বন্ধু বানাতে তারা নিত্য সিদ্ধহস্ত। নীতি-আদর্শের কোন মূল্য তাদের কাছে নেই। স্বার্থের কাছেই বন্দী তাদের বিবেক, বিদ্যা-বুদ্ধি।

(ঘ) মুনাফিকী : ঈমানদারিতার ও ঈমানহীনতার মাঝামাঝি অবস্থান হ'ল মুনাফিকীর। বিশ্বাসগত মুনাফিক এ যুগে না থাকলেও আমলগত মুনাফিকে গিজ গিজ করছে সমাজ। কারো প্রতি বিশ্বাস, আস্থা রাখার যেন উপায় নেই। শয়তানী ফেরেবে পড়ে মুহূর্তে মুহূর্তে মানুষগুলো যেন ঈমান হারাচ্ছে। টাকা-পয়সার নয়-ছয়, দুর্নীতি, জালিয়াতি তাদের হাতের মোয়া। তাদের কথার সাথে কাজের কোন মিল নেই। মুখের সুন্দর কথা ও আচরণের সাথে বাস্তব জীবনের যোজন যোজন তফাৎ। এদের উদ্দেশ্যেই রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদেরকে বলেছিলেন, 'এমন একদল মানুষের তোমাদের পর আসবে যারা মানত/অঙ্গিকার করবে কিন্তু পূরণ করবে না; খেয়ানত করবে, আমানতদার হবে না; তারা (মিথ্যা) সাক্ষ্য দেবে অথচ তাদের সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। আর তাদের মাঝে মেদওয়ালা লোক বাড়বে তথা আরাম, বিলাসিতা প্রকাশ পাবে' *(বুখারী হা/৬৬৯৫)*।

(ঙ) হিংসা ও অহংকার : সাধারণ নিরহংকারভাব তরুণটি ভাইটির হাসিমুখ নিমিষেই পরিবর্তন হয়ে যায়, যখন তার স্বার্থের ন্যুনতম ব্যাঘাত ঘটে। একটু টোকা দিলে প্রশস্ত অন্তরের মানুষটা অহংকারে হঠাৎ স্ফীত হয়ে ওঠে। হিংসায় জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে তার অন্তরটা ভীষণ রকম কুঞ্চিত ও সংকীর্ণ হয়ে আসে। এই দৃশ্য এখন দ্বীনদার ভাইদের মধ্যে অতীব সাধারণ। অথচ আমরা সবাই জানি অহংকার, হিংসার মত অপছন্দনীয় আর অপবিত্র কাজ আল্লাহর কাছে আর দ্বিতীয়টি নেই। তবুও আমরা নির্বিকারচিত্তে এই আচরণ করে যাচ্ছি। এতটুকু ভাবারও প্রয়োজন বোধ করছি না। পবিত্র কুরআনের সূরা আন'আমের ১২৫ নং আয়াতটি বড়ই ভাবায় যে, দ্বীনের প্রভাবটা আমাদের অন্তরে আসলে কতটুকু

বিরাজ করছে? নতুবা আমাদের আখলাক এতটা বিদ্বেষপূর্ণ আর অহংকারে ভরপুর হয় কিভাবে? আল্লাহ বলেন, আল্লাহ কাউকে সৎপথে পরিচালিত করার ইচ্ছা করলে, তিনি তার হৃদয়কে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন এবং কাউকে বিপথগামী করার ইচ্ছা করলে তিনি তাদের হৃদয়কে অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন, যেন সে (খুব কষ্ট করে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায়) আকাশে আরোহণ করছে। অর্থাৎ তার কাছে তখন ইসলামের অনুসরণ আকাশে আরোহণের মতই দুঃসাধ্য মনে হয়'।

হ্যাঁ, অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আপোষহীন অবস্থান থাকবে। অসৎ ব্যক্তিদের প্রতি স্বভাবজাত দূরত্ববোধ থাকবে। কিন্তু সেটা যখন হিংসা ও অহংকারের রূপ পরিগ্রহ করে, তখন তাকে আখলাকী অধঃপতন ছাড়া কি বলা যায়!

(চ) পণ্ডিতমন্যতা : জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহজলভ্যতা এখন বহু তরুণকে অকাল পণ্ডিত বানিয়ে ফেলেছে। যাকে তাকে কাফির, বিদ'আতী, মুশরিক আখ্যা দেয়ায় সিদ্ধহস্ত এই পণ্ডিতমন্য সদ্য তরুণদের দাপটে থরহরিকম্প এখনকার সোশ্যাল মিডিয়া। এদের পাণ্ডিত্যের দাপট ও কথাবার্তার ভাবসাব এমনই যে, তাদের দেখে মনে হয় তারা সবজান্তা সমশের কিংবা মুসলিম উম্মাহর মহান রক্ষাকর্তা। যদিও শিক্ষা-দিক্ষায় তাদের অবস্থান খুবই নগণ্য। বড়দের প্রতি এদের ন্যূনতম সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ নেই। নির্দিষ্ট কিছু অনুসৃত ব্যক্তি ছাড়া কাউকে গোনায় ধরে না। কথায় কথায় বিজ্ঞ আলেম-ওলামাদের ছোট-বড় ভুলগুলোকে অপমানজনকভাবে রদ করা এবং কুরুচিপূর্ণ ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভাষায় মুসলিম জামা'আত থেকে খারিজ করা এদের নিত্যকর্ম। মুখের ভাষা ও আখলাকে তারা এতটাই অবিনয়ী, উদ্ধত, হিংসুক, অহংকারী, ঝগড়াটে এবং কুটতর্কপ্রিয়, যা একজন দাঈ-র কাছে কোন অবস্থাতেই কাম্য নয়। মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইতিমধ্যে এই অতি সালাফী গোষ্ঠীটিকে 'জামাআতুত তাখরীজ' (মানহাজ থেকে খারিজকারী দল) বা 'জামাআতুত তাহযীর' (আলেমদের সম্পর্কে সতর্ককারী দল) হিসাবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। উগ্র আচার-আচরণে তারা চরমপন্থীদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

কথায় কথায় মানহাজ গেল রব তোলা, নাম ধরে অমুক-তমুকের কাছে ইলম নেয়া যাবে না- ঘোষণা করা, মানুষের দোষ-ত্রুটি জোর করে খুঁজে বের করে তাদেরকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা, পাণ্ডিত্য জাহির করতে বিশেষ বিশেষ আরব আলেমদের উদ্ধৃতি পেশ করা, 'কিবারুল উলামা'দেরকে আকাবির-বুযুর্গদের মত নির্ভুল ইমামতের আসনে বসিয়ে দিয়ে অন্যদেরকে তুচ্ছ করা,

অপমানজনক উপাধি দিয়ে উপহাস করা ইত্যাদিকে তারা ইসলামের মহান খেদমত মনে করে। এদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর একটি হাদীছ খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন, 'আমি আমার উম্মতের উপর জিহ্বার জ্ঞানী (عليم اللسان) তথা বাগ্মী মুনাফিকদেরকে অধিক ভয় করি' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০১৩)*। তাবেঈ আহনাফ বলেন, আমি ওমর (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি আমরা আলোচনা করতাম যে, মুখের (জিহ্বার) জ্ঞানী বা বাগ্মী মুনাফিকরা এই উম্মতকে ধ্বংস করে দিবে' *(মুসনাদুল ফারূক ২/৬৬১)*।

এই ঘরবন্দী পণ্ডিতমন্যরা সাধারণতঃ ময়দানে আসে না। সমাজের কোন উপকারে তেমন আসে না। তারা দায়িত্ব নিতে ভয় পায়। ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করে। কোন সংগঠন বা ফোরামের সাথে যুক্ত হয় না; বরং বিচ্ছিন্নভাবে নিজের মত থাকতেই স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। এজন্য জামা'আতবদ্ধ না হওয়ার ফৎওয়া তাদের জন্য প্রেসার রিলিজ তথা চাপমুক্তির কারণ হয়েছে। এক ধরনের অপরাধবোধ থেকেও তাদেরকে মুক্তি দিয়েছে। সুযোগ করে দিয়েছে রোমান্টিক প্রেমিকের মত সকলকে বাছবিচারহীন ভালবাসার বিমল অনুভূতি নিয়ে স্বাধীনভাবে চলার। যদিও বাস্তবে তাদের এই ভালোবাসার বাতচিৎ একেবারেই সত্য নয় বরং বৃত্তবন্দী।

তরুণদের এই আখলাকী নৈরাজ্যের বাস্তবতা তুলে ধরার পিছনে উদ্দেশ্য এটাই যে, আমাদের তরুণদের বুঝতে হবে যে, প্রকৃত মুসলিমের জন্য ছহীহ আক্বীদা ও আমলই যথেষ্ট নয়, বরং সমানভাবে আখলাকী উন্নয়নও যরূরী। যদি সেটা করতে না পারি, তবে বুঝতে হবে আমাদের শুদ্ধ আক্বীদা, শুদ্ধ আমলের চর্চা কেবল বাহ্যিক। আমাদের অন্তরে তার কোন প্রভাব নেই। আমাদের চরিত্রে তার কোন প্রতিফলন নেই।

মনে রাখতে হবে, মুসলিম উম্মাহর বর্তমান দুর্দশার মূলে কাজ করছে **প্রথমতঃ** ঈমানী দুর্বলতা। **দ্বিতীয়তঃ** জ্ঞানের স্বল্পতা। ঈমানী দুর্বলতা এমনই বিষয় যে, কেবল জ্ঞানার্জন করলেই তা দূর করা যায় না। যেমনভাবে ইহুদী-খৃষ্টানরা তাওরাত-ইঞ্জীল পড়ত, কিন্তু তারা ঈমানের উপর টিকে থাকতে পারে নি। আবার জ্ঞান বলতে কেবল পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানই বুঝায় না। নতুবা আজকের এই তথ্যপ্রযুক্তির যুগে জ্ঞানের স্বল্পতাকে কোন অজুহাত পেশ করা যায় না। আবার কুরআন বা হাদীছ পাঠ করতে জানলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না; নতুবা আরবী ভাষাভাষীরা সবচেয়ে বড় জ্ঞানী হ'ত, আবার বাতিল ফেরকার

আলেমরা জ্ঞানার্জনের পরও পথভ্রষ্ট হ'ত না। এজন্য রাসূল (ছাঃ) একশ্রেণীর পথভ্রষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যারা জ্ঞানী হওয়ার পরও সুপথপ্রাপ্ত নয়। তিনি বলেন, 'তারা শ্রুতিমধুর কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করবে, কিন্তু আল্লাহর বাণী তাদের গলা দিয়ে নামবে না তথা অন্তরে প্রবেশ করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমনভাবে তীর লক্ষ্যবস্তু ভেদ করে বেরিয়ে যায়' *(বুখারী হা/৪৩৫১)*।

সুতরাং কাংখিত সেই ঈমান ও ইলম হ'ল যা অন্তরে পৌঁছায়, যা অন্তর দিয়ে ধারণ করা যায় এবং হৃদয় দিয়ে অনুশীলন করা যায়। যে ঈমান ও আমলের সাথে অন্তরের সম্পর্ক নেই, তা কখনই প্রকৃত ঈমান ও ইলম নয়। সুতরাং এই অবস্থা থেকে উত্তরণে আমাদেরকে যেমন ঈমানের দুর্বলতা দূর করতে হবে, তেমনি বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জনের জন্য তাক্বওয়া, ইখলাছ ও আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণে ব্রতী হ'তে হবে। পাশাপাশি আখলাকের প্রশিক্ষণের জন্য অন্ততঃ দু'টি বিষয়ের চর্চা নিশ্চিত করতে হবে। যথা :

(ক) সততা : সততা আমরা কমবেশী বজায় রাখার চেষ্টা করি বটে, তবে কেবল চেষ্টাই যথেষ্ট নয়। কেননা পরিচ্ছন্ন অন্তর ও আখলাকী পূর্ণতা অর্জন করার জন্য যেটা প্রয়োজন- কথায় ও চিন্তায় শতভাগ সৎ থাকার সংগ্রাম। মিথ্যা ও প্রতারণার সংশ্লেষ থেকে নিজেকে সর্বতোভাবে দূরে রাখার প্রতিজ্ঞা। ভোগের লালসা ও মানুষের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা থেকেই অসততা ও দুর্নীতিপরায়ণতা তৈরী হয়। কেবল আল্লাহভীতি এবং সততার নিরন্তর চর্চার মধ্য দিয়েই এই প্রবণতা থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্য-সঠিক কথা বল, তাহলে তিনি তোমাদের কাজ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য লাভ করবে' *(আহযাব ৩৩/৭০-৭১)*।

(খ) আমানতদারিতা : সততার সাথে সাথে আমানতদারিতার চর্চাও অত্যন্ত যরূরী। আমানতদারিতা খেয়ানতের বিপরীত। মুনাফিকী ও দ্বিচারিতার বিপরীত। প্রগাঢ় দায়িত্ববোধ, কর্তব্যনিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা, আস্থাভাজন হওয়ার মধ্যেই তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এটা এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বোধ ও কর্মনীতি, যেখান থেকে তৈরী হয় চারিত্রিক সততা, দৃঢ়তা, ধৈর্য, উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতা, অহিংসা, অন্যের ক্ষতি করা থেকে মুক্ত থাকা প্রভৃতি মৌলিক

সৎগুণ। এজন্য রাসূল (ছাঃ) এমন কোন খুৎবা ছিল না যেখানে বলতেন না, 'যার আমানতদারিতা নেই, তার ঈমান নেই এবং যার ওয়াদা-অঙ্গীকারের মূল্য নেই তার দ্বীনও নেই' *(আহমাদ, ছহীহুত তারগীব হা/৩০০৪)*।

প্রিয় পাঠক! মানুষের মনুষ্যত্বের অধঃপতন এবং আখলাকী বিচ্যুতি শুরু হয় সততা ও আমানতদারিতায় ক্ষান্তি ঘটার মাধ্যমে। সততার যোগ যেমন নিজের সাথে, আমানতদারিতার যোগ তেমন অপরের সাথে। রাসূল (ছাঃ) নবুওতলাভের পূর্বেও বিশেষভাবে এদু'টি মৌলিক মানবীয় গুণের জন্য প্রশংসিত ছিলেন। বর্তমান প্রজন্ম জ্ঞান-বিজ্ঞানে এগিয়ে গেলেও মনুষ্যত্বের প্রতিযোগিতায় চরমভাবে পিছিয়ে পড়ছে। বস্তুবাদী ফেৎনার প্লাবন এবং নৈতিক ও আদর্শিক অবক্ষয় তাদেরকে নাবিকহারা নৌকার মত দিগ্বিদিকশূন্য করে দিয়েছে। সেজন্য এই যুগে নিজেকে লক্ষ্যপথে ধরে রাখতে ব্যক্তিজীবনে যেমন ঈমান ও ইলমের চর্চা প্রয়োজন, তাক্বওয়া ও ইখলাছের চর্চা প্রয়োজন, তেমনি সামাজিক জীবনে প্রয়োজন সততা ও আমানতদারিতার কঠোর অনুশীলনের। তাকওয়া ও ইখলাছের পথ ধরেই ঈমান ও ইলমের শুদ্ধিতা আসে। আর সততা ও আমানতদারিতার ধারাবাহিক চর্চার মধ্য দিয়ে আখলাকী শুদ্ধতা স্থায়িত্ব লাভ করে। প্রতি মুহূর্তে এই দুইয়ের চর্চা আমাদের হৃদয়জগতকে পরিচ্ছন্ন, প্রশান্ত, আলোকিত, অমলিন ও অবিচল রাখে।

মুমিনের জিহাদ মূলতঃ রাজনৈতিক নয়, বরং আদর্শিক ও নৈতিক। এই জিহাদ যত না মানবশত্রুর বিরুদ্ধে; তার চেয়ে অনেক বেশী অন্তরশত্রুর বিরুদ্ধে। এই জিহাদই মুক্তির পথ। কলবে সালীম তথা বিশুদ্ধ চিত্ত অর্জনের পথ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে হাযারো ফেৎনার জাল ছড়িয়ে শয়তান আমাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। শক্তহাতে সততা ও আমানতদারিতার ঢাল ধরে রেখে এই সকল চ্যালেঞ্জকে মুকাবিলা করতে হয়। অতএব শিরক ও বিদ'আত থেকে নিবৃত থেকে ঈমান ও আমলের শুদ্ধতা করা যেমন যরূরী, তদ্রুপই যরূরী রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্রে চরিত্রবান হয়ে আখলাকী শুদ্ধতা অর্জন করা। দুনিয়াবী যাবতীয় ফেৎনা থেকে মুক্ত থাকতে এবং আল্লাহর দেখানো পথে পবিত্র জীবন পরিচালনা করতে এর কোনই বিকল্প নেই। আল্লাহ আমাদেরকে ঈমানের পথে ইখলাছ ও ইস্তিকামাতের সাথে কায়েম ও দায়েম থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন!

হতাশার দহন থেকে মুক্তি

ব্যক্তিগত অপারগতা ও অজ্ঞতা; অপরদিকে সামাজিক অবিচার ও অনাচার-মূলতঃ এ দু'টি কারণ মানুষকে একদিকে যেমন জীবনযুদ্ধে অসহায় ও বিপন্ন করে তোলে, অন্যদিকে সমাজের বিরুদ্ধে করে তোলে বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী। আর এখান থেকেই ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হয় হতাশা আর বেদনার এক অবিচ্ছেদ্য মেঘকাব্য। যা কখনও একাকিত্বের বেদনায় মুষড়ে পড়ে গুমরে গুমরে কাঁদে আবার কখনওবা ক্ষোভের বিজলী বর্ষণে অবিরল ধারায় ঝরে পড়ে। মানুষের এই জীবনগতি প্রায় সবার ক্ষেত্রে একই রকম। তবে মূল পার্থক্য ঘটে বোধের জায়গায় এবং নীতির প্রতি অবিচলতায়। যারা ঈমানদার তারা ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাসকে নিত্য সাথী করে সাধ্যমত আদর্শের পথে নিজেকে পরিচালনা করেন। কিন্তু যারা ঈমানহীন তারা প্রায়শই এই যুদ্ধের ময়দানে নিঃশর্ত আত্মসমার্পণ করে স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। এই দ্বৈরথের মাঝে আবহমানকাল ধরে অতিক্রান্ত হচ্ছে মানব সমাজের দৈনন্দিন জীবনাচার।

বাংলাদেশ সহ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বস্তুগত উন্নয়নের জোয়ার ক্রমবর্ধমান হ'লেও মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে Depression বা হতাশার বিস্তার কিন্তু ধীরে ধীরে বাড়ছে। কারণ আধুনিক বস্তুবাদী দুনিয়ায় মিডিয়া ও মার্কেটিং-এর সীমাহীন Hype-এ মানুষের ব্যক্তিগত প্রত্যাশার জায়গা যেই উত্তুঙ্গ হারে বাড়ছে, প্রাপ্তির জায়গা নিঃসন্দেহে সেই হারে বাড়ছে না। ফলে মানুষ দ্রুতই নিজেকে প্রতিযোগিতার ময়দানে পরাজিত এবং পশ্চাদপদ ভেবে হতোদ্যম হয়ে পড়ছে। একটা সময় হতাশার গ্রাস থেকে নিজেকে আর বের করে আনতে পারছে না। ফলে অধিকাংশ সময় নেতিবাচক সিদ্ধান্তেই সে মুক্তি খুঁজে পেতে চাচ্ছে। কেউ ক্ষণিকের মিথ্যা সুখের জন্য বেছে নিচ্ছে অনৈতিক সিদ্ধান্ত কিংবা মাদকের মত নীল দংশন। কেউবা চূড়ান্ত পর্যায়ে বেছে নিচ্ছে আত্মহননের পথ।

বাংলাদেশে কিছু আত্মহত্যার ঘটনা সবাইকে নাড়িয়ে গেছে। এর মধ্যে ২০২২ সালে ঢাকার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী আবু মুহসিন খান (৫৮)-এর ফেসবুক লাইভে এসে আত্মহত্যা এবং তৎপূর্ববর্তী বক্তব্যসমূহ যথেষ্ট ভাবনার খোরাক যুগিয়েছে

সবাইকে। ফুটিয়ে তুলেছে দৃশ্যত চাকচিক্যপূর্ণ বর্তমান সমাজব্যবস্থার ভয়াবহ ফাঁপা দিকগুলো। জনাব আবু মুহসিনের কিছু কথা এতটাই বাস্তব ও রূঢ় সত্য, যা আমাদের সমাজ জেনেশুনেই চেপে রাখছে। যেমন- **প্রথমতঃ** এখান থেকে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে যে, মানুষ একে অপরের প্রতি দায়িত্ববোধ দিন দিন ভুলে যাচ্ছে এবং সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। শিথিল হচ্ছে পারিবারিক বন্ধন। মানুষ হয়ে পড়ছে নিঃসঙ্গ। সবকিছু থেকেও না থাকার বেদনায় জীবনে বেঁচে থাকা অর্থহীন হয়ে উঠছে অনেকের জন্যই।

পাশ্চাত্যের প্রচারণায় প্রলুব্ধ সমাজ এখন সন্তান গ্রহণে আগ্রহী নয়। ছেলে হোক, মেয়ে হোক দু'টি সন্তানই যথেষ্ট-এই শ্লোগান ছিল বাংলাদেশে আশির দশকের। আর বিংশ শতাব্দীর শ্লোগান হ'ল- 'দু'টি সন্তানের বেশী নয়, একটি হ'লে ভালো হয়'। এমনকি ২০১২ সালে এক সন্তান নীতি গ্রহণের জন্যও প্রস্তাব উঠেছিল। এই প্রচারণার সামাজিক ক্ষতি হ'ল মানুষ এখন সন্তান নিতে এমন অনাগ্রহী হয়ে উঠেছে যে, দুইয়ের বেশী সন্তান বর্তমানে খুব কম সংখ্যক পরিবারেই রয়েছে। এই দু'একটি সন্তান আবার যখন বড় হচ্ছে খুব স্বাভাবিকভাবেই পড়াশোনা কিংবা জীবিকার তাগিদে তারা পিতা-মাতা থেকে দূর-দূরান্তে চলে যাচ্ছে। তারপর বছরে হয়তো এক-দু'বার ঈদ কিংবা বার্ষিক ছুটিতে তাদের সাথে পিতা-মাতার দেখা হয়। আর যারা বিদেশে চলে যায়, তাদের সাথে এই ব্যবধানটা আরো দীর্ঘ হয়। কখনো কয়েক বছর চলে যায়। আর এভাবে সন্তানের অনুপস্থিতিতে একসময় প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হওয়া পিতা-মাতা ভুগতে থাকেন নিঃসঙ্গতায়। একাকিত্বের প্রহরগুলো তাদের জন্য হয়ে ওঠে চরম যন্ত্রণার। ইন্টারনেটের বদৌলতে যোগাযোগব্যবস্থা সহজলভ্য হ'লেও কৃত্রিমতার আবরণ ছেদ করে সেই যোগাযোগ কখনও সন্তানকে পাশে পাওয়ার বিকল্প হয় না। হাযারো মানুষের ভিড়ে প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে তাদের অব্যক্ত হৃদয় সদা ব্যাকুল থাকে।

ফলে বাহ্যতঃ সন্তানরা কে কোন দেশে থাকে বা কোথায় বড় বড় চাকুরী করে, তা নিয়ে পিতা-মাতার গর্বভরা কণ্ঠের আড়ালে যে দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে থাকে, তা অদেখাই থেকে যায়। মুখোশের আড়ালে থেকে যায় বেদনার এক অশ্রুঝরা ব্যথাতুর উপাখ্যান। এভাবে আমাদের সামাজিক সম্পর্কগুলো যেমন নড়বড়ে হচ্ছে, তেমনি আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম বেড়ে উঠছে গুরুজনদের নিবিড় স্নেহ-ভালোবাসার পবিত্র বন্ধন থেকে বঞ্চিত এক কুপমুণ্ডক পরিবেশে। এভাবে

পাশ্চাত্যের মত আমাদের সামাজিক সম্পর্কগুলো শিথিল হচ্ছে। আর বিচ্ছিন্নতা ও একাকিত্বের ঘেরাটোপে বাধা পড়ছে আমাদের পৌঢ় জীবন।

অর্থ-বিত্তের ঝনঝনানি আর সামাজিক স্ট্যাটাস যে কখনই মানুষকে প্রকৃত শান্তি দিতে পারে না তার বাস্তব উদাহরণ আবু মুহসিন। তার আর্তনাদ- একা থাকা যে কী কষ্ট-যারা একা থাকেন তারাই একমাত্র বলতে পারেন বা বোঝেন। এই আর্তনাদ কেবল আবু মুহসিনের নয়, বরং বর্তমান আধুনিক ও শিক্ষিত সমাজের ঘরে ঘরে কান পাতলে আজ এই আর্তনাদ শোনা যায়। আগামীতে হয়তো আরো শোনা যাবে। যদি না তথাকথিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির আশংকায় সন্তান গ্রহণকে নিরুৎসাহিত করার প্রকৃতিবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত থেকে আমরা সরে না আসি।

আশার কথা যে, চীন, জাপানসহ ইউরোপীয় দেশগুলো ইতিমধ্যে এই নীতির সামাজিক অপকারিতা বুঝতে পেরে পিছু হটেছে এবং জনসংখ্যাকে জনশক্তি হিসাবে বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে আমাদের দেশের সরকারেরও কিছুটা বোধোদয় ঘটেছে এবং জনসংখ্যাকে জাতীয় দুর্যোগ হিসাবে প্রচারের হঠকারিতাও কমিয়ে দিয়েছে। মূলতঃ আল্লাহ্‌র আইন বিরোধী কোন পদক্ষেপই সমাজে প্রকৃত শান্তি আনতে পারে না। এই বোধ যত জাগ্রত হবে, ততই আমরা ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের পথে ধাবিত হ'তে পারব ইনশাআল্লাহ।

এই সামাজিক অবক্ষয়ের অপর এক চিত্র আমরা দেখেছি গত ১০ই ফেব্রুয়ারী'২২ রাজধানীর বাড্ডাতে। এক হতভাগ্য পিতা তার ছোট সন্তানকে প্রায় সব সম্পত্তি লিখে দেয়ার পরও তার হাতে নিয়মিত শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়ে শেষ পর্যন্ত মারা গেছেন। এতেই শেষ হয়নি। সম্পত্তি বণ্টন নিয়ে দুই সন্তানের বিবাদ-কাটাকাটিতে পিতার লাশ ২৪ ঘন্টা বাড়ির গ্যারেজে পড়ে ছিল। পরে পুলিশ এসে লাশ দাফনের ব্যবস্থা করে। দ্বীন শিক্ষার অভাব ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সঠিক চর্চা না থাকায় মানুষ কিভাবে পশুর চেয়েও অধমে পরিণত হয়, তার একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ এই ঘটনা। সামান্য সম্পত্তির লোভে পরিবারগুলোতে জ্বলছে তুষের আগুন। ভাঙছে ভাই-বোনের সম্পর্ক, দূরত্ব তৈরী হচ্ছে পিতা-মাতার সাথে সন্তানের, নিত্য কলহ চলছে প্রতিবেশীদের মধ্যে। দ্বীনদারী আর সব জায়গায় থাকলেও সহায়-সম্পত্তির আগ্রাসী লোভ তাদের খেয়ে ফেলছে নেকড়ের মত। হিংস্র পশুর চেয়ে তারা ভয়ংকর হয়ে উঠছে সময়ে সময়ে।

দ্বিতীয়তঃ সমাজে ধর্মীয় জ্ঞানের অপপ্রয়োগও প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে এখানে। একজন ব্যক্তি যখন একই সাথে কালেমা পাঠ করে, এমনকি ওমরায় পরিহিত ইহরামের কাপড় দিয়ে কাফন দেয়ার জন্য অছিয়ত করে, আবার দ্বিধাহীন চিত্তে আত্মহননের মত মহাপাপ করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে- এখানে তার অভাবটা কিসের? আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস বা ভরসার দুর্বলতা না-কি দ্বীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের? মানুষ হিসাবে প্রত্যেকের জীবনে কঠিন মুহূর্ত আসতেই পারে, কিন্তু ঈমানদারদের জন্য সেটা কাটিয়ে ওঠা বিশেষ কষ্টসাধ্য নয় যদি আল্লাহ্‌র উপর তার পূর্ণ বিশ্বাস ও ভরসা থাকে। তাছাড়া প্রকৃতপক্ষে যারা দ্বীন বোঝেন, যাদের জীবনটা আল্লাহ্‌র সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত, তারা কখনও এমন অবসর খুঁজে পান না যে, একাকিত্বের বেদনায় জীবনটাকে অকেজো করে তুলবেন। বরং এই নিঃসঙ্গ সময়কে তারা আল্লাহ্‌র ইবাদতে নিবিষ্ট থাকার মোক্ষম উপলক্ষ হিসাবে নেন। দুনিয়াবী ব্যস্ততা থেকে মুক্ত থেকে আল্লাহ্‌র সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার এই সুযোগকে বরং তারা উপহার মনে করে সানন্দেই গ্রহণ করেন। যারা মহান প্রভুর সাথে সম্পর্কের এই স্বাদ আস্বাদন করতে পারেনি, একাকী জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হ'তে পারে, কিন্তু একজন প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তির নিকট তা মোটেই প্রত্যাশিত নয়। এই ঘটনায় বোঝা যায় যে, এদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্বীনের প্রতি যথেষ্ট ভালোবাসা রয়েছে, কিন্তু দ্বীন সম্পর্কে ভয়াবহ অজ্ঞতার কারণে অধিকাংশ মানুষ ডুবে আছে কুসংস্কার ও বিভ্রান্তির অতল তলে।

সর্বোপরি বর্তমান প্রেক্ষাপটে যে প্রশ্নটি বার বার আমাদের মনে ধাক্কা দিচ্ছে তা হ'ল, হাযারো ইতিবাচক দিক পেছনে ঠেলে অধিকাংশ মানুষ কেন নেতিবাচক সিদ্ধান্তকেই অগ্রাধিকার দেয়? কেন শত প্রাপ্তির মাঝেও নিজের অপ্রাপ্তিগুলোকেই বড় করে দেখে? কেন হতাশার প্রান্তসীমায় পৌঁছে অবশেষে নিজেকে নিঃশেষ করে দেয়ার মত চূড়ান্ত পরিকল্পনা পর্যন্ত করে? এর উত্তর খুঁজতে গেলে আমরা কয়েকটি বিষয়কে সামনে আনতে পারি-

(১) আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসের দুর্বলতা : যে ব্যক্তি তার সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখে না বা আস্থা রাখে না; সে কখনই জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না ও সঠিক পথে পরিচালিত হ'তে পারে না। কেননা সে তার জীবনের মূল ভরকেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। নিঃশ্বাসে, বিশ্বাসে যার যোগ আল্লাহ্‌র সাথে, সঠিক পথের যাত্রী হওয়ার নছীব কেবল তারই হয় *(আলে ইমরান ৩/১০১)*।

(২) জীবনের মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞতা : মানুষকে আল্লাহ খুব সংক্ষিপ্ত একটি সময় দিয়েছেন তাকে পরীক্ষা করার জন্য। একজন পরীক্ষার্থী যেমন তার পরীক্ষার মূল্য বুঝে বলে পরীক্ষার হ'লে ভালো ফলাফলের জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করে, শেষ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে; ঠিক তেমনি এই জীবন পরীক্ষার মূল্য সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তি পার্থিব জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে গুরুত্বপূর্ণ ভেবে পরকালীন সাফল্যের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। শুরু কিংবা মধ্যটা খারাপ গেলেও শেষটা ভাল করার জন্য যারপরনেই ইচ্ছা তাকে ব্যতিব্যস্ত রাখে। কিন্তু যে ব্যক্তি অজ্ঞ, সে শিশু, পাগল কিংবা চতুষ্পদ জন্তুর মতই উদাসীন থেকে যায়। এই পরীক্ষার হল তার জন্য কেবল সময় পার করার স্থান ছাড়া কিছু নয়। জীবনের প্রকৃত মূল্য সে জানে না, অনুধাবনও করতে পারে না। তাই এর বিনাশ সাধনেও সে কুণ্ঠাবোধ করে না।

(৩) জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে অসচেতনতা : আল্লাহ্র দাসত্বকে যে জীবনের মূল লক্ষ্য বানাতে পারেনি, সে নিঃসন্দেহে লক্ষ্যহীন কিংবা ভুল লক্ষ্যপানে ছুটে চলা ব্যক্তি *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। সে আল্লাহ্র দাসত্বের মূল অংক মেলানো ভুলে গিয়ে সর্বদা ভুল অংক মেলাতে সচেষ্ট হয়। তারপর সহসা কোন অংক মেলাতে ব্যর্থ হ'লে খুব সহজেই সে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে।

(৪) ধৈর্যের অভাব : পার্থিব জীবন আমাদের পরীক্ষার জীবন। যে কোন সময় যে কোন ধরনের পরীক্ষা আমাদের উপর নেমে আসবে। কখনও সে পরীক্ষা কঠিন থেকে কঠিনতর হবে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই হাল ছেড়ে দেয়া মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। সর্বাবস্থায় সে আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখবে এবং ধৈর্য সহকারে সুসময়ের জন্য অপেক্ষা করবে, এটাই ঈমানের দাবী। যারা এই ধৈর্যের নীতি অবলম্বন করে না, তারা অতি সহজেই হতাশাগ্রস্ত হয়ে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

(৫) আত্মকেন্দ্রিকতা : আধুনিক সমাজব্যবস্থায় প্রত্যেক মানুষ স্বতন্ত্র সত্তা (Entity) হিসাবে বসবাস করতে চায়। অর্থাৎ যে যার মত স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবে, কেউ কারো ব্যাপারে নাক গলাবে না- এটাই আধুনিক জগতের আদর্শিক মূলনীতি। ফলে একে অপরের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া এখানে যরূরী নয়। স্বার্থপরতা, অসামাজিকতা, আত্মকেন্দ্রিকতা এই সমাজব্যবস্থার আবশ্যিক অনুষঙ্গ। তাই একে অপরের অতি কাছে থেকেও তারা একেকজন যেন বসবাস করে অবরুদ্ধ জানালার ভেতরে। ফলে ফিতরাত

বা প্রকৃতিবিরোধী এই সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ সহজেই হতাশা ও বিষণ্নতাগ্রস্ত হচ্ছে। ফিনল্যাণ্ড, জাপানের মত দেশগুলো বিপুল সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও সেসব দেশে আত্মহত্যার উচ্চহার এ কথারই সাক্ষ্য দেয়।

মুক্তির পথ :এ অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে চাইলে করণীয় হ'ল-

প্রথমতঃ ইতিবাচক জীবন যাপন করা : মনে রাখতে হবে, মানুষের জীবন ভালো-মন্দ, সহজ-কঠিন, ইতি আর নেতির বিচিত্র সমাহার। জীবনে কখনো ভালো সময় আসবে, কখনও মন্দ সময় আসবে এটাই জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ। অতএব একজন মুমিন ব্যক্তি সর্বদা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে তার জীবন পরিচালনা করবে। এমনভাবে যে, আনন্দের সময় সে আত্মহারা হবে না, আবার দুঃখের সময় শোকে বিবেকহারা হয়ে পড়বে না। বরং জীবনের সকল অবস্থায় কৃতজ্ঞতা ও সহনশীলতার সমাহারে ভারসাম্য বজায় রাখবে। সবকিছুকে যথাসম্ভব ইতিবাচকভাবে নেবে। যেমন ওহুদ যুদ্ধের সাময়িক পরাজয়ে মুসলমানরা যেন অধিক শোকাকুল না হয়, সেজন্য তাদের মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সান্ত্বনা সূচক বক্তব্য, 'তোমাদেরকে যদি আঘাত লেগে থাকে, অনুরূপ আঘাত (বদর যুদ্ধে) তো তাদেরও লেগেছে এবং মানুষের মধ্যে এ (বিপদের) দিনগুলিকে পর্যায়ক্রমে অদল-বদল করে থাকি' *(আলে ইমরান ৩/১৪০)*। ঈমানদারের পরিচয় দিতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুমিনের অবস্থা বিস্ময়কর। সকল কাজই তার জন্য কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া অন্য কেউ এ বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারে না। যখন তারা কল্যাণ ও মঙ্গলের মধ্যে থাকে, তখন সে শোকরগুযার থাকে। আর যখন অসচ্ছলতা কিংবা বিপদাপদে আক্রান্ত হয়, তখন সে ধৈর্যধারণ করে। ফলে প্রতিটি অবস্থাই তার জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়' *(মুসলিম হা/৭৩৯০)*।

দ্বিতীয়তঃ হতাশাকে প্রশ্রয় না দেয়া : আমাদের যাপিত জীবনে সুখ-দুঃখের সাথে হতাশার যোগ খুবই ওতপ্রোত। যে কোন অপ্রত্যাশিত কথায় ও কাজে কিংবা অপ্রাপ্তির বেদনায় আমাদের মধ্যে হতাশা আসতেই পারে। কিন্তু একজন বিশ্বাসী মানুষ তা নিজের মধ্যে জিইয়ে রাখতে পারে না। তার চেষ্টা থাকে যে কোন মূল্যে তা দূরীভূত করা কিংবা ভুলে যাওয়া। কেননা আল্লাহ্র বাণী হ'ল- 'আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া পথভ্রষ্ট লোকদের কাজ' *(হিজর ৫৬)*। কুরআনে অন্যত্র এসেছে, তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না।

নিশ্চয়ই অবিশ্বাসীরা ব্যতীত কেউই আল্লাহ্র করুণা থেকে নিরাশ হয় না *(ইউসুফ ১২/৮৭)*। আল্লাহ বলেন, এই পৃথিবীতে কিংবা তোমাদের ব্যক্তিজীবনে যে সকল বিপদাপদ আসে, তা ঘটার আগেই আমি তা কিতাবে (তাকদীরে) লিপিবদ্ধ করে রেখেছি। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহ্র পক্ষে খুব সহজ। এটা এজন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য আনন্দে উদ্বেলিত না হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পসন্দ করেন না কোন উদ্ধত-অহংকারীকে *(হাদীদ ৫৭/২২-২৩)*। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকাই ঈমানদারের পরিচয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেয়েছে যে, আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে রাসূল হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে' *(মুসলিম হা/৫৭)*।

তৃতীয়তঃ মানুষের সাথে সুসম্পর্ক রাখা : মানুষের সাথে মিশতে পারা এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে পারা হতাশা ও বিষণ্নতা থেকে বেরিয়ে আসার অন্যতম কার্যকর মহৌষধ। এজন্য রাসূল (ছাঃ) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ও সৎসঙ্গে থাকাকে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। আত্মকেন্দ্রিক ও অসামাজিক মানুষ বরাবরই নিজের কষ্টের সময়গুলো মানুষের সাথে ভাগাভাগি করতে না পেরে নিদারুণ মানসিক কষ্টে আপতিত হয়। সুতরাং সমাজের ভালো মানুষদের সংস্পর্শে থাকা, সংঘবদ্ধ ও সাংগঠনিক জীবন যাপন করা মানুষের জন্য খুবই যরূরী এবং ইসলামের অন্যতম নির্দেশনা। একাকী বিচ্ছিন্ন জীবন ইসলামে কাম্য নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, জামা'আতবদ্ধ জীবন রহমত আর বিচ্ছিন্ন জীবন হ'ল আযাব *(ছহীহুল জামে' হা/৩১০৯)*। তিনি আরো বলেন, তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস কর। বিচ্ছিন্নতা থেকে সাবধান থাক। কেননা শয়তান বিচ্ছিন্নজনের সাথে থাকে এবং সে দু'জন (ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ) মানুষ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। যে লোক জান্নাতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম জায়গার ইচ্ছা পোষণ করে সে যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকে' *(তিরমিযী হা/২১৬৫)*।

চতুর্থতঃ শয়তানী কুমন্ত্রণার ব্যাপারে সতর্ক থাকা : শয়তান মানুষের চূড়ান্ত শত্রু। সে সর্বদা কুমন্ত্রণা যোগায় মানুষকে অন্যায় পথে নেয়ার জন্য। আল্লাহ বলেন, 'শয়তান তোমাদের দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন' *(বাক্বারাহ ২/২৬৮)*। এজন্য সর্বদা শয়তানের ফেরেব থেকে সর্বদা সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

পঞ্চমতঃ তাক্বদীর ও তাওয়াক্কুল অবলম্বন করা : আল্লাহ্র উপর ভরসা ও তাক্বদীরে বিশ্বাস যে কোন মানুষের জন্য অফুরন্ত আত্মবিশ্বাস ও সুদৃঢ় মনোবলের খোরাক। কেননা সে জানে যে, সবকিছুর নিয়ন্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। বিশ্বাসী বান্দার একান্ত মঙ্গলের জন্যই তাঁর কর্মপরিকল্পনা। এই বিশ্বাস তাকে কখনও পথ হারাতে দেয় না। আশার প্রদীপ নিভতে দেয় না। বরং বুক ভরে প্রশান্তির নিঃশ্বাস নিয়ে সে সর্বাবস্থায় বলতে পারে- ***আলহামদুলিল্লাহ***। সে সর্বদা বিশ্বাস রাখে- إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا 'নিশ্চয় কঠিনের সাথে রয়েছে সহজ, কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি' *(সূরা শারাহ ৬)*। শত কষ্টের মাঝেও হাযেরা (আঃ)-এর মত প্রগাঢ় ভরসা নিয়ে তার মুখে উচ্চারিত হয়- إذن لن يضيعنا الله 'আল্লাহ আমাদেরকে কখনই ধ্বংস করবেন না'।

মহাবিপদের মুখেও বিচলিত না হয়ে মূসা (আঃ)-এর মত দৃঢ়তার সাথে বলতে পারে- كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ 'কখনই না, নিশ্চয়ই আমার সাথে আমার রব রয়েছেন, অচিরেই তিনি আমাকে পথ দেখাবেন' *(শুআ'রা ৬২)*। হতাশায় ডুবু ডুবু অবস্থাতেও সে রবকে ভুলে যায় না। বরং সমগ্র অন্তর ঢেলে দিয়ে মূসা (আঃ)-এর মত তাঁর সমস্ত চাওয়া-পাওয়া, বেদনা-আর্তি কেবল আল্লাহর কাছেই নিবেদন করে- رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ 'হে আমার রব! আমার প্রতি আপনি যা কিছু কল্যাণ নাযিল করবেন, আমি তারই মুখাপেক্ষী' *(ক্বাছাছ ২৪)*। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ্র প্রতি এই দৃঢ় ঈমান ও বিশ্বাস দুনিয়াবী যে কোন হতাশা ও অপ্রাপ্তির কষ্ট থেকে মুক্তির অব্যর্থ ঔষধ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে দুনিয়াবী পরীক্ষার মঞ্চে সদা-সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের উপর অবিচল রাখুন এবং যাবতীয় হতাশা থেকে মুক্ত থেকে আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ভরসা রেখে জীবন পরিচালনার তাওফীক দিন। আমীন!

ঝরাপাতা জীবন ও মৃত্যুর অমোঘ বাস্তবতা

২০২১ সালের ২৬শে মার্চ আমাদের প্রিয় দ্বীনী ভাই মতীউর রহমান এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় একই সাথে হারিয়েছেন দুই বোনসহ পরিবারের পাঁচ পাঁচ জন সদস্য। পরদিন ২৭শে মার্চ রাত ১২-টা নাগাদ রংপুর, পীরগঞ্জে অনুষ্ঠিত জানাযায় শরীক হই। বেশ বড় বাড়ি মতীউর ভাইদের। একদিন আগেও ছিল প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। নাতি-নাতনিদের আদর ভরা মিষ্টি মিষ্টি বুলি নানা-নানী, মামা-মামীদের হৃদয়ে প্রশান্তির পরশ বুলিয়ে দিত। নিত্যদিন কত কাজ ছিল, কত পরিকল্পনা ছিল তাদের। সন্তানদের লেখাপড়া, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-খামার সবকিছু মিলিয়ে ব্যস্ত জীবন। আজ সেই ভরা বাড়িতে হঠাৎ নিস্তব্ধতা। হাহাকার শূন্যতা। জানাযায় উপস্থিত উঠোনভরা গণজমায়েত ছাপিয়ে সেই বাড়ির প্রতিটি কোণ থেকে খাঁ খাঁ মরুর বিরান সুর এসে অন্তরে শেলের মত বাঁধে। মৃত্যুর অমোঘ বাস্তবতাকে আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি না। মৃত্যুর চেয়ে সুনিশ্চিত আর কিছু নেই। কিন্তু তবুও সেই মৃত্যু যখন আপনজনের চিরবিদায়ের বার্তা হয়ে নিষ্ঠুরভাবে ধরা দেয়, তখন সেই বাস্তবতাকে বড় অবাস্তব বলে মনে হয়।

মহান প্রভু ধৈর্যশক্তি নামক এক মহা নে'মত না দিলে এই বিচ্ছেদ বেদনা সওয়া অথৈ পারাবার পাড়ি দেয়ার চেয়ে দুঃসাধ্য হয়ে উঠত। বাড়ির উঠোনেই নতুন চারটি কবর। আমি বেদনাতুর মতীউর ভাইকে দেখি। অব্যক্ত বেদনায় মুষড়ে পড়া তার পরিবারের সদস্যদের দিকে তাকাই। ভাবতে পারি না, কীভাবে পরিবারটি এতগুলো প্রিয়জন হারানোর কষ্ট সইবে? কোথায় এই অন্ত হীন ব্যথার উপশম খুঁজবে! প্রতিটি সকাল যে হবে তাদের জন্য এক নতুন বেদনার উপাখ্যান! এই লেখা যখন লিখছি তখন মাদারীপুরে এক স্পীড বোট দুর্ঘটনায় মুহূর্তেই ২৬ জন জলজ্যান্ত মানুষ লাশে পরিণত হ'ল। নয় বছরের শিশু মীম হারালো বাবা-মা আর ছোট দুই বোন। পরিবারে তার আর কেউ রইল না। মৃত্যুর অমোঘ বাস্তবতার কাছে আমরা কি নিদারুণ অসহায়!

প্রিয় পাঠক, মৃত্যুর এই বিভীষিকা প্রতিনিয়ত আমাদের তাড়িয়ে ফিরছে- একথা জানার বাকি না থাকলেও আমরা কি নিজেদের অত্যাসন্ন মৃত্যু নিয়ে

দু'দণ্ড ভাববার অবকাশ পেয়েছি? নাকি যৌবনের তাজা রক্ত, অর্থ-বিত্ত কিংবা ক্ষমতার মোহে আরো বহুকাল কাটানোর রঙিন স্বপ্ন দেখছি! এই স্বপ্ন ফিঁকে হওয়ার সময় কি এখনও হয়নি! করোনাকালে কত রথি-মহারথি, বিত্তশালী, ক্ষমতাশালীদের অকস্মাৎ মৃত্যু আমরা দেখেছি। ধন-সম্পদ, পরিকল্পিত ডায়েট, সুরক্ষিত ঘরবাড়ি, পৃথিবীর সর্বোত্তম চিকিৎসাব্যবস্থাও তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি। দুনিয়াতে অট্টালিকার পর অট্টালিকা যার হাতে গড়া, তিনি এখন নিঃসঙ্গ মাটির বিছানায় নিজের দেহাবশেষ রক্ষায় ব্যস্ত। কেউই মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পায়নি। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই; যদিও তোমরা সুউচ্চ দুর্গে অবস্থান কর' *(সূরা নিসা ৭৮)*।

তাছাড়া সময়ের হিসাব কষলে আমাদের যাপিত জীবনের স্বাভাবিক আয়ুষ্কালই বা কতটুকু? আখেরাতের তুলনায় তা এতটাই গৌণ যে, কাল কেয়ামতের ময়দানে যখন জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কতদিন ছিলে দুনিয়াতে? আমাদের জবাব হবে- একটি সকাল কিংবা একটি সন্ধ্যা *(সূরা নাযি'আত ৪৬)*। এই তো আমাদের জীবন! এই সময়টুকু একজন পথচারী কিংবা একজন আগন্তুকের ক্ষণিক বিশ্রামের সময়টুকুও তো নয়। রাসূল (ছাঃ) এই অমোঘ বাস্তবতার প্রতিই যেন ইঙ্গিত করেছেন, 'তুমি দুনিয়াতে এমনভাবে কাটাও যেন তুমি একজন আগন্তুক কিংবা পথচারী' *(বুখারী হা/৬৪১৬)*।

জন্ম-মৃত্যুর মধ্যবর্তী এই সময়টুকু মিলেই আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের জীবন। অতীব সংক্ষিপ্ত হ'লেও এই জীবন আমাদের জন্য অতীব মূল্যবান। কেননা জীবনের এই ক্ষণকাল সময়টুকুতে যে যতটুকু পরকালীন প্রস্তুতি নিতে পেরেছে, তার উপরই যে নির্ভর করছে তার চিরস্থায়ী তথা পরকালীন জীবনের যাবতীয় সুখ-দুঃখ। প্রতিটি মুহূর্তেই মৃত্যু আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে প্রবল গতিতে। সেই সাথে ফুরিয়ে আসছে আমাদের জীবনের ব্যাপ্তি। আমাদের অজান্তে, আমাদের অলক্ষ্যে বেজে চলেছে বেলা শেষের ঘণ্টাধ্বনি। পরীক্ষার হলে একজন ছাত্র যেমন শেষ ঘণ্টা বাজার আগে সবকিছু সাধ্যমত লিখে ফেলার প্রাণান্ত চেষ্টা চালায়, আমাদের পার্থিব জীবনের বাস্তবতা ঠিক একই রূপ। মৃত্যুই এখানে শেষ ঘণ্টা। তারপর যাবতীয় কর্মযজ্ঞ শেষ। শুরু হবে কর্মফলের পালা। আর এর ভিত্তিতেই নির্ধারিত হবে আমাদের জীবনের চূড়ান্ত গন্তব্য।

অনেকে দুনিয়াবী দুঃখ-কষ্টে পতিত হলেই জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েন। নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে চান। অথচ তিনি যদি জীবনের প্রকৃত গুরুত্ব ও বাস্তবতা উপলব্ধি করতেন, তাহলে এক মুহূর্তের জন্যও এই চিন্তা করতেন না। কেননা কাল কেয়ামতের ময়দানে মানুষ সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে পার্থিব জীবনের এই মূল্যবান সময়টুকুর জন্যই। সে আফসোসে প্রাণপাত করে সেদিন বলবে, 'হে আমার রব! আমাকে আরো কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি ছাদাকা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!' *(সূরা মুনাফিকূন ১০)*।

প্রিয় পাঠক, পরকালীন সম্বল অর্জনে আমাদের আলস্য, দুর্বলতা ও অসচেতনতার সবচেয়ে বড় কারণ হ'ল মৃত্যুর স্মরণ থেকে গাফেল থাকা এবং মৃত্যুপূর্ব জীবনের মূল্যটুকু সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পারা। এজন্য আমরা হরহামেশা নিশ্চিন্ত মনে বলি, জীবনটা একভাবে কাটিয়ে দিলেই তো হ'ল। অথচ রাসূল (ছাঃ) জীবনটাকে একটা গণীমত উল্লেখ করে বলেছেন- 'পাঁচটি জিনিসের পূর্বে পাঁচটি জিনিসকে তোমরা গণীমত মনে কর; বার্ধক্যের পূর্বে তোমার যৌবনকে, অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে, দারিদ্রের পূর্বে তোমার স্বচ্ছলতাকে, ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসরকে, মরণের পূর্বে তোমার জীবনকে' *(ছহীহুল জামে হা/১০৭৭)*। মৃত্যু নামক পর্দা হঠাৎ উঠে যাওয়া মাত্রই সব কিছু সাঙ্গ হয়ে যাবে আর নতুন এক সীমাহীন জগৎ চোখের সামনে ধরা দেবে। সেদিন দুনিয়াবী জীবনের গাফিলতিকে স্মরণ করে সে প্রচণ্ড আফসোস করবে। কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র লাভ হবে না। আল্লাহ বলেন, তুমি এই দিবস সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। অতঃপর আজ (বাস্তবতা দেখে) তোমার চক্ষু স্থির, প্রখর *(ক্বাফ ২২)*।

একথাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে একদিন জিব্রীল এসে রাসুল (ছাঃ)-কে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যতদিন খুশী জীবন যাপন করুন, কিন্তু মনে রাখবেন, আপনার মৃত্যু অনিবার্য; প্রিয়জনকে যত খুশী ভালোবাসুন, কিন্তু মানে রাখবেন, একদিন তাকে আপনার ছাড়তে হবে; আপনি যা ইচ্ছা করুন, কিন্তু মনে রাখবেন একদিন আপনি প্রতিফল পাবেন। জেনে রাখুন হে মুহাম্মাদ! মুমিনের মর্যাদা হ'ল রাত্রি জাগরণে এবং তার সম্মান হ'ল, অপরের মুখাপেক্ষী না হওয়ার মধ্যে *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৩১)*।

সুতরাং পাঠক! আমাদেরকে মৃত্যুর এই চিরন্তন বাস্তবতা সচেতনভাবে উপলব্ধি করতে হবে। পার্থিব জীবনের সর্বশেষ সীমারেখা এই মৃত্যু। আজ হোক, কাল

হোক এই সীমারেখা আমাদের অতিক্রম করতেই হবে। অতএব যারা মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের মৃত্যুকে কেবল কান্না আর বেদনার উপলক্ষ্য নয়; বরং উপদেশ ও স্মারক হিসাবে গ্রহণ করে আমাদেরও প্রস্তুত হতে হবে, সেই অমোঘ বাস্তবতার কাছে নিজেকে সঁপে দেয়ার জন্য। প্রস্তুতি নিতে হবে নিজ নিজ আমলনামা সাধ্যমত ভরপুর করে চিরস্থায়ী জীবনে সফল হওয়ার জন্য। এমনভাবে যেন সেই মহাবিচারের দিনে পরম প্রশান্তির সাথে সকলকে আমরা ডেকে ডেকে বলতে পারি- 'নাও, আমার আমলনামা দেখ, আমার রেজাল্টশীট পড়ে দেখ; আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম আমাকে হিসাবের মুখোমুখি হতে হবে' *(সূরা হাক্কাহ ১৯-২০)*। আর সেদিন আমাদের রব আমাদের আনন্দিত চেহারা দেখে খুশী হয়ে বলবেন, 'হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রভুর নিকটে ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর' *(সূরা ফজর ২৭-৩০)*। সেই মহাদিবসে এই মহান সৌভাগ্য লাভের জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি তো!

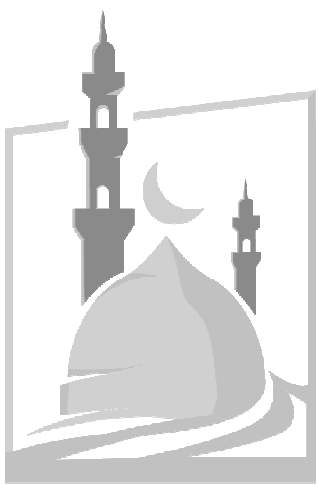

একজন দাঈ ইলাল্লাহ্
ডা. আব্দুর রহমান আস-সুমাইত্বের কথা

আব্দুর রহমান বিন হামূদ আস-সুমাইত্ব (১৯৪৭-২০১৩ খৃ.)। কুয়েতী এই চিকিৎসক সমকালীন বিশ্বে মানবসেবার এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জীবনের ২৯টি বছর আনুষ্ঠানিকভাবে মানবসেবার কাজে নেমে আফ্রিকার অন্ততঃ ২৯টি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের জীবনে হাসি ফুটিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এ সময়ে তাঁর হাত ধরে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হয়েছে অন্ততঃ ১১ মিলিয়ন তথা ১ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ। তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে তিনি সশরীরে আফ্রিকার পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন। অসহায় মানুষের সাহায্যার্থে দিনের পর দিন দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছেন। কখনও মরুভূমিতে, কখনও গহীন বন-জঙ্গল পেরিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছুটে গিয়েছেন। আফ্রিকার সর্বোচ্চ চূড়া মাউন্ট কিলিঞ্জোমারো পর্যন্ত আরোহণ করেছেন। এসব যাত্রায় কখনও তিনি বিভিন্ন মিলিশিয়া গোষ্ঠীর হামলার শিকার হয়েছেন। কখনও বিদ্যুৎ-পানিবিহীন প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে প্রাণঘাতী ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। জঙ্গলে বিষাক্ত সাপ-বিচ্ছুর আক্রমণের শিকার হয়ে বেশ কয়েকবার সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকেও রক্ষা পেয়েছেন। কোন কিছুই তাকে পিছপা করতে পারেনি। বিরামহীন কঠোর পরিশ্রমের ফলে জীবনের শেষদিকে তিনি নানা রোগে জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়েন। এতদসত্ত্বেও অসুস্থ শরীর নিয়ে তিনি দাওয়াতী মিশন অব্যাহত রেখেছিলেন। মৃত্যুর প্রায় বছর খানিক পূর্বে তিনি কোমায় চলে যান। সে অবস্থাতেও কখনও জ্ঞান ফিরলে তিনি একটি কথাই জিজ্ঞাসা করতেন- 'আফ্রিকার অসহায় মানুষদের কী অবস্থা, দাওয়াতের কী অবস্থা?'

জীবনের শুরুকাল থেকেই তিনি দারিদ্র্যের কষ্টকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন। তিনি যখন ছাত্র ছিলেন, তখন তীব্র গরমে রাস্তায় পাবলিক ট্রান্সপোর্টের জন্য অপেক্ষমাণ শ্রমিকদের দেখে খুব কষ্ট পান। তাদের দুর্দশা লাঘবে সেই বয়সেই তিনি বন্ধুদের নিয়ে পুরোনো গাড়ি ক্রয় করে বিনা ভাড়ায় তাদেরকে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়ার কাজ শুরু করেন। ১৯৭২ সালে তিনি বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রী লাভ করার পর ১৯৭৪ সালে লন্ডন এবং

১৯৭৮ সালে কানাডা থেকে উচ্চতর ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। অতঃপর দেশে ফিরে চিকিৎসা পেশায় জড়িত হওয়ার পরিকল্পনা করলেও স্ত্রীর উৎসাহে অবশেষে তিনি শৈশবের স্বপ্ন তথা প্রান্তিক মানুষের সেবাকেই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করেন। কর্মক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেন আফ্রিকাকে। হিসাববিজ্ঞানে উচ্চ ডিগ্রীধারী তাঁর স্ত্রী কেবল উৎসাহ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া অর্থ-সম্পদ দান করে দেন এই কার্যক্রমে। কুয়েতের আয়েশী জীবন ত্যাগ করে স্বামীর সাথে মাদাগাস্কারের মানাকারা গ্রামের ছোট্ট একটি গৃহে বসবাস শুরু করেন। দুস্থ, অশিক্ষিত, সভ্যতার আলোহীন কালো মানুষদের জন্য তাঁরা কেবল বৈষয়িক সহযোগিতাই নয়, বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয়ার সার্বিক ব্যবস্থা করেন।

সেখানকার মুসলিম সম্প্রদায়গুলো নামেমাত্র মুসলমান হলেও তাদের কৃষ্টি-কালচার ছিল কবর-মাযারকেন্দ্রিক শিরক ও বিদ'আতে আচ্ছন্ন। এই দৃশ্য দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং তাঁদের মধ্যে তাওহীদের বিশুদ্ধ দাওয়াত প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তাঁর কার্যক্রম ধীরে ধীরে আফ্রিকার ২৯টি দেশে বিস্তার লাভ করে। তিনি সুবিধাবঞ্চিত এলাকাসমূহে একের পর এক হাসপাতাল, ইয়াতীমখানা, হিফযখানা, মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করতে থাকেন। এভাবে দুর্ভিক্ষ ও অজ্ঞতার করাল গ্রাসে ডুবে থাকা আফ্রিকার কয়েক কোটি হতদরিদ্র মানুষ তাঁর মাধ্যমে নতুনভাবে বাঁচার স্বপ্ন খুঁজে পায়। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মাঝে তাঁর এই মানবিক কার্যক্রমে আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে।

দুস্থ মানবতার সেবায় ময়দানে নামলেও মূলতঃ দ্বীনের দাওয়াতই পরিণত হয় তাঁর ধ্যানজ্ঞান। প্রতিটি পদক্ষেপেই যেন তিনি দ্বীন প্রচারের সুযোগ নিতেন। এমনই একদিনের ঘটনা। কোন এক গ্রামে গিয়ে মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করার পর নিজে তিনি খেতে বসে উচ্চৈঃস্বরে বললেন- 'একমাত্র আল্লাহ, যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও জীবন-মৃত্যুর মালিক, তিনিই তাঁর অসীম অনুগ্রহে আমাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন'। তাঁর এই ছোট্ট কথাটিই উপস্থিত মানুষদের হৃদয়ে দাগ কেটে গেল এবং সাথে সাথে তারা ইসলাম কবুল করে নিল। কখনও দেখা যেত পুরো একটি গ্রাম তাঁর সুন্দর আচরণে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তিনি বলতেন, যদিও আমার ইসলাম প্রচারের অভিজ্ঞতা ২৫/২৬ বছরের বেশী নয়, তবুও আমি বলব মানুষের প্রতি সুন্দর আচরণই দাওয়াতের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। তিনি বলেন, 'আমার কাছে

পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য হ'ল, যখন আমি দেখি কারো শাহাদাত আঙ্গুলি প্রথমবারের মত আকাশমুখী হয়ে আল্লাহ্‌র একত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে'।

ব্যক্তিজীবনে তিনি কখনও বিশ্রামের কথা ভাবেননি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোথায় থামতে চান? তিনি বলেন, 'মৃত্যু না আসা পর্যন্ত আমার বিরতি নেয়ার কোন সুযোগ নেই। কেননা হিসাবের দিনটি খুব কঠিন। তোমরা জানো না আব্দুর রহমান কত বড় পাপিষ্ঠ। আমি কিভাবে অবসর নেব যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ হেদায়াতের দাওয়াত পেতে উন্মুখ হয়ে আছে? কিভাবে আমি বসে থাকতে পারি, যখন এই নওমুসলিম সন্তানদেরকে পুনরায় দ্বীন থেকে দূরে সরানোর জন্য ইসলাম বিরোধীরা তৎপর রয়েছে?'

২০১৩ সালে এই মহান দাঈ ইলাল্লাহ চিরবিদায় গ্রহণ করেন। স্বীয় কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ 'বাদশাহ ফায়ছাল পুরস্কার' সহ বহু পুরস্কার লাভ করেছেন। তবে সেসব পুরস্কার থেকে প্রাপ্ত সকল অর্থ মানবতার সেবায় দান করে দিয়েছেন। মানুষকে সর্বদা মানবতার কল্যাণে অগ্রগামী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে বলতেন, 'আমাদের প্রত্যেকেরই একটি মিশন থাকা উচিৎ, যা হবে এই পৃথিবীকে অধিকতর উত্তম পৃথিবী হিসাবে রেখে যাওয়ার মিশন'। তিনি বলতেন, 'তোমাদের সবাইকে আফ্রিকায় গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে তা নয়; কিন্তু কখনও নিজ গৃহে ও নিজ সমাজে দাওয়াত দেয়া বন্ধ করো না। মানুষের সামনে নিজেকে উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপন কর। যেন মানুষ তোমাকে দেখে কল্যাণের পথে উৎসাহিত হয়'।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের মুসলিম তরুণরা কেবল মাদার তেরেসাদের কথাই জানে। অথচ তাদের প্রকৃত রোল মডেলরা দৃশ্যপটের আড়ালেই থেকে যান। ডা. আব্দুর রহমান সুমাইতের মত নিষ্ঠাবান মহান দাঈ'র কথা আমরা ক'জনই বা জানি! অথচ তাঁদেরই কিনা হওয়ার কথা ছিল তরুণদের প্রেরণাবাতি! আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই মহান মানবসেবী দাঈকে জান্নাতুল ফেরদাউস নছীব করুন এবং তরুণদেরকে তাঁর মত দাঈদের পদাঙ্ক অনুসরণে দ্বীনের প্রকৃত খাদেম হিসাবে গড়ে ওঠার তাওফীক দান করুন- আমীন!

দ্বীনের পথে আমূল পরিবর্তিত এক পথিক আলী বানাত

অষ্ট্রেলিয়ার এক ফিলিস্তিনী বংশোদ্ভূত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী যুবক আলী বানাত (১৯৮২-২০১৮খ্রি.) ছিলেন সমসাময়িক পৃথিবীর আর দশজন বিত্তশালীর মতই ভোগবিলাসী জীবনে গা ভাসানো যুবক। মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও ইসলামের কোন প্রভাব ছিল না তাঁর জীবনে। পেশায় ছিলেন ইলেক্ট্রিশিয়ান। মাত্র ২১ বছর বয়স থেকেই সিডনীতে দুটি সফল ব্যবসা পরিচালনা করতেন। ফলে স্বল্প বয়সে বিপুল বিত্ত-বৈভব তাকে বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত করে তোলে। প্রায় ৫০ কোটি টাকা মূল্যের ফেরারী স্পাইডার কার, ৪৮ লক্ষ টাকা মূল্যের ব্রেসলেট, দামী ব্র্যান্ডের অসংখ্য জুতা ও সানগ্লাস ছিল তাঁর জীবনের নিত্যসঙ্গী।

কিন্তু হঠাৎই ২০১৫ সালের মাঝামাঝি তাঁর শরীরে ক্যান্সার ধরা পড়ল। চিকিৎসকরা জানালেন ক্যান্সার যে পর্যায়ে ধরা পড়েছে, তাতে আরোগ্যের কোন সম্ভাবনা নেই। উপরন্তু তাঁর আয়ু রয়েছে বড় জোর সাত মাস। আলী বানাতের জীবনে এই ঘটনা এক বিরাট ধাক্কা হয়ে এল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় আলী বানাতের পরিবর্তিত জীবনের শুরু হল এখান থেকেই। তিনি সহসাই উপলব্ধি করলেন, তাঁর এতদিনের যাপিত জীবন ছিল পুরোটাই মিছে মায়ার পিছনে ছোটা। জীবনের প্রকৃত মর্ম তাঁর চোখে বড় স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল। তিনি মৃত্যুর প্রস্তুতিস্বরূপ গোরস্থানে গোরস্থানে গিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ সহযাত্রীদের একান্ত সান্নিধ্যে সময় কাটাতে লাগলেন। নিজের সমস্ত সম্পদ অসহায় মানুষের সেবায় দান করতে মনস্থ করলেন। মৃত্যুর পূর্বে প্রতিটি সময় ও ক্ষণ তাঁর নিকট পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদে পরিণত হল।

তিনি তাঁর সমস্ত ব্যবসা গুটিয়ে নিলেন এবং আফ্রিকার দারিদ্রপীড়িত দেশসমূহে বিতরণের জন্য তাঁর যাবতীয় সম্পদ প্রেরণ করলেন। গঠন করলেন দাতব্য সংস্থা মুসলিমস্ এ্যারাউন্ড দ্যা ওয়ার্ল্ড। নিজে সশরীরে উপস্থিত থেকে টোগো, ঘানা ও বুর্কিনা ফাসোসহ আফ্রিকার অন্যান্য দেশসমূহে দাতব্য কার্যক্রম পরিচালনা করলেন। চিকিৎসকগণ তাঁকে ৭ মাস সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে আরও ৩টি বছর জীবন দিলেন।

তিনি বলেন, এক বন্ধুর পরামর্শে আমি ব্যথা উপশমের জন্য একটি উচ্চমাত্রার ঔষধ গ্রহণ করি। ঔষধটির ধাক্কা এত অধিক ছিল যে, আমি মৃত্যুর মুখোমুখি উপনীত হলাম। আমি অনুভব করতে লাগলাম আমি সম্পূর্ণ এক ভিন্ন অচেনা জগতে রয়েছি। আল্লাহ্‌র কসম আমি এমন কিছু দেখেছিলাম, যা পূর্বে কখনও দেখিনি। আমার পরিবার আমার পাশে ছিল, আর আমি বলছিলাম, হে আল্লাহ! আমাকে তুলে নাও। আমি খুব সুন্দর কিছু দৃশ্য দেখছিলাম। আমি কেবলই চাচ্ছিলাম সেখানে যেতে। কিন্তু পরদিন যখন আমি জাগ্রত হলাম, তখন খুব হতাশ হলাম যে আল্লাহ আমাকে নেননি। অশ্রুসজল চোখে বলেন তিনি।

তিনি বলেন, ক্যান্সার আমার জীবনে ছিল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উপহার। কেননা ক্যান্সারের মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে পরিবর্তনের সুযোগ দিয়েছেন। ক্যান্সারের কারণেই আমি পরকালের প্রস্তুতি নিতে পেরেছি। তিনি সবকিছুই একে একে দান করে দেন। এমনকি বিদেশে গেলে নিজের পরণের পোষাকটুকু ছাড়া সবকিছু বিলিয়ে দিতেন। কেননা তিনি চেষ্টা করতেন এমন অবস্থায় পৃথিবী ছাড়তে যখন তাঁর নিকট আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। দাতব্য সংস্থা গঠনের পিছনে তাঁর এই উদ্দেশ্যই ক্রিয়াশীল ছিল। তিনি বলতেন, তোমার অর্জিত সম্পদ তোমার সাথে কবরে যাবে না। কেবল সেটুকুই যাবে যা তুমি ছাদাক্বা করবে। এটিই একমাত্র বস্তু যা তোমাকে গন্তব্যে পৌঁছানোর পূর্বে কবরে অবস্থানরত সময়ে তোমাকে সাহায্য করবে। তোমার বাবা-মা, পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব কেউ সেখানে থাকবে না। থাকবে কেবল তোমার কর্ম।

তিনি জাগতিক সুখের পিছনে ছুটে চলা মানুষদের লক্ষ্য করে বলেন, যখন কেউ জানবে যে, পৃথিবীতে তাঁর অবস্থানকাল আর বেশী দিন নয়, তখন আল্লাহ্‌র কসম পার্থিব কোন বস্তুর প্রতি আকর্ষণবোধ করা তাঁর জীবনের সবচেয়ে অগুরুত্বপূর্ণ কাজে পরিণত হবে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দৈনন্দিন জীবন এমন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই পরিচালনা করা উচিৎ। যারা জাগতিক লক্ষ্যে জীবন পরিচালনা করে, তারা নিঃসন্দেহে ভুল লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে। যখন কেউ অসুস্থ হয়, কিংবা নিশ্চিত হয় যে, সে আর বেশীদিন বাঁচবে না, তখনই সে উপলব্ধি করতে পারে যে, প্রকৃতই এসব জাগতিক বস্তুর কোন মূল্য নেই।

তিনি সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, দয়া করে প্রত্যেকেই জীবনের একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করুন। জীবনের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। মানুষের উপকারার্থে কোন প্রকল্প হাতে নিন। যদি নিজে না পারেন তবে অন্য কারও

প্রকল্পে অংশগ্রহণ করুন। কেবল কিছু একটা করার চেষ্টা করুন। কেননা আল্লাহ্‌র কসম, কিয়ামতের দিন আপনি ভীষণভাবে এগুলোর প্রয়োজন বোধ করবেন।

গত ২৯শে মে ২০১৮ বৃহস্পতিবার সিডনীর একটি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুপথযাত্রী অবস্থায় তাঁর রেখে যাওয়া ভিডিওবার্তা সারাবিশ্বের মানুষকে আলোড়িত করেছে। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান দিয়ে সম্মানিত করুন। আমীন!

এই তরতাজা আধুনিক যুবকের পরিবর্তনের মর্মস্পর্শী গল্প আমাদের জন্য অনেক মূল্যবান শিক্ষা রেখে গেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখা এবং জীবনের কঠিন প্রতিকূল মুহূর্তেও ধৈর্যহারা না হওয়া। কেননা তিনি যা করেন, বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন। কঠিন রোগাক্রান্ত অবস্থাও হয়ত আলী বানাতের মত মহান প্রভুর প্রতি প্রত্যাবর্তনের এক অনন্য গল্প হতে পারে। এছাড়া আলী বানাতের জীবন আমাদেরকে কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন করে। যেমন- আমরা কি আলী বানাতের মত পরকালীন জীবনকে নিরাপদ করার জন্য বিশেষ কোন উদ্যোগ নিয়েছি? অথচ আমাদের মৃত্যুক্ষণ যে কোন সময় উপস্থিত হতে পারে?

দ্বিতীয়ত : আমরা যখন নিজেদের ক্যারিয়ার নিয়ে ব্যস্ত এবং ভবিষ্যৎ ভাবনায় উদ্বিগ্ন, তখন তাতে পরকালীন প্রাপ্তির ভাবনা যুক্ত থাকছে তো? জীবনের মৌলিক উদ্দেশ্য গৌণ হয়ে পড়ছে না তো?

তৃতীয়ত : মৃত্যুর পর আমরা কী রেখে যাচ্ছি? মানুষ আমাকে নিয়ে কি ভাবছে? মানুষের কল্যাণে আমি কতটুকু করে যেতে পারলাম? মানুষের জীবনে কতটুকু ইতিবাচক প্রভাব রেখে যেতে পারলাম? বিশেষ করে আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে কিছু না কিছু করার ক্ষমতা দিয়েছেন, সেই ক্ষমতা ব্যবহার করে আমরা পৃথিবীবাসীকে কতটুকু দিতে পারলাম? এই ভাবনাগুলো যদি নিজেদের জীবনে জাগ্রত করতে পারি, তবে আমাদের জীবন মহান প্রভুর প্রতি আত্মসমর্পিত এবং একক লক্ষ্যে নিবেদিত এক আলোকিত ও মনুষ্যত্বপূর্ণ জীবনের অধিকারী হতে পারব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্লাহ বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

‘তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস রাখবে। যদি আহলে কিতাবগণ ঈমান আনত, তাহ’লে সেটা তাদের জন্য কল্যাণকর হ’ত। তাদের কিছু লোক মুমিন ও অধিকাংশ ফাসেক’।

-আলে ইমরান ৩/১১০।

আয়া সোফিয়ায় আযানের সুর...

ইতিহাসের প্রতি সবসময় বিশেষ একটা আকর্ষণহেতু আয়া সোফিয়া নামটির সাথে পরিচয় আশৈশবকাল থেকেই। প্রথম কবে আয়া সোফিয়ার চিত্রপট দেখেছিলাম মনে নেই। তবে যেদিন থেকে দেখেছি, সেদিন থেকে কখনই সেটিকে মসজিদভিন্ন অন্য কিছু ভাবতে পারিনি। চারকোণে মিনার থাকা সত্ত্বেও ওটা যে মসজিদ নয়; বরং জাদুঘর, সেটা জানা হয়েছে বেশী দিন হয়নি। এই না জানাটা কেবল আমার ইতিহাস অজ্ঞতা, নাকি বাস্তবতার দাবী; তা-ই বোধ হয় এখন পরিষ্কার হওয়ার সময় হ'ল। গৌরবময় ওছমানীয় খেলাফতের প্রাণকেন্দ্রে মসজিদ না থেকে গীর্জা থাকবে, সেটা বোধহয় ইতিহাস মেনে নেয়নি। তাইতো দীর্ঘ ৮৬ বছর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অর্গল ছিন্ন করে ইতিহাস আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। প্রতীক্ষার অন্তহীন প্রহর পেরিয়ে মর্মভেদী আযানের সূর ফের ভেসে এল আয়া সোফিয়ার সুউচ্চ মিনারচূড়া থেকে। সুশীতল হৃদয়ে, অশ্রুসজল নেত্রে বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান তাকিয়ে রইল সেই মিনারের পানে। অবাক বিস্ময়ে শতাব্দীর মিনার বেয়ে ইথারে ভাসমান সেই তরঙ্গমালা মুহূর্তেই বুভুক্ষ বিশ্বমুসলিমের হৃদয়জগতকে অদ্ভূত আবেশে আন্দোলিত করে তুলল। আহা, কি মধুর সে অনুভূতি! তাওহীদের এমন বিজয়দৃশ্য দেখার মত আনন্দময় অভিজ্ঞতা মুমিনের যিন্দেগীতে আর কী হ'তে পারে!

আজ থেকে দেড় হাযার বছর পূর্বে ৫৩৭ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন বিশ্ব পরাশক্তি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজা জাস্টিনিয়ান (৪৮২-৫৬৫ খৃ.) কনস্টান্টিনোপল শহরের গোল্ডেন হর্ণে আয়া সোফিয়া (যার অর্থ পবিত্র জ্ঞান) গীর্জা নির্মাণ করেন, যেটি পরবর্তী কয়েকশ' বছর যাবৎ বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থোডক্স গীর্জা ছিল। ১৪৫৩ সালে ওছমানীয় সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ রোমান সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র কনস্টান্টিনোপল জয় করে শহরটির নাম রাখেন ইসলামবুল বা ইসলামের শহর (মোস্তফা কামাল কর্তৃক পরিবর্তিত নাম ইস্তাম্বুল)। সেই সাথে এই সাম্রাজ্যের ধর্মীয় প্রতীক আয়া সোফিয়া গীর্জাকে ব্যক্তিগত অর্থায়নে খৃষ্টানদের কাছ থেকে ক্রয় করে নেন এবং স্থাপনাটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন। ১৪৫৩ সালের ১লা জুন সর্বপ্রথম জুম'আর

ছালাতের মাধ্যমে মসজিদটির উদ্বোধন হয়। সেই থেকে টানা ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৪৭৮ বছর এটি মসজিদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। অতঃপর ১৯৩৪ সালে তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে পাশ্চাত্যের তল্পীবাহক মোস্তফা কামাল মসজিদটিকে অন্যায়ভাবে জাদুঘরে পরিণত করেন। অবশেষে বহু ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে ১০ই জুলাই ২০২০ তুরস্কের সর্বোচ্চ আদালতের রায় মোতাবেক তুর্কী প্রেসিডেন্ট এরদোগান আয়া সোফিয়াকে পুনরায় মসজিদে রূপান্তরের নির্দেশ দেন। অতঃপর ২৪শে জুলাই জুম'আর ছালাতের মাধ্যমে দীর্ঘ ৮৬ বছর পর আয়া সোফিয়া মসজিদ হিসাবে তার মর্যাদা ফিরে পায়। ইস্তাম্বুল শহরের অলি-গলিতে লক্ষ লক্ষ মুছল্লীর উপস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট এরদোগান সূরা ফাতিহা ও সূরা বাক্বারার ১ম রুকূ পাঠ করেন। অতঃপর জুমআ'র খুৎবা প্রদানকালে তুর্কী ধর্মমন্ত্রী ড. আলী এরবাশ দৃঢ়তার সাথে বলেন, আজকের পর তুর্কী জাতির অন্তরে ব্যথা-বেদনায় রূপ নেয়া আয়া সোফিয়ার প্রতি আক্ষেপ দূর হবে।... আয়া সোফিয়া মহান আল্লাহ্র দাসত্ব ও তাঁর কাছে নিঃশর্ত আনুগত্যের অন্যতম নিদর্শন।... আয়া সোফিয়া কেবল তুর্কী জাতির সম্পদ নয়; বরং গোটা মুসলিম উম্মাহ্র সম্পদ।... আয়া সোফিয়ায় আযানের সুর ধ্বনিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বায়তুল মুক্বাদ্দাসসহ পৃথিবীর অন্যান্য 'ব্যথিত' মসজিদগুলো ও সেখানকার অধিবাসীদের অন্তরাত্মা কিছুটা হ'লেও শান্তি পাবে।

আয়া সোফিয়ার মসজিদে রূপান্তরিত হওয়া কোন সাধারণ ঘটনা নয়। সুদীর্ঘ পাঁচ শতাধিক বছর ইসলামী খেলাফতের গৌরব বহন করার পর তুরস্কের উপর তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের নামে যে নির্মমতা ও আগ্রাসনের মাধ্যমে ধর্মহীনতাকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল, তা বলতে গেলে তুলনারহিত। এই সেই তুরস্ক যেখানে ইসলামের সর্বশেষ চিহ্নটুকুও মুছে দিতে এক সময় আরবীতে আযান নিষিদ্ধ ছিল, আরবী বর্ণমালা নিষিদ্ধ ছিল। নিষিদ্ধ ছিল কুরআন শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, দাড়ি রাখা, শিক্ষাঙ্গনে নারীদের হিজাব পরা এমনকি হিজরী ক্যালেণ্ডার পর্যন্ত। সেই সাথে ইসলামে যা যা নিষিদ্ধ তার সবকিছু জোর করে পশ্চিম থেকে আমদানী করা হয়েছিল, ইসলামের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সমূলে মিটিয়ে ফেলার জন্য। পশ্চিমা অপসংস্কৃতির অবাধ প্রচলন ঘটানো হয়েছিল তুরস্কের লোকালয় ও নগরে। এমনকি আরবীতে আযানের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দায়ে তুরস্কের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আদনান মেন্দারিস তুর্কী সেনাবাহিনীর হাতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন ১৯৬০ সালে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের এই ভয়াল আগ্রাসী রূপ তুরস্কের সমাজব্যবস্থা থেকে

ইসলামকে মিটিয়ে ফেলার যে নিপীড়নমূলক আয়োজন করেছিল, তা ছিল গোটা ইসলামী বিশ্বের জন্য অবমাননাকর। ফলে একদিকে ইসলামী খেলাফত হারানো, অপরদিকে খেলাফতের প্রাণকেন্দ্র থেকে ইসলামের সর্বাত্মক উচ্ছেদ কার্যক্রম বিশ্ব মুসলিমের হৃদয়ে এক গভীর বেদনার শেল বিদ্ধ করে রেখেছে বিগত এক শতাব্দীকাল ব্যাপী। আয়া সোফিয়ায় আযানের জান্নাতী সুর সেই শতবর্ষের বেদনার ক্ষতে এক অনাবিল প্রশান্তির প্রলেপ।

সন্দেহ নেই, আয়া সোফিয়ার মসজিদে প্রত্যাবর্তন আধুনিক তুরস্কের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এক নবযুগের পূর্বাভাস। এক ইতিবাচক পরিবর্তনের পটভূমিকা। স্বভাবতই সেক্যুলার পশ্চিমা বিশ্ব ও তাদের দোসররা এই সিদ্ধান্তের সমালোচনায় মুখর হয়েছে। যে গ্রীসে ১০ হাযার মসজিদ গীর্জায় রূপান্তরিত করা হয়েছে, তারাও জোর গলায় এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে। স্বয়ং পোপ ফ্রান্সিস এতে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। সেই সাথে বিস্ময়করভাবে অনেক ইসলামপন্থীও এতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাদের সমালোচনার বিষয়বস্তু মূলতঃ ধর্মতাত্ত্বিক, রাজনৈতিক; আর সেই সাথে যোগ হয়েছে পক্ষপাতদুষ্টতা। অস্বীকারের সুযোগ নেই যে, সমালোচনাগুলো অনেকটাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু কিছু সময় থাকে যখন দ্বিমত করার বিষয়গুলো পিছনে রাখতে হয়। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে অগ্রাধিকারের তারতম্য ঘটে। কেবল তত্ত্ব কথা দিয়ে পৃথিবী চলে না, মাথায় রাখতে হয় বাস্তব প্রেক্ষাপটও। সেই বিচার-বিশ্লেষণের যোগ্যতা ও দূরদর্শিতা না থাকলে আমাদের প্রাপ্তিগুলো সব অপ্রাপ্তিতে পরিণত হবে। মধ্যযুগে তাতারদের হাতে মুসলমানদের বাগদাদ হারানোর ইতিহাস কার না জানা আছে?

সুতরাং আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যে, সমালোচনার নামে আমাদের জটিলতাগুলো যেন কুটিলতায় রূপ না নেয়, অর্জনগুলো যেন শেষাবধি ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয়। বরং আমরা আশাবাদী যে, আয়া সোফিয়ার আযানের ধ্বনি সুদূরপ্রসারী প্রেরণার বাতিঘর হয়ে এক সময় তুরস্কের সমাজব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের পথে নিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে ইসলামের সঠিক বার্তা তথা তাওহীদ ও সুন্নাতের আলোকধারা মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র বিকশিত হবে। আমাদের তরুণ ও যুবসমাজকে সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের উপর দৃঢ়চিত্ত হয়ে দণ্ডায়মান থাকার উৎসাহ যোগাবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!

ইসলামী রাজনীতির গতি-প্রকৃতি

প্রচলিত গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থা। একটি দল সেখানে নিরংকুশ বিজয় লাভ করে, আর হেরে যায় অপর দলগুলি। একদলের মতে, এতে জিতেছে জনগণ, উন্নয়ন এবং স্থিতিশীলতা। অপর দলের মতে, এতে জয় হয়েছে যুলুম-অন্যায়, অসততা আর প্রহসনের। কোন ভাষ্যটি নৈতিক দিক দিয়ে সঠিক বা বেঠিক সে প্রসঙ্গে আমরা যাব না। বিষয়টি সকলেরই কম-বেশী বোধগম্য। আমরা কেবল সেই দিকটি অবলোকন করতে চাই যে, নির্বাচন এবং নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে এ দেশের ইসলামী ঘরানায় গণতন্ত্রকেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণার স্বরূপ কেমন এবং এর আলোকে আমাদের ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত ও গন্তব্য কী হওয়া উচিৎ।

আমরা আগেই জানি গণতন্ত্রের ধারণা বিস্তৃতি লাভের পর থেকে সকল দেশেই ইসলামী ঘরানার মধ্যে গণতন্ত্র নিয়ে একটা টানাপোড়েন আছে, যেমনটি ছিল সমাজতন্ত্রের বিকাশকালে। একসময় 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' নিয়ে ব্যাপক চিন্তা-গবেষণা শুরু হ'লেও সমাজতন্ত্রের অস্তিত্ব হারানোর সাথে সাথে তার বিদায় ঘটেছে। তারপর থেকে শুরু হয়েছে 'ইসলামী গণতন্ত্র' নিয়ে একইরূপ আলোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা। একদল বিষয়টি চিন্তা ও দর্শনগত দিক থেকে দেখা শুরু করলেন তো অপরদল সেটিকে ব্যবহারিক দিক থেকে একনায়কতন্ত্র বিরোধী ব্যবস্থা হিসাবে দেখতে লাগলেন। এভাবেই ইসলামপন্থীদের মধ্যে সুস্পষ্ট দু'টি ধারা তৈরী হ'ল। যাদের একদল গণতন্ত্রের ঘোর বিরোধী, অপরদল ঘোরতর না হ'লেও জোরালো সমর্থক।

যারা গণতন্ত্র বিরোধী তারা সুস্পষ্টভাবে গণতন্ত্রকে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক ব্যবস্থা হিসাবে দেখেন। কেননা গণতন্ত্রের নৈতিক ভিত্তি হ'ল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, যা সুনির্দিষ্ট কোন ধর্ম বা আদর্শের সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দেয় না। জনগণের স্বাধীন ইচ্ছাই সেখানে সবকিছু। অপরদিকে ইসলাম নিরংকুশ তাওহীদবাদী ধর্ম হিসাবে এক আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বকামী। ফলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। আবার যারা গণতন্ত্রকে সমর্থন করেন, তারা মূলতঃ গণতন্ত্রকে আদর্শবাদী জায়গা থেকে না দেখে একনায়কতন্ত্রবিরোধী ব্যবস্থা হিসাবে দেখেন। এদের কেউবা 'ইসলামী গণতন্ত্র' নামে একটি নয়া প্রকল্প উপস্থাপন করেন। তারা মনে করেন একক রাজার শাসনের বিপরীতে

জনগণের মতামতভিত্তিক শাসনব্যবস্থাই হ'ল গণতন্ত্র, যা ভোট বা নির্বাচনের মাধ্যমে অনূদিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য থেকেই প্রধানতঃ গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামপন্থীদের দ্বিধাবিভক্তির জন্ম।

এ কথা সুবিদিত যে, আধুনিক পৃথিবীতে মোটাদাগে মূলতঃ দুই ধারার রাষ্ট্রপরিচালনা নীতি দেখা যায়। একটি একনায়কতন্ত্র, অপরটি গণতন্ত্র। পৃথিবীর শুরুকাল থেকেই একনায়কতন্ত্র তথা রাজতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্রই রাষ্ট্র পরিচালনা করে এসেছে। আর গণতন্ত্র তথা আম জনগণের মতামতভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থা আধুনিক যুগের আবিষ্কার। এখন উক্ত দু'টি রাষ্ট্রপরিচালনা ব্যবস্থাকে সামনে রেখে যদি ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণ করতে চাই, তবে প্রথমতঃ আমরা লক্ষ্য করব যে, একটি রাষ্ট্রে শাসক কেমন চরিত্রের হবেন এবং কিভাবে ও কোন নীতিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন, সে বিষয়ে ইসলাম বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা দিয়েছে। যেমন ইসলাম বলেছে নেতৃত্ব চেয়ে নেয়া যাবে না এবং নেতৃত্বের কামনাও করা যাবে না। বলেছে আদল ও ইনছাফের কথা, শান্তি ও ন্যায়বিচারের কথা। বলেছে যুলুম ও অবিচার হ'তে বিরত থাকার কথা। সর্বোপরি একটি সমাজকে কিভাবে ইসলামের আলোকে পূর্ণাঙ্গভাবে ঢেলে সাজাতে হবে, শাসননীতি কেমন হবে, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

কিন্তু একজন শাসক ঠিক কোন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হবেন এমন সুনির্দিষ্ট রূপরেখা ইসলাম নির্ধারণ করে দেয়নি। যার প্রমাণ হ'ল- রাসূল (ছাঃ) যখন মারা গেলেন, তখন তিনি কাউকে পরবর্তী শাসক হিসাবে নির্ধারণ করে যাননি, যদিও ইঙ্গিত প্রদান করেছিলেন। আবূবকর (রাঃ) সরাসরি তাঁর পরবর্তী উত্তরসূরীর নাম ঘোষণা করে গিয়েছেন। আবার ওমর (রাঃ) নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। পরবর্তী দুই খলীফা ওছমান (রাঃ) ও আলী (রাঃ) তো আকস্মিকভাবে নিহত হওয়ার কারণে এ বিষয়ে কোন নির্দেশনা দেওয়ারই সুযোগ পাননি। পরবর্তীকালে উমাইয়া শাসকরাও বিভিন্ন উপায়ে নেতৃত্ব নির্বাচন করেন। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, ইসলাম শাসক নির্বাচনের বিষয়টিকে মুসলিম উম্মাহ্র ইজতিহাদের উপর ছেড়ে দিয়েছে। এর ভিত্তিতে পরবর্তী মুসলিম বিদ্বানগণ যেমন ইমাম মাওয়ার্দী (৪৫০হি.), ইমাম আল-জুওয়াইনী (মৃ. ৪৭৮হি.), ইমাম নববী (মৃ. ৬৭৬হি.) প্রমুখ 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্বদ' তথা পরামর্শ পরিষদ (আধুনিক পরিভাষায় নির্বাচন কমিশন) গঠনের কথা বলেছেন, যে পরিষদ উপস্থিত জনগণের মধ্য থেকে দ্বীনদারী ও সক্ষমতার ভিত্তিতে সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তিকে নেতৃত্বের জন্য বেছে

নেবেন। আর নিঃসন্দেহে এটিই সর্বোত্তম নির্বাচন ব্যবস্থা। তবে মোদ্দাকথা হ'ল, যে কোন ন্যায়ানুগ উপায়ে শাসক নির্বাচিত হোক না কেন, ইসলামের মূল বিবেচ্য বিষয় হ'ল শাসক কেমন হবে এবং কিভাবে তিনি রাষ্ট্র চালাবেন। আর এজন্য নির্ধারণ করে দিয়েছে রাষ্ট্র পরিচালনার সুনির্দিষ্ট মূলনীতিসমূহ। ফলে কোন মুসলিম শাসক যেভাবেই নির্বাচিত হৌন না কেন, তাকে অবশ্যই ইসলামী আইনের প্রতি বিশ্বাসী হ'তে হবে এবং ইসলামী বিধি-বিধান মোতাবেক সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে- এটাই ইসলামের দাবী।

এখন প্রশ্ন হ'ল, প্রচলিত এই দুই ধারার নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থার মধ্যে একনায়কতন্ত্রের ব্যাপারে মুসলিম বিদ্বানগণ তেমন আপত্তি না তুললেও তাঁদের অধিকাংশই কেন প্রায় একবাক্যে গণতন্ত্রকে নাকচ করেন? এর কারণ হ'ল, গণতন্ত্র নিছক একটি নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা নয়, বরং এটি একটি মতবাদ বা আদর্শের নাম। শুধু তাই নয়, গণতন্ত্র আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে মানবীয় সার্বভৌমত্বকে যেভাবে সর্বেসর্বা ঘোষণা করে এবং যেভাবে মানবীয় স্বেচ্ছাচারিতাকে নিরংকুশ প্রাধান্য দেয়, তা নিঃসন্দেহে কুফরীর পর্যায়ভুক্ত। কেননা তাতে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসের কোন স্থান নেই। স্থান নেই কোন শাশ্বত বিধানের। ধর্ম সেখানে কেবলমাত্র মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়। ফলে গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের কাছে এক পরম পূজনীয় ধর্ম। এ কারণেই কথায় কথায় তারা Democratic Values তথা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কথা বলে। আর এর বিপরীতে একনায়কতন্ত্র কেবলই একটি একচ্ছত্র কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা। এটি কোন আদর্শ বা মতবাদের নাম নয়। এজন্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কথা জোরেশোরে প্রচারিত হ'লেও কোথাও একনায়কতান্ত্রিক মূল্যবোধ বলে কিছু দেখা যায় না। আবার গণতন্ত্রে অধিকাংশের রায় চূড়ান্ত হওয়ায় এতে ব্যক্তিবিশেষের মত গুরুত্ব পায় না, তা যতই সত্য ও মূল্যবান হোক না কেন। কিন্তু একনায়কতন্ত্র বা রাজতন্ত্রে শাসকের হাতে এই ক্ষমতা থাকে এবং তিনি চাইলে নিজস্ব ক্ষমতাবলে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করতেও পারেন। এমনকি শাসক আল্লাহভীরু হ'লে তার মাধ্যমে পুরোপুরি ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম হ'তে পারে। যা কিনা গণতন্ত্রের মাধ্যমে কখনই সম্ভব নয়। এমনকি শাসক ও জনগণ চাইলেও না। কেননা আদর্শ ও চরিত্রগতভাবে গণতন্ত্র সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ এবং পুঁজিবাদী। ফলে জনগণের এমন কিছু চাওয়ারই অধিকার নেই, যা গণতান্ত্রিক আদর্শের সাথে খাপ খায় না।

ফলে যারা নিজেদের তাওহীদবাদী মুসলিম বলে দাবী করেন এবং ইসলামী জীবন-বিধান অনুযায়ী নিজের সমগ্র জীবনকে ঢেলে সাজাতে চান, যারা

ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে সার্বিক কল্যাণের প্রত্যাশী; তাদের জন্য গণতন্ত্র নিছক আল্লাহদ্রোহী, আত্মপূজারী ও প্রতারণাপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। সূদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির মত তার বহিরাঙ্গ যতই সুশোভিত হোক না কেন, ইসলামের সাথে তা কখনই একীভূত করা যায় না। আর এজন্যই গণতন্ত্রকে আদর্শিকভাবে সমর্থনের তো প্রশ্নই আসে না, এমনকি যদি সাদা চোখে নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা হিসাবেও ধরা হয়, তবুও তা গ্রহণযোগ্য মনে করার সুযোগ নেই। কেননা তাতে রয়েছে বাতিল ও জাহেলিয়াতের সাথে নিরেট আপোষকামিতা। রয়েছে ইসলামবিরোধী আদর্শ ও সংস্কৃতির কাছে বেশরম আত্মসমর্পণ। কোন আল্লাহভীরু ও সৎ মানুষের পক্ষে এই নির্বাচনের পথে হাঁটা সম্ভব নয়। আর যেহেতু ইসলামে নেতৃত্ব চেয়ে নেয়ার সুযোগ নেই, সেহেতু এ পথ ইসলামের পথই নয়। অতএব এই গোটা ব্যবস্থাপনার সাথে কোন নিষ্ঠাবান ঈমানদার ব্যক্তি সম্পর্ক রাখতে পারে না। মিসর, তিউনিসিয়া ও তুরস্কের অভিজ্ঞতা আমাদেরকে তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। সুতরাং যে সকল ইসলামপন্থী রাজনীতিবিদ গণতন্ত্র ও নির্বাচন কায়েমের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন, তারা নিজেরা যেমন বিভ্রান্ত হয়েছেন, তেমনি তাদের সমর্থকদেরও নিঃসন্দেহে বিভ্রান্ত করছেন।

মূলতঃ গণতন্ত্র সাধারণ জনগণকে ক্ষমতার মোহে ভুলানো এক পুঁজিবাদী প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। যাতে রয়েছে ভয়ানক শুভংকরের ফাঁকি। এই পথ ধরে কখনই ইসলামের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠাদান সম্ভব নয়। আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে জাতিকে বহু আগে থেকেই সতর্ক করে আসছেন। অনেক ইসলামপন্থী 'মন্দের ভালো' নামে এক আপোষকামী নীতি প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন, যার অসারতা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। নীতি-আদর্শের প্রশ্নে হক ও বাতিলের সাথে কখনও আপোষ হয় না, আপোষ করা যায় না। সুতরাং আমরা আশা রাখি, আগামীর কাণ্ডারী যুবসমাজ এ বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করবেন। সর্বোপরি নবী-রাসূলদের দেখানো পদ্ধতি তথা সর্বাত্মক সমাজ সংস্কারের আন্দোলন ব্যতিরেকে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার ভিন্ন কোন পন্থা নেই এবং ভাড়াটে বা আমদানীকৃত কোন তন্ত্র-মন্ত্র ইসলামের কোনই উপকারে আসবে না। এই জ্বলন্ত সত্যটি আমাদের অনুধাবন করতে হবে।

বর্তমানে যুবসমাজের জন্য ফিৎনার একটি বড় উপলক্ষ হ'ল এই গণতান্ত্রিক ক্ষমতার রাজনীতি। কত শত মানুষ যে এতে অংশগ্রহণ করে অনৈতিক পথ অবলম্বন করছে এবং বেঘোরে জান-মাল ও ইয্যত হারাচ্ছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। একজন দ্বীনদার ও জান্নাতপিয়াসী যুবক কখনও নিজের মূল্যবান জীবন

ও সময়কে এমন ধ্বংসাত্মক পথে বিলিয়ে দিতে পারে না। মুমিন অবশ্যই সমাজ ও রাজনীতি সচেতন হবে, কিন্তু মুমিনের প্রকৃত সংগ্রাম হ'ল আক্বীদা ও বিশ্বাসের সংগ্রাম। অতএব যে রাজনীতি তার আক্বীদায় আঘাত হানে, তার বিশ্বাসের ভিত্তিকে চুরমার করে দেয়, যে রাজনীতি আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে মানুষের সার্বভৌমত্বের শ্লোগান দেয়, যে রাজনীতি আল্লাহ্র বিধান বাদ দিয়ে মানুষের মনগড়া বিধান দিয়ে মানুষের উপর যুলুম করে, যে রাজনীতি কেবল ক্ষমতামুখী, যে রাজনীতি সমাজে অশান্তি, ধ্বংস ও বিশৃংখলা ডেকে আনে; তাতে অংশগ্রহণের কোনই সুযোগ আমাদের নেই। বরং সে রাজনীতির সংস্কার সাধন করাই হ'ল প্রকৃত ইসলামী রাজনীতি। এই অশুভ ক্ষমতার রাজনীতিকে পরিবর্তনের জন্য প্রচেষ্টা ও অহীর বিধানের আলোকে সমাজ সংস্কারের সংগ্রামই হ'ল এ যুগে মুমিনের প্রকৃত সংগ্রাম। অতএব যুবসম্প্রদায়কে এই ফিৎনার ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ থাকতে হবে।

নির্বাচনে কে জয়লাভ করবে বা না করবে; কাকে সমর্থন করতে হবে বা করতে হবে না তা আমাদের বিবেচ্য বিষয় নয়; বরং আমাদের বিবেচ্য হবে, কিভাবে সমাজের শাসক ও শাসিত প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহ্র পথে ফিরিয়ে আনা যায়। কিভাবে আল্লাহ্র বিধানকে সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করা যায়। একজন নীতিনির্ধারক হিসাবে শাসকও আমাদের এই দাওয়াতের বাইরে নয়; বরং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুতরাং জান্নাতপিয়াসী যুবসমাজকে জীবনের মহৎ আদর্শ ও লক্ষ্যকে সর্বাগ্রে রেখে পথ চলতে হবে। কখনও শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না বা সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া যাবে না; বরং শাসককে নছীহত করা বা সদুপদেশ দেওয়াই হ'ল ইসলামের কর্মনীতি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকলে একজন মুমিনের অন্তর কখনও প্রতারিত বা পথভ্রষ্ট হয় না– (১) সকল কর্ম কেবল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হওয়া (২) শাসকদের সদুপদেশ দেয়া (৩) জামা'আতকে আঁকড়ে থাকা *(ইবনু মাজাহ হা/২৩০, ছহীহাহ হা/৪০৩)*। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'এই তিনটি বিষয় দ্বীন পালনের জন্য অন্যতম মূলনীতি। কেননা এতে আল্লাহ্র হক ও বান্দার হক আদায় এবং একাধারে দুনিয়া ও আখেরাতে সার্বিক কল্যাণ লাভের পথনির্দেশ করা হয়েছে' *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১/১৮)*।

অতএব আসুন! আমরা প্রচলিত গণতান্ত্রিক ক্ষমতার রাজনীতি নয়; ইসলামের আদর্শিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য নবী-রাসূলের পদ্ধতি তথা সমাজ সংস্কারের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ি। আল্লাহ আমাদেরকে যাবতীয় ফিৎনা থেকে রক্ষা করুন এবং কুফর ও নিফাকমুক্ত ঈমান সহকারে আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হওয়ার তাওফীক দিন- আমীন!

সংঘবদ্ধ জীবন রহমতের জীবন

মানুষের স্বাভাবিক ফিতরাতী প্রবণতা হ'ল সংঘবদ্ধতা। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতে হোক, কেউ কখনও বিচ্ছিন্ন ও একাকী জীবন যাপন করতে পারে না। তার কারণ মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, বরং পরনির্ভর। অপরের সহযোগিতা ব্যতীত কোন ব্যক্তির পক্ষে এক পা-ও চলা সম্ভব নয়। সুতরাং তাদেরকে স্রষ্টার বেঁধে দেয়া এক অমোঘ নিয়মে সংঘবদ্ধ হ'তেই হয়। এই নিয়ম দেশ-কাল-পাত্র ভেদে নানা রূপে নানা মাত্রায় প্রতিভাত হয়। ভৌগলিক অবস্থান, আচার, ভাষা, বর্ণ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য ও মিল-অমিলের দিক থেকে মানুষের পারস্পরিক এই সম্পর্ক ও সংঘবদ্ধতা আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। কখনও তা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মোহনায় উপনীত হয়। যেমন একই বর্ণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানুষের মধ্যেও যারা সৎজীবন যাপনের প্রত্যাশী, তারা সর্বদা সৎসঙ্গ খোঁজেন; আবার যারা অসৎজীবন যাপনকারী তারা অনুরূপ সহযোগীর অনুসন্ধানে থাকেন। অর্থাৎ যে যেভাবে জীবনটাকে সাজাতে চান, যে যেমন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন তেমনিভাবে জীবনসাথী নির্বাচন করে থাকেন। এভাবে সংঘবদ্ধতা ছোট-বড় বিভিন্ন পরিসরে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এটিই জগতের স্বাভাবিক নিয়ম। এর বিশেষ কোন ব্যত্যয় নেই। আধুনিককালে সংগঠন হ'ল এই প্রাকৃতিক নিয়মেরই অধীন একটি বৃহত্তর ও সুশৃংখল সামাজিক কাঠামো, যা সমমনা মানুষের মাঝে যুথবদ্ধতা তৈরী করে এবং ঐক্যের সূত্র ধরে রাখে।

জগতের অমোঘ নিয়মের পাশাপাশি সংঘবদ্ধতা এমন এক কার্যকরী দুনিয়াবী শক্তি, যা মানুষকে জীবন পরিচালনার পথ সুগম করে, শত্রুর বাঁধা মোকাবিলার শক্তি যোগায় এবং যাবতীয় বিপদাপদে সুদৃঢ় রাখে। এজন্য ইসলামী জীবনাদর্শে মুমিন সমাজকে বার বার ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং ঐক্যবদ্ধ না থাকার নেতিবাচক ফলশ্রুতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। সুতরাং যারা হকের ওপর দৃঢ়চিত্ত থাকতে চান এবং দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে দৃঢ় ভূমিকা রাখতে চান, তাদের জন্য সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের কোন বিকল্প নেই। আর এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বিগত শতাব্দী থেকে সাংগঠনিকভাবে ইসলামের দাওয়াত শুরু হয়েছে। এই দাওয়াতের বরকতপূর্ণ

ফলস্বরূপ কর্মীদের ঘামঝরা প্রচেষ্টা এবং বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে অহি-র বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণের আহ্বান- 'আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি', 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কামনা কর'। আহলেহাদীছ আন্দোলন আজ যে মযবূত শিকড় বিস্তার করেছে এ দেশের আনাচে-কানাচে, তার পেছনে এক অমূল্য অবদান রেখেছে এই সংঘবদ্ধ দাওয়াতের বরকতময় বারিসিঞ্চন। *ফালিল্লাহিল হামদ*। সুতরাং আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে এই সাংগঠনিক ও জামা'আতবদ্ধ দাওয়াত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

অধূনা যারা সংঘবদ্ধ দাওয়াতের সাথে আত্মবিরোধ অনুভব করেন এবং তাতে সবকিছু ছাপিয়ে দলীয় সংকীর্ণতার আভাস আবিষ্কার করেন, তারা হয় বাস্তব জগত সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন না অথবা নিছক স্বার্থদুষ্টতার প্রভাবে প্রভাবিত। নতুবা কোন সচেতন ও সুস্থ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এমন স্থূল ধারণা পোষণ করা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। ততোধিক বিস্ময়কর হ'ল, জগতের অন্য কোন সাংগঠনিক কাঠামোকে নাকচ না করে কেবল নাকচ করেন আহলেহাদীছ জামা'আতের সংঘবদ্ধতাকে। পৃথিবীর সকল সমাজে নেতৃত্বের প্রয়োজন, সুশৃংখল কর্মসূচির প্রয়োজন, একনিষ্ঠ কর্মীর প্রয়োজন; কেবল প্রয়োজন নেই আহলেহাদীছ জামা'আতের! তাহ'লে সমাজ গড়ার কাজে নেতৃত্ব কিভাবে তৈরী হবে? কোন পদ্ধতিতে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হবে? বৃহত্তর কর্মসূচী কিভাবে বাস্তবায়িত হবে? জাতীয় জীবনের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য কিভাবে অর্জিত হবে? বিশেষতঃ বাতিল যেখানে সংঘবদ্ধ, সেখানে তাদের বিরুদ্ধে অসংঘবদ্ধ, শৃংখলাহীন সংগ্রাম কখনও কি সফল হ'তে পারে?

আমরা মনে করি এই নেতিবাদী চিন্তাধারার জন্ম এক ধরনের পরাজিত অথবা জাগতিক ভোগসর্বস্ব বিলাসী মন-মানসিকতা থেকে। শুধু তা-ই নয়, এই মানসিকতা যেন পশ্চিমা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদেরই ভিন্নতর রূপ, যেখানে ব্যক্তি অপরের প্রতি দায়-দায়িত্বহীনভাবে কেবল নিজের স্বার্থে এবং আপনার মর্জি মাফিক চলতে পারার স্বাধীনতাকেই জীবনের পরমার্থ মনে করা হয়। অথচ এই দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামী জীবনব্যবস্থার মৌলিক রূপরেখার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলাম যেখানে সর্বদা ঐক্যের ধারণাকে প্রণোদনা দেয়, সেখানে এরূপ আত্মকেন্দ্রিকতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার কোন ধারণা স্থানই পেতে পারে না।

অতএব সচেতন যুবক ভাইদের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে, যেখানেই থাকুন জামা'আতবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ থাকার চেষ্টা করুন। নতুবা বাতিলের সর্বপ্লাবী ও সাঁড়াশী আক্রমণে আমাদের ঈমান ও আমল যে কোন মুহূর্তে আক্রান্ত হ'তে পারে। সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কেবল সম্ভব বাতিলের বিরুদ্ধে হককে বিজয়ী করা। এজন্য আল্লাহ ঈমানদারদের সীসাঢালা প্রাচীরের মত ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন *(ছফ ৬১/৪)*।

সাংগঠনিক জীবন আমাদেরকে এমন একটি দ্বীনী বন্ধুত্বের সার্কেল প্রদান করে, যার মাধ্যমে একে অপরকে হকের প্রতি আহ্বান করা যায় এবং বিপদাপদে পাশাপাশি থাকার প্রতিজ্ঞা গড়ে তোলা যায়। সাংগঠনিক জীবন এমন এক শক্তি যা আমাদেরকে সহজে বাতিলের স্রোতে হারিয়ে যেতে দেয় না, বরং ব্যক্তির মধ্যে এমন ইস্তিকামাত ও দৃঢ়তা তৈরী করে যা তাকে দ্বীনের পথ থেকে সাধারণত বিচ্যুত হ'তে দেয় না। সাংগঠনিক জীবন আমাদের শৃংখলা শেখায়, স্বেচ্ছাচারিতার পথ রুদ্ধ করে দেয়, অপরের কল্যাণের জন্য ভাবতে শেখায়, আত্মকেন্দ্রিক না করে বহুকেন্দ্রিক করে, সমগ্র জাতি ও মুসলিম উম্মাহ্র প্রতি দায়িত্ববোধ তৈরী করে। সর্বোপরি সংগঠন সেই দুনিয়াবী শক্তির অংশ, যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বাতিলের বিরুদ্ধে সর্বদা প্রস্তুত রাখতে বলেছেন *(আনফাল ৮/৬০)*। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকল ভাইকে তাঁর দ্বীনের পথে যোগ্য খাদেম হিসাবে কবুল করে নিন এবং ঐক্যবদ্ধভাবে ছহীহ দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে সর্বাত্মক ভূমিকা রাখার তাওফীক দান করুন- আমীন!

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সংগঠন বিরোধিতা

আধুনিক পশ্চিমা দর্শনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ। এই মতবাদ মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে সর্বোচ্চ মূল্যায়ন করে এবং প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতাকে একচ্ছত্রভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। এর একটি সাধারণ ফলাফল হ'ল এমন যে, ব্যক্তি কেবল নিজেকে নিয়ে ভাবতে শেখে এবং সমাজের প্রতি দায়বোধ থেকে মুক্ত থাকে। যাকে এক কথায় বলা যায় নির্ভেজাল আত্মকেন্দ্রিকতা। এই মতবাদে অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতার যে সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার যে পোক্ত ধারণা রোপণ করা হয়েছে, তা একটি আদর্শবাদী ও নৈতিকতাসম্পন্ন সমাজের জন্য উপযোগী নয়। বিশেষ করে মুসলিম সমাজে তা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। কেননা ইসলামে মানুষের পারস্পরিক বন্ধন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এতে সর্বদা দায়িত্বশীলতা ও সামাজিকতাবোধকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। প্রত্যেকেই এখানে পরস্পরের প্রতি কিছু অধিকার ও দায়বোধের নিগড়ে আবদ্ধ, যেখানে স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার কোন জায়গা নেই। আর এভাবেই ইসলাম মানবিক মানুষের জন্য অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা।

বলা বাহুল্য যে, মানুষের স্বভাবধর্ম হ'ল সামাজিকতা ও সংঘবদ্ধতা। ইসলাম এই স্বভাবধর্মকে লালন করার জন্য মুসলিম সমাজকে প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। ইসলামের বুনিয়াদী ইবাদতসমূহ তথা ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত সবই যেন মানুষকে সংঘবদ্ধতা ও পরার্থপরতার প্রতি একেকটি বলিষ্ঠ আহ্বান। এজন্যই একজন মুসলমান কখনও সমাজবিচ্ছিন্ন হ'তে পারে না। সামাজিক দায়মুক্তও সে হ'তে পারে না। ফলে ইসলামও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে স্বীকার করে বটে; কিন্তু পশ্চিমাদের দায়মুক্ত ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ইসলামের দায়িত্বশীল ব্যক্তিস্বাধীনতার মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও আত্মকেন্দ্রিকতার এই দর্শন নিয়ে আমাদের এই আলোচনার হেতু হ'ল সাম্প্রতিক সময়ে একদল ওলামায়ে কেরাম এবং সাধারণ মুসলমানদের মাঝে ইসলামী দল ও সংগঠন সম্পর্কে অগভীর কিছু চিন্তাধারার আবির্ভাব। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এমন চিন্তাধারা বিশেষ

অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু যারা বিদ্বান ও বোদ্ধা হিসাবে সর্বমহলে সুপরিচিত তারা যখন এ বিষয়ে খাপছাড়া মন্তব্য করেন এবং দায়িত্বহীনভাবে ইসলামী দল ও সংগঠনকে সরাসরি ফিৎনা হিসাবে অভিহিত করেন, তখন সত্যিই গভীর হতাশা ও আফসোসের সৃষ্টি হয়। ইসলামের চিরন্তন সংঘবদ্ধতার ধারণার বিপরীতে তারা যে খোঁড়া বক্তব্য ও যুক্তি পেশ করেছেন তা নিছক নতুন মোড়কে পশ্চিমী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বহিঃপ্রকাশ। তাদের এই অবিবেচনাপ্রসূত ফৎওয়া প্রদান থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আপন গণ্ডি ছাড়িয়ে তারা খুব কমই দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারেন। ফলে কোন সংঘবদ্ধ সংগ্রাম বা আন্দোলনকে তার স্বীয় অবস্থান থেকে কখনই মূল্যায়ন করতে পারেন না। সত্যের পক্ষে সংগ্রামরত যেসব বিখ্যাত আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামের জিহাদী চেতনা জাগরুক রয়েছে সারাবিশ্বে এবং বিগত কয়েক শতাব্দীতে যে পদ্ধতিতে দ্বীনের দাওয়াতের প্রচার ও প্রসার হচ্ছে, তাকে এক লহমায় ফিৎনার কারণ বলে যারা আখ্যায়িত করতে পারেন, তারা দ্বীনদারিতায় অগ্রগামী হ'লেও সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে নিঃসন্দেহে অগভীর চিন্তাধারার অধিকারী।

নিছক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কিংবা স্বার্থদুষ্ট হয়ে তারা যেভাবে পশ্চিমাদের মত আত্মকেন্দ্রিকতায় আবদ্ধ থাকাকে প্রাধান্য দেন, তাতে না থাকে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, না থাকে সমাজ সংস্কারের আকুতি, আর না থাকে ইতিহাসের আহ্বান শোনার মত দূরদর্শিতা। বরং সমাজ থেকে নিজেকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখার আত্মতৃপ্তিই যেন তাতে ঝরে পড়ে। একজন মুখলিছ দাঈ ইলাল্লাহ্র জন্য যেটা কখনই কাম্য নয়।

পাণ্ডিত্যের একটি রোগ হ'ল সুশীলতা। সুশীলতা তখনই রোগ হয়ে যায়, যখন তা ব্যক্তিস্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয় এবং ঝুঁকিহীনতাকে পসন্দ করে। নিজেকে নিরাপদ জায়গায় রেখে সমাজ ও মানুষের উপর দায়িত্বহীনভাবে মতামত ব্যক্ত করে। সত্যকে সত্য ও মিথ্যাকে মিথ্যা বলার মত সৎসাহস দেখাতে ভয় পায়। নিজের ভীরুতা, কাপুরুষতা এবং অক্ষমতাকে আড়াল করতে অন্যায্য পাণ্ডিত্য ও বিতর্কের আশ্রয় নেয়। আমাদের কিছু প্রাজ্ঞ ওলামায়ে কেরামও সম্ভবতঃ অনুরূপ রোগেই আক্রান্ত হয়েছেন।

পৃথিবীর কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজই সংঘবদ্ধ হওয়া ছাড়া এককভাবে করা সম্ভব নয়। একক কোন ব্যক্তির পক্ষে একটি সভ্যতা গড়ে তোলা কখনও সম্ভব নয়। পৃথিবীতে যত সভ্যতা গড়ে উঠেছে, যত সংগ্রাম ও বিপ্লবের ইতিহাস রচিত

হয়েছে সবকিছুর পিছনে ছিল একদল সুসংগঠিত মানুষের সংঘবদ্ধ প্রয়াস। সংগঠন হ'ল এই সংঘবদ্ধ প্রয়াসেরই আধুনিক নাম মাত্র। এটা যারা না বোঝেন কিংবা উৎকট স্বার্থবাদিতাদুষ্ট হয়ে এর বিরুদ্ধে প্রগলভ কথাবার্তা বলেন, তারাই কেবল রাসূল (ছাঃ)-এর সংগঠনের নাম কি ছিল কিংবা ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) কোন সংগঠন করতেন- এই ধরনের অতীব শিশুতোষ প্রশ্ন করতে পারেন। এ যেন ঠিক সেই বিদ'আতীদের মতই মন্তব্য যারা বলে থাকেন, মুনাজাত যদি বিদ'আত হয়, তবে ফ্যান-লাইটও তো বিদ'আত। কেননা এগুলো রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে ছিল না। রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে নিঃসন্দেহে প্রচলিত আকার ও কাঠামোযুক্ত সংগঠন ছিল না, কিন্তু সংঘবদ্ধতা ছিল। যেমনভাবে প্রচলিত নিয়মের মাদ্রাসা শিক্ষা কাঠামো ছিল না, কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। যুগের প্রয়োজনে শরী'আতের মূলনীতি ঠিক রেখে যে কোন কিছুর রূপ-কাঠামো বদল হবে এটাই স্বাভাবিক। এতে অস্পষ্টতার কিছু নেই।

আধুনিক যুগে আরব বিশ্বের ওলামায়ে কেরাম দল ও সংগঠন বিষয়ে যে সকল ফৎওয়া দিয়েছেন, তা কেবল তাদের স্ব স্ব দেশ ও সমাজের জন্য প্রযোজ্য। সে সকল ফৎওয়া সর্বসময়ে, সর্বদেশে ও সর্বসমাজের জন্য প্রযোজ্য হবে এমন কোন আবশ্যকতাও নেই। এতদসত্ত্বেও তাঁদের ফৎওয়াসমূহ একত্রিত করে যারা তাদেরকে বিতর্কিত করতে চান এবং অন্যদেরকে বিভ্রান্ত করতে চান, তারা নিঃসন্দেহে কোন সদুদ্দেশ্য পোষণ করেন না। কেননা তাঁরা মূলতঃ হিযবিয়্যাত বা দলাদলির সাথে যুক্ত ভ্রান্ত সংগঠনগুলোকে উদ্দেশ্য করেছেন। যারা কিনা নিজ সংগঠন বা ঘরানার বাইরে অন্য সকলকে পথভ্রষ্ট মনে করে। কোন হকপন্থী সংগঠনকে তারা উদ্দেশ্য করেননি। বরং তার প্রশ্নই আসে না।

তারা রাসূল (ছাঃ)-এর জামা'আতবদ্ধতার হাদীছগুলোকে কেবল একক ইমামভিত্তিক রাষ্ট্রীয় জামা'আতের সাথে প্রযুক্ত করেন, যা কিনা স্পষ্টতঃই দলীলবিহীন এবং মানহাজ ও যুক্তিবিরোধী। কেননা **প্রথমতঃ** ইসলাম জামা'আতবদ্ধ হওয়ার জন্য কখনও রাষ্ট্রক্ষমতাকে অপরিহার্য করেনি। যদি করত, তবে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জনই আমাদের প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়াত। অথচ শরঈ দৃষ্টিকোন থেকে তা সঠিক নয়। বরং রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন করাকে আবশ্যকীয় এবং দ্বীনের প্রধান উছূল মনে করা বর্তমান যুগের শী'আ, ইখওয়ানী, খারেজীপন্থী প্রমুখদের প্রধান ভ্রান্ত আক্বীদা। **দ্বিতীয়তঃ** একথা সবারই জানা যে, একক জামা'আত কাম্য হ'লেও আজকের যুগে বিশ্বজুড়ে

একক জামা'আত থাকার কোন সুযোগ নেই। বরং সেই যুগের তো অবসান হয়েছে ওছমান (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর থেকেই। কিন্তু তাই বলে কি জামা'আতবদ্ধতার হুকুম সমূলে তিরোহিত হয়ে যায়? রাসূল (ছাঃ) কোন সফরে তিনজন একত্রিত হ'লেও যেখানে একজন আমীর নিয়োগ করতে বলেছেন, সেখানে ইসলামে সংঘবদ্ধতার রূপ ও প্রকৃতি অনুধাবনে মোটেও কষ্ট হওয়ার কথা নয়। শায়খ উছায়মীন যথার্থই বলেন, 'কিছু মানুষ মনে করেন যে, আজকের দিনে মুসলমানদের কোন ইমামও নেই, বায়'আতও নেই। জানি না তারা কি চান যে, মানুষ বিশৃংখলভাবে চলুক এবং তাদের কোন নেতা না থাকুক? নাকি তারা চান যে এটা বলা হোক- প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের আমীর বা নেতা? *(ইবনুল উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতি' ৮/৯)*।

মোদ্দাকথা হ'ল, ইসলামী সমাজ কখনও নেতৃত্ববিহীন চলতে পারে না। সর্বযুগে, সর্বাবস্থায় এবং সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব আবশ্যক। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত থাক বা না থাক নেতৃত্ব থাকবেই। বর্তমানে ইসলামী দল ও সংগঠনগুলো বিশ্বব্যাপী মুসলিম সমাজকে দ্বীনের পথে পরিচালনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বে যেখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মপালনে কোন উৎসাহ প্রদান করা হয় না, সেখানে এই ধরনের জামা'আতের কোনই বিকল্প নেই। নিঃসন্দেহে একক রাষ্ট্রীয় জামা'আত সর্বোত্তম এবং শৃংখলাসাধনে সবচেয়ে ফলপ্রসূ। কিন্তু বর্তমান যুগে সেটা সম্ভব হয়নি বলেই তো ইসলামী খেলাফত আজ ৫৭টি রাষ্ট্রে বিভক্ত। আবার একই বাস্তবতায় একই স্থানে প্রয়োজনের খাতিরে একাধিক জামা'আতও হয়ে গেছে। এটাও নিন্দনীয় নয় যদি পারস্পরিক সহাবস্থান থাকে। সেমতাবস্থায় সাধারণ মানুষ সাধ্যমত তাক্বওয়া ও দ্বীনদারীর ভিত্তিতে সর্বাধিক উপযুক্ত জামা'আত খুঁজে নিবে।

সর্বোপরি আলেমদের মধ্যে কেউ তাঁদের ব্যক্তিগত ইজতিহাদী মত পেশ করতেই পারেন। এর ভিত্তিতে তারা কোন সংগঠনের অংশ নাও হ'তে পারেন। কিন্তু তাই বলে যারা সংঘবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনা করছে, তাদের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং কুরআন-হাদীছকে নিজের মত করে ব্যাখ্যা করা কি তাদের জন্য মোটেও সঙ্গত? উপরন্তু এটা কি দ্বীনের কাজকে বাঁধাগ্রস্ত করার শামিল নয় *(নিসা ৬১)*? যদি তা-ই হয়, তবে সেক্ষেত্রে তাদের এই বিরোধী অবস্থান কতটা ভয়ংকর অপরাধের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে, সেটা কি তারা ভেবে দেখবেন?

সর্বোপরি কারো আপত্তি ও পিছুটানের কারণে সমাজের বহমান কোন স্রোত থেমে থাকবে না। আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে পরিচালনার দায়িত্ব যে কাউকে দিয়ে, যেভাবে খুশী পালন করিয়ে নেবেনই। তাতে আমরা যুক্ত হব কি না, সেটাই হ'ল আমাদের সিদ্ধান্ত। সবাই যে সামনের সারির মুজাহিদ হবেন, একথা মোটেও সত্য নয়। কেউ না কেউ পেছনের সারিতে থাকতে চাইবেন, এটাই স্বাভাবিক। দিন শেষে যার যার আপন হিসাবই মুখ্য। নিজেকে দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বোচ্চ সফলদের কাতারে নিতে পারলাম কিনা সেটিই আমাদের মূল বিবেচ্য। আমাদের প্রতিটি কথা, প্রতিটি চিন্তা পরকালীন নিক্তিতে মাপা হবে, সেটিই মহাসত্য। এই মহাসত্যকে বুকে ধারণ করার মত দৃঢ়চিত্ততা, সৎসাহস, স্বচ্ছ অন্তর যেন আমরা অর্জন করতে পারি, এটাই হোক আমাদের সাধনা। সচেতন যুবসমাজের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে, সমাজ সংস্কারের মঞ্চে আমাদের দৃঢ় সংকল্পবদ্ধতা যেন কোন অবস্থাতেই হীনবল ও ভঙ্গুর না হয়। শয়তানের ওয়াসওয়াসা যেন আমাদেরকে দুর্বলচিত্ত ও কাপুরুষ না বানিয়ে দেয়। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন এবং দ্বীনের প্রকৃত খাদেম হিসাবে পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!

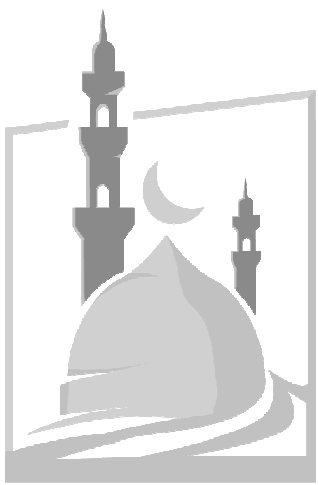

সমাজ সংস্কার ও আমাদের সংগ্রাম

মানবজাতি পৃথিবীর শুরুকাল থেকে যে প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হয়েছে, তা খুব একটা ব্যতিক্রম ছাড়া একটা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলেছে। আর তা হ'ল সমাজের একদল মানুষ মন্দ, অকল্যাণ ও অসত্যের পথে প্রলুব্ধ হয়। অপর এক দল মানুষ এই পথভ্রষ্টদেরকে সুপথ প্রদর্শন করে যায়, যদিও এই দলটি সংখ্যায় অতি স্বল্প। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে এই সুপথপ্রদর্শনের দায়িত্ব দিয়েই প্রেরণ করেছিলেন। আল্লাহ বলেন, 'আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথপ্রদর্শক রয়েছে' *(রা'দ ১৩/৭)*। কোন সমাজে যদি এমন সংস্কারক দল না থাকে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মতো শক্তি না থাকে, তবে সে সমাজ নিঃসন্দেহে পতনোন্মুখ হবে।

এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুমিনদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিৎ, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই প্রকৃত সফলকাম' *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*। আমরা ব্যক্তিগতভাবে যতই সৎ বা ন্যায়নিষ্ঠ হই না কেন, যদি অপরকে সৎ বা ন্যায়নিষ্ঠ বানানোর প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করি, তবে সমাজে প্রকৃতার্থে সংস্কার আসে না। এজন্য আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না; যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে' *(রা'দ ১৩/১১)*।

সমাজ সংশোধনের এই প্রচেষ্টা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যা কোন না কোন ভাবে চলমান থাকবেই এবং আল্লাহ কাউকে না কাউকে দিয়ে তা করিয়ে নেবেনই। তবে একজন দায়িত্বশীল ও জান্নাতপিয়াসী মুমিনের অবশ্য কর্তব্য হ'ল এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকা। কেননা ঈমান শুধু মুখে দাবী করার বিষয় নয়, বরং তার ছাপ বা দলীলও থাকতে হয়। কেউ ঈমানের দাবীদার হ'লে তাকে বাস্তব জীবনে সেই দাবীর পক্ষে দলীলও পেশ করতে হবে। এজন্য আল্লাহ বলেন, তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে; যতক্ষণ না তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ তথা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করেছে এবং কে

ধৈর্যশীল তা না জানছেন? *(আলে-ইমরান ৩/১৪২)*। যদি সুযোগ ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমরা স্বীয় দায়িত্ব পালনে অবহেলা প্রদর্শন করি, তবে তা নিঃসন্দেহে আল্লাহকে ক্রুদ্ধ করবে। আল্লাহ হুঁশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করে বলেন, 'যদি তোমরা বিমুখ হয়, তাহ'লে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন; অতঃপর তারা তোমাদের মত হবে না *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৮)*। এর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে নিরন্তর ঈমানের পরীক্ষার মধ্যে রেখেছেন যে কারা আমরা প্রকৃত বিশ্বাসী আর কারা কপট। আল্লাহ বলেন, 'আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যতক্ষণ না আমি তোমাদের মধ্যে মুজাহিদ ও ধৈর্যশীলদের জেনে নিই এবং আমি তোমাদের কর্মকাণ্ড পরীক্ষা করি *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩১)*। এই পরীক্ষায় যে যত বেশী অগ্রগামী হ'তে পারবে, সে ততবেশী সফল হবে এবং আল্লাহ্র নৈকট্যশীল বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে *(আন'আম ৬/১৩২)*।

আজ মুসলিম উম্মাহ যে বিপর্যয় ও অধঃপতনের মধ্যে অতিক্রম করছে তার পিছনে একটি বৃহত্তম কারণ হ'ল মুসলিম সমাজের সংস্কার চেতনা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণের মানসিকতা হারিয়ে ফেলা। অজ্ঞতা, কুসংস্কারচ্ছন্নতা, দুনিয়ার প্রতি আসক্তি, মাল ও মর্যাদার লোভ তাদেরকে এমনভাবে গ্রাস করে ফেলেছে যে, উম্মাহ্র প্রতি দায়বোধ, মানবতার জন্য বৃহত্তর কল্যাণচিন্তা, আত্মমর্যাদাবোধ, সর্বোপরি আল্লাহ্র দ্বীনকে আল্লাহ্র যমীনে বিজয়ী করার সদিচ্ছা, দৃঢ়চিত্ততা- সবকিছুই হারিয়ে ফেলেছে তারা। রাসূল (ছাঃ) এ সম্পর্কে বহু পূর্বেই আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, 'যখন তোমরা 'ঈনা তথা প্রকৃত মূল্যের চেয়ে বাকিতে অধিক মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করবে, গরুর লেজ ধারণ করবে এবং কৃষিকাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে (তথা দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে) এবং জিহাদ তথা আল্লাহ্র রাস্তায় সংগ্রামকে পরিত্যাগ করবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা ও অবমাননাকর অবস্থা চাপিয়ে দেবেন। আর ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি এই লাঞ্ছনা ও অপমান দূরীভূত করবেন না যতক্ষণ না তোমরা পুনরায় দ্বীনের প্রতি ফিরে আস' *(আবূদাউদ হা/৩৪৬২, সনদ ছহীহ)*।

সুতরাং সচেতন ও ঈমানদার যুবসমাজের প্রতি আমাদের বিনীত আহ্বান থাকবে, মুসলিম উম্মাহ্র এই অধঃপতিত ও লাঞ্ছনাকর অবস্থাকে মূল্যায়ন করা এবং নিশ্চেষ্ট না থেকে নিজেদের কর্তব্য-করণীয় নির্ধারণ করা। যদি প্রকৃতই আমরা মুসলিম উম্মাহ্র প্রতি আমাদের দায় পূরণ করতে চাই এবং আল্লাহ্র

নৈকট্যশীল বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হ'তে চাই, তাহ'লে অবশ্যই খালেছ অন্তরে আল্লাহ্র পথে সংগ্রামের পথকে বেছে নেয়া ছাড়া আমাদের বিকল্প কোন পথ নেই। ইসলামের বিজয় নিহিত রয়েছে এ পথেই।

মনে রাখতে হবে, এ সংগ্রামের পথ মোটেও কুসুমাস্তীর্ণ নয়। বরং নানামুখী হাযারো বাধা আমাদেরকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করবে। শয়তানী চক্রান্ত আমাদেরকে কখনো দিশেহারা করে তুলবে। হয়তবা অনেকেই হতাশাগ্রস্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেবে, গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে হারিয়ে যাবে কিংবা দুনিয়ার মোহে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে। তবুও প্রকৃত সত্যসেবী একদল লোক দৃঢ়চিত্তভাবে দাঁতে দাঁত চেপে হককে বিজয়ী করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবে। আর চূড়ান্ত বিচারে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম তারাই। আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের এই মহত্তম সংগ্রামের পথে অবিচল রাখুন এবং সমাজ সংস্কারের আন্দোলনে যথাসাধ্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

যেতে হবে বহুদূর!

বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের ইসলামী ঘরানায় এক ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তনের জোয়ার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দীর্ঘকাল সামাজিক প্রেক্ষাপটে আপাত পিছিয়ে পড়ে থাকা ধর্মীয় অঙ্গনের মানুষগুলো নতুন করে যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছেন। সমাজ থেকে সযত্নে গাঁ বাঁচিয়ে চলাকে যে সকল ওলামায়ে কেরাম এক সময় তাক্বওয়া ও মুক্তির পথ মনে করতেন, তারা এখন দেদার সমাজ সম্পৃক্ত কাজে যুক্ত হচ্ছেন। মিডিয়া, সামাজিক ও দাতব্য কর্মকাণ্ড, প্রকাশনা প্রভৃতি অঙ্গনে তাদের সরব উপস্থিতি এক নতুন জাগরণের আভাস দিচ্ছে। ফলে যারা এক সময় ধর্মচর্চায় যুক্ত মানুষগুলোর প্রতি নাক সিটকানোর ভাব দেখাতেন, কুপমণ্ডুকতার দায়ে তাদেরকে কথায় কথায় হেয় করতে চাইতেন, তাদের মাঝে হঠাৎ ধর্মীয় ঘরানার প্রতি কিছুটা হ'লেও সুনজর লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

এই জাগরণের ভবিষ্যৎ এখনই অনুমান করা কঠিন, তবে নিঃসন্দেহে তা আশাব্যঞ্জকই বলতে হবে। আর তা এই কারণে যে, এই ধর্মীয় গণজাগরণে যে জিনিসটি ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে, তা হ'ল সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্ম সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হওয়া। তাদের মধ্যে সত্য জানার আগ্রহটা আগের তুলনায় এখন অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এদেশে ধর্মের নামে হাযারো কুসংস্কার যে শত শত বছর ধরে চেপে বসে আছে এবং কুরআন-হাদীছের ইসলাম আর প্রচলিত রেওয়াজী ইসলাম যে এক নয়, তা বহু মানুষের উপলব্ধিতে আসতে শুরু করেছে। শুধু বাংলাদেশেই নয়, বরং সম্প্রতি পাকিস্তান, শ্রীলংকা, সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়া সফরেও প্রায় একই দৃশ্য দেখেছি। মানুষ এখন উন্মুখ হয়ে আছে সত্যিকার ইসলামের পতাকাবাহকদের জন্য। এক মরুভূমিসম তৃষ্ণা নিয়ে তাদের হৃদয় অপেক্ষা করছে নতুন দিনের অশ্বারোহীদের জন্য। যারা মানুষকে ইসলামের সরল ও সঠিক পথের দিকে ডাকবে, জাহেলিয়াতের ঘোর অমানিশাকে ছিন্ন করে হকের দৃপ্ত প্রদীপ জ্বালাবে।

এই প্রেক্ষাপটে ইসলামী আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার কাজে যারা সম্পৃক্ত রয়েছেন, তাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হ'ল, এই জাগরণকে সঠিক পথে

পরিচালিত করা এবং এদেশের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় অঙ্গন, সমাজ ও রাজনীতিতে অর্থবহ পরিবর্তনের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসা। আর এজন্য প্রয়োজন ময়দানে একদল সত্যসেবী মানুষের সক্রিয় পদচারণা এবং ধৈর্য, বিচক্ষণতা ও অবিচলতার সাথে পরিস্থিতির মুকাবিলা করা। তাদের দায়িত্বশীলতা এবং দৃঢ়পদ ভূমিকার উপরই নির্ভর করছে এই জাগরণের ভবিষ্যৎ।

লক্ষণীয় বিষয় হ'ল, এই জাগরণে সবচেয়ে বড় নিয়ামক শক্তি যেমন আলেম সমাজ, তেমনি সবচেয়ে বড় বাধাও হ'ল আলেম সমাজ। তাদের সঠিক ভূমিকার কারণে সমাজ যেমন ব্যাপকভাবে উপকৃত হ'তে পারে, তেমনি তাদের অনৈতিক ভূমিকার কারণে এই জাগরণ আবার অচিরেই বিপর্যস্ত হয়ে নিভে যেতে পারে। এজন্য একদিকে আলেম সমাজকে যেমন অত্যন্ত দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে, তেমনি সাধারণ জনগণকেও বিশেষভাবে নযর রাখতে হবে, যেন কিছু আলেমের পদস্খলনের কারণে সমগ্র সমাজ পদস্খলিত না হয়। ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, দ্বীন ইসলামকে ধ্বংস করে তিনটি জিনিস- (১) আলেমদের পদস্খলন, (২) কুরআন নিয়ে মুনাফিকদের বিতর্ক, (৩) নেতাদের পথভ্রষ্ট হওয়া *(জামে'উ বায়ানিল ইলম হা/১৮৬৭)*। এর ব্যাখ্যায় সাধারণ মানুষের করণীয় সম্পর্কে মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, আলেমদের ব্যাপারে দু'টি পন্থা অবলম্বন করবে। যদি তারা সঠিক পথে থাকেন, তবে তাদের অন্ধভাবে অনুসরণ করবে না। আর যদি তারা ফিৎনায় নিপতিত হন, তবে তাদের থেকে ধৈর্যহারা হয়ে ছিটকে যাবে না। কেননা মুমিন ফিৎনায় পতিত হ'লে তওবা করে (অর্থাৎ তাদের প্রতি সুধারণা রেখে তাদের তওবার অপেক্ষায় থাকবে) *(জামে'উ বায়ানিল ইলম হা/১৮৭২)*। এভাবে পারস্পরিক দায়িত্বশীল ও সহমর্মী ভূমিকার মাধ্যমেই দ্বীনের এই পবিত্র জাগরণ সঠিক গন্তব্যপানে এগিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এই সুধারণা ও আশাবাদ আমরা আন্তরিকভাবে পোষণ করি।

আলহামদুলিল্লাহ এই দ্বীনী গণজাগরণেরই প্রতিনিধি হিসাবে আল্লাহ্র অশেষ রহমতে এদেশের বুকে আহলেহাদীছ আন্দোলন এই গণজাগরণের প্রতিনিধি হিসাবে এদেশের বুকে হকের আওয়াজ বুলন্দ করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আহলেহাদীছ সংগঠনগুলোর নানামুখী তৎপরতার মাধ্যমে এদেশের গণমানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও আমলের বার্তা। পৌঁছে যাচ্ছে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে প্রত্যাবর্তনের বার্তা, ন্যায় ও ইনছাফের বার্তা। সর্বোপরি ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত

জীবনের সবগুলো ক্ষেত্রকে অহি-র আলোয় ঢেলে সাজানোর বার্তা। এদেশের ধর্মীয় অঙ্গন থেকে শিরক-বিদ'আতকে উৎখাত করে তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র কার্যকর চাষাবাদ এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় অঙ্গন থেকে সকল প্রকার বিজাতীয় মতবাদকে উৎখাত করে ইসলামের সাম্য ও ন্যায়বিচারকে প্রতিষ্ঠাদানের সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে সর্বত্র।

সুতরাং যুবসমাজের প্রতি আমাদের আহ্বান- আসুন! আমরা সম্মিলিতভাবে এই আন্দোলনের বার্তাকে দেশের প্রতিটি কোণায় কোণায় পৌঁছে দেয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করি। ধৈর্য, সাহস ও আত্মবিশ্বাসের সাথে এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হই। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.), ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহ.), ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহ.), শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.), সাইয়েদ নিছার আলী তিতুমীর (রহ.) প্রমুখের রেখে যাওয়া সেই সমাজ সংস্কার আন্দোলনের এই ধারাবাহিক উত্তরাধিকারকে আমাদের এগিয়ে নিতেই হবে। আমাদের মধ্যে হাযারো ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকবে, মতভেদ থাকবে, চলার পথে থাকবে অসংখ্য বাধা ও বিপদ। কিন্তু তাই বলে যে বিশুদ্ধ ঈমান-আক্বীদা ও আমলের আহ্বান আমাদেরকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হাতছানি দেখিয়েছে, তা আমরা কখনও হাতছাড়া করতে পারি না। যত বাধাই আসুক না কেন, সকল বাধার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে সত্য সূর্যের আলো আমরা সর্বত্র ছড়িয়ে দেবই। জান্নাতের পথে ছুটে চলার এই মিছিলকে আমরা বেগবান করবই। জাহেলিয়াতের তিমিরে ডুবে থাকা মানুষকে আলোর পথ দেখাবই।

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী/ ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান/ক্ষয় না তার ক্ষয় নাই।

ঐ শুনুন আল্লাহ্র বাণী- 'তোমরা হীনবল হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না, তোমরাই তো বিজয়ী, যদি তোমরা মুমিন হও' *(আলে ইমরান ৩/১৩৯)*। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন- আমীন!

অহি-র আলোয় উদ্ভাসিত হোক বাংলার প্রতিটি ঘর

ক্বিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীর প্রতিটি ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, এ যমীনের উপর এমন কোন মাটি কিংবা পশমের ঘর (তাঁবু) বাকী থাকবে না, যে ঘরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলামের বাণী পৌঁছিয়ে দেবেন না। সম্মানীর ঘরে সম্মানের সাথে; আর লাঞ্ছিতের ঘরে লাঞ্ছনার সাথে তা পৌঁছাবেন। এদের মধ্যে কাউকে আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত করবেন এবং (স্বেচ্ছায়) ইসলাম কবূলের জন্য উপযুক্ত করে দেবেন। আবার কাউকে লাঞ্ছিত করবেন এবং তারা বাধ্য হয়ে এই দ্বীনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে (অর্থাৎ সকল দ্বীনের উপর ইসলাম বিজয়ী হবে) *(আহমাদ, মিশকাত হা/৪২)*।

এই হাদীছের প্রেরণাকে সামনে রেখে আমরা যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি তা হ'ল- 'অহি-র আলোয় উদ্ভাসিত হোক বাংলার প্রতিটি ঘর'। অর্থাৎ আমরা চাই বাংলার যমীনে প্রতিটি গৃহে, প্রতিটি ঘরে অহি-র বার্তা পৌঁছে যাক সগৌরবে। ধনী হোক, গরীব হোক; শিক্ষিত হোক কিংবা অশিক্ষিত- কেউ যেন এই মহান দাওয়াত থেকে বঞ্চিত না হয়। প্রত্যেকের কাছে যেন এই বার্তা পৌঁছে যায় যে, ইসলাম হ'ল তাওহীদ তথা এক আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের নাম। এতে কোন শরীকানা নেই। হোক তা সৃষ্টি পরিচালনায় কিংবা মানব সমাজের দৈনন্দিন ইবাদত-বন্দেগী, কার্যবিধিতে। রব হিসাবে, ইলাহ হিসাবে, নামে-বৈশিষ্ট্যে-গুণাবলীতে সর্বত্র তাঁর এক ও একক অবস্থান। তাতে না আছে বিন্দুমাত্র ক্ষান্তি ঘটানোর কোন অবকাশ; আর না আছে অংশীদারিত্ব দাবী করার মত কোন ধৃষ্টতার সুযোগ। মহান প্রভুর স্পষ্ট ঘোষণা- জেনে রেখ, সৃজন ও আদেশ তাঁরই। তিনি মহিমাময় বিশ্ব প্রতিপালক *(আ'রাফ ৭/৫৪)*।

সুতরাং যাবতীয় সিজদা-আরাধনা, কামনা-বাসনা, আশা-ভরসা, ভক্তি-অনুরক্তি কেবল তাঁর কাছেই নিবেদিত হ'তে হবে। মান্য করতে হবে কেবল তাঁরই দেয়া বিধি-বিধান, তাঁরই প্রেরিত প্রত্যাদেশ-নির্দেশনা। এর ব্যত্যয় ঘটানোর কোন সুযোগ নেই। মহান রবের এই একচ্ছত্র আধিপত্য মেনে নেয়া ও তাঁর ইচ্ছার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে জগৎ সংসারের মূল রহস্য। এতেই রয়েছে বান্দার সফলতা ও মুক্তির চাবিকাঠি। আর এর বিপরীতে স্রষ্টার আধিপত্যে সামান্যতম বিঘ্ন ঘটায় এমন যা কিছু রয়েছে, তা-ই শিরকের প্রতিভূ, তা-ই পরিত্যাজ্য। তাতেই রয়েছে যাবতীয় অশান্তি আর ধ্বংসের সুলুক।

দ্বিতীয়তঃ পার্থিব জীবনে আমাদের একমাত্র চলার পথ রাসূল (ছাঃ) আনীত রবের প্রত্যাদেশ আর তাঁর প্রদর্শিত সুন্নাত। আমাদের যাবতীয় ইবাদত-আমল, আইন-সংবিধান, আচার-বিধি, সাহিত্য-সংস্কৃতি, লাইফস্টাইল-সবই পালিত হবে কুরআন ও সুন্নাহ বর্ণিত পন্থায়। এতেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণের দিশা, মানবীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সঠিক পরিচর্যা। এর বিপরীতে যত পথ ও মত, যত বুযুর্গ ও আকাবির, যত মান্য ও শ্রদ্ধেয়- সবই অগ্রহণযোগ্য, মানবতা বিধ্বংসী ও অকল্যাণের দিশারী। তা আপাতঃদৃষ্টিতে যতই গ্রহণযোগ্য ও শ্রুতিমধুর মনে হোক না কেন। সুতরাং নির্ভেজাল তাওহীদের বিশ্বাস এবং পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের নামই হ'ল ইসলাম। এর বাইরে ইসলামের নামে যত পথ ও মতের দিকে আহ্বান করা হোক না কেন, তা কখনই প্রকৃত ইসলাম নয়; বরং ইসলামের নামে মিথ্যাচার ও প্রতারণা। এই বার্তাটুকুই আমরা এদেশের সকল মুসলমানের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে চাই। আমরা জানাতে চাই- 'আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি'। 'সকল বিধান বাতিল কর অহি-র বিধান কায়েম কর'। কতজন এই দাওয়াত গ্রহণ করল- তা আমাদের বিবেচ্য নয়; বরং কতজনের কাছে এই দাওয়াত পৌঁছানো গেল সেটাই মূল বিবেচ্য।

আল্লাহ্র পথে দাঈ হিসাবে যারা কাজ করবেন, তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের উদাত্ত আহ্বান হ'ল, যাবতীয় ষড়যন্ত্র-বিভ্রান্তি, অলসতা-বিলাসিতা, হিংসা-বিদ্বেষ দু'পায়ে দলে যার যতটুকু জ্ঞান, যোগ্যতা ও ক্ষমতা আছে সবটুকু ব্যয় করে সাধ্যমত মানুষের কাছে হকের দাওয়াত তুলে ধরুন। স্মরণ করুন আল্লাহ্র বাণী- 'আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম যে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানায় এবং সৎকাজ করে। আর বলে, আমি তো আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৩)*। অন্তরে জাগ্রত রাখুন রাসূল (ছাঃ)-এর সেই চিরন্তন প্রেরণাবাণী- 'আল্লাহ্র কসম! তোমার দ্বারা যদি একটি মানুষও হেদায়াত লাভ করে, তা হবে তোমার জন্য (আরবের মূল্যবান সম্পদ) লাল উট লাভের চেয়ে উত্তম' *(বুখারী হা/৩৭০১; মুসলিম হা/২৪০৬)*। সেই সাথে এই মহান দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষ কিছু গুণাবলীর অধিকারী হ'তে হবে। যেমন-

(১) লক্ষ্যের দৃঢ়তা এবং হকের উপর সদা ইস্তিকামাত বা অবিচল থাকা। লক্ষ্যহীন ও দুর্বলচিত্ত মানুষ কখনও হকের দাওয়াত প্রচারের জন্য উপযুক্ত নয়। যিনি দাঈ হবেন, তাকে অবশ্যই লক্ষ্য সচেতন হ'তে হবে, সাহসী হ'তে হবে, আত্মবিশ্বাসী হ'তে হবে। কোন দুনিয়াবী স্বার্থে ও প্রলোভনে হক থেকে তার অবস্থান বিন্দুমাত্র নড়চড় হবে না। বাতিলের চাকচিক্য দেখে তিনি প্রতারিত হবেন না। বিপদ কিংবা সমস্যার ঘনঘটা তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করবে না।

(২) নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হওয়া। চারিত্রিক পবিত্রতা একজন দাঈর অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। যে ব্যক্তি পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে বাঁচার চেষ্টা করে না, কুপ্রবৃত্তিকে দমনে সতর্ক থাকে না, তাক্বওয়া অবলম্বন করে না, সে ব্যক্তি খুব সহজেই শয়তানের ফাঁদে আটকা পড়ে যায়। সুতরাং দাঈকে অবশ্যই দৃঢ় নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হ'তে হবে। শয়তানের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য সদা সতর্ক প্রহরীর ভূমিকা পালন করতে হবে। যেখানে অনৈতিকতার হাতছানি, যেখানে পাপের সম্ভাবনা, সেখান থেকে নিজেকে যোজন যোজন দূরে রাখতে হবে।

(৩) সততা ও আমানতদারিতা। এই গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি পৃথিবীর সর্বত্রই সফল। যার মধ্যে উক্ত গুণাবলীর প্রভাব যত বেশী, সে লক্ষ্য অর্জনে তত বেশী সফল। সুতরাং দাঈর জন্য সর্বাবস্থায় কথায় ও কর্মে সৎ, নীতিবান, আমানতদার ও ন্যায়পরায়ণ থাকা অপরিহার্য।

(৪) ধৈর্য। বিপদসংকুল পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত নানা মাত্রার প্রতিকূল পরিবেশ আমাদেরকে সদা আচ্ছন্ন করে। হতাশা, কষ্ট, ভয়-ভীতি আঁকড়ে ধরে। ঊর্ধ্বতনদের বাধা এবং অধীনস্থদের অবাধ্যতার মুখোমুখি হ'তে হয়। এমতাবস্থায় আমাদের রক্ষাকবচ হ'ল ধৈর্য। ধৈর্যশীলতার একমাত্র পরিণাম সফলতা। সুতরাং একজন দাঈকে সমাজ সংস্কারের ময়দানে ধৈর্যশীলতার মূর্ত প্রতীক হ'তে হবে।

(৫) সদাচরণ। দাঈ যত জ্ঞানী বা পরহেযগার হোক না কেন, তার মুখের ভাষা ও আচরণ যদি হয় অসংযত, যদি তার অন্তর হয় অপরের প্রতি শুভকামনাহীন ও বিদ্বেষপরায়ণ; তার পক্ষে দাওয়াতী ময়দানে নামাই অর্থহীন। দাঈকে অবশ্যই সদাচরণ রপ্ত করতে হবে। মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার মত উত্তম গুণাবলীসম্পন্ন হ'তে হবে।

পরিশেষে প্রাণপ্রিয় যুবক ভাইদের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে, অহীভিত্তিক বিশুদ্ধ ইসলামের বার্তাকে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার মিশনকে যেন আমরা আমাদের জীবনের মহোত্তম লক্ষ্য বানিয়ে নেই এবং এই মহান সংস্কার আন্দোলনের যোগ্য কর্মী হিসাবে নিজেদের গড়ে তুলি। আমাদের সমাজ ও আমাদের পরিপার্শ্বকে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী পরিচালনার জন্য সর্বাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করি। বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে যেন পৌঁছে যায় হকের আওয়াজ। বাংলার যমীন যেন একদিন পরিণত হয় বিশুদ্ধ দ্বীনের এক উর্বর চারণক্ষেত্রে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে সেই তাওফীক দান করুন এবং আমাদের সকলকে তাঁর দ্বীনের মর্দে মুজাহিদ হিসাবে কবুল করে নিন। পরজীবনে জান্নাতের চিরশান্তির আবাসস্থলের অধিকারী হওয়ার তাওফীক দিন- আমীন!

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কবে হবে প্রকৃত বিদ্যার আলয়?

বিগত ৮০-এর দশক থেকে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্ররাজনীতির বিষফল হিসাবে ক্যাম্পাসগুলো পড়ালেখার পরিবর্তে সন্ত্রাসের উর্বর লালনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। জ্ঞানের প্রাণকেন্দ্রে জ্ঞানবিমুখ কর্মকাণ্ড নিয়মিত দেখতে দেখতে এ জাতির বিস্মিত হওয়ার শক্তিও বোধহয় এখন নিঃশেষ হয়ে গেছে। ভাবতে অবাক লাগে দেশের কর্ণধার হিসাবে যারা দায়িত্ব পালন করছেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনসহ সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠগুলো যারা দেখভাল করছেন, তারা বছরের পর বছর জাতিগত অধঃপতনের এই নিকৃষ্টতম দৃশ্য কিভাবে সহ্য করছেন! সর্বোচ্চ মেধার লালনকেন্দ্র হিসাবে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারণে প্রধান নিয়ামক শক্তি হওয়ার কথা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের। হওয়ার কথা ছিল জাতীয় গুরুত্বের শীর্ষ কেন্দ্র। শিক্ষা ও গবেষণার প্রাচুর্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হওয়ার কথা ছিল জ্ঞানের একেকটি খনি। অথচ তথাকথিত রাজনীতির বিষবাষ্প ঢুকে গোটা ব্যবস্থাপনা এমনভাবে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় এখন যাবতীয় অন্যায়, দুর্নীতি, কুশিক্ষা আর অনৈতিকতার অবাধ অনুশীলনকেন্দ্র বললে অত্যুক্তি হয় না।

ফলশ্রুতিতে বিশ্ববিদ্যালয় এখন আর জ্ঞানকেন্দ্র নয়, বরং নিছক সার্টিফিকেট বিতরণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। যে ছাত্রটি উদয়াস্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে মেধার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় পা দিয়েছিল, সে এখন আর জ্ঞানার্জনে নয়; বরং ব্যস্ত ছাত্ররাজনীতির নামে আধিপত্য বিস্তার আর টেন্ডারবাজির প্রতিযোগিতায়। দুর্নীতির বাস্তব দীক্ষা তারা গ্রহণ করা শুরু করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ভাই নামক দানবদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। গণরুম কালচার, টর্চার সেল, র‍্যাগিং ইত্যাদি ভয়ংকর ও অবিশ্বাস্য অপরাধকর্মের সাথে তাদের পরিচয় ঘটছে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরু থেকেই। এর সাথে রয়েছে কথায় কথায় আন্দোলন, মিছিল-মিটিং, ভাঙচুর আর শিক্ষকদের সাথে বেয়াদবির সংস্কৃতি। আর এভাবেই অধঃপতনের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধাররা।

অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী সমাজের সবচেয়ে সম্মানিত অংশ হওয়া সত্ত্বেও প্রচলিত ক্ষমতা ও স্বার্থবাদিতার রাজনীতিতে জড়িয়ে তাদের একটা বড় অংশই হারিয়ে ফেলেছেন নীতি-নৈতিকতা। যারা সমাজ ও জাতির আদর্শ হওয়ার কথা ছিল, তারা নিজেরাই যখন আদর্শহীনতার স্রোতে গা ভাসান, তখন কার কাছে ছাত্ররা নৈতিক মূল্যবোধ ও আদর্শ শিখবে?

এখন তো অনৈতিকতার প্রথম পাঠটাই যে শুরু হচ্ছে শিক্ষক নিয়োগদান পর্ব থেকে। যেভাবে বর্তমানে জাতির সর্বোচ্চ শিক্ষালয়ে বিশেষ কোন যোগ্যতা ছাড়াই স্রেফ লবিং-গ্রুপিং-দুর্নীতির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে, তা কোন সভ্য সমাজে কল্পনাও করা যায় না। এমনকি প্রতিবেশী ভারত, পাকিস্তানের মত দেশেও এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। শিক্ষকতার প্রধান শর্ত হওয়ার কথা ছিল শিক্ষা ও গবেষণার সাথে ওতপ্রোত সম্পৃক্ততা। অথচ এর পরিবর্তে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততাই এখন নিয়োগের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র প্রাধান্য পাচ্ছে। ফলে ছাত্রদেরকে সুনাগরিক হওয়া এবং জ্ঞানার্জন ও গবেষণায় উৎসাহিত করার জন্য ন্যূনতম যে নৈতিক বল ও যোগ্যতা প্রয়োজন, সেটুকু আজ শিক্ষকদের কাছে পাওয়া দুষ্কর। বরং মেধাহীনতা, দুর্নীতির দৌরাত্ম্যে শিক্ষকতা পেশাই হারিয়ে ফেলেছে তার চিরন্তন মর্যাদা।

আমরা জানি, সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ হ'ল, পাঠদান ও জ্ঞানচর্চার সাথে সাথে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি করা। আরও খোলাসা করে বললে গবেষণার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান উৎপাদন, বিভিন্ন প্রকাশনার মাধ্যমে সেই জ্ঞান সংরক্ষণ এবং পাঠদানের মাধ্যমে জ্ঞান বিতরণ। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সাধারণভাবে নতুন কোন জ্ঞান উৎপাদনের পদক্ষেপ দেখা যায় কি? অভিজ্ঞমহল জানেন যে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল। ফলে মাধ্যমিক শ্রেণীর মত উচ্চতর শ্রেণীর শিক্ষার্থীরাও পুরানো জ্ঞানই অন্ধভাবে গলধঃকরণ করে আসছে। পরীক্ষার খাতায় মুখস্থনির্ভর জ্ঞান উপস্থাপন করা এবং দিনশেষে ভাল মার্কস পাওয়াতেই তারা সার্থকতা খোঁজে। শিক্ষকরা ছাত্রদের নতুন জ্ঞান আহরণ বা সৃষ্টিতে উৎসাহিত করেন না। তাদেরকে জ্ঞানের প্রয়োগক্ষেত্র দেখিয়ে দেন না। বিভাগগুলোতে বিষয়ভিত্তিক সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের কোন আয়োজন দেখা যায় না। এমনকি শিক্ষার্থীরা লাইব্রেরীতে পর্যন্ত যেতে আগ্রহী নয়। আমার বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) জীবনে এমন অনেক ছাত্র পেয়েছি, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে গিয়ে কখনো একটি বইও ছুঁয়ে দেখেনি। অর্থাৎ সৃষ্টিশীল জ্ঞানার্জনের জন্য যে পরিবেশ-

পারিপার্শ্বিকতা প্রয়োজন, তার ছিঁটেফোটাও নেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। এক অজানা গৎবাঁধা সিস্টেমের জালে সবাই যেন বন্দী।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সবচেয়ে বড় যে সংকট তা হ'ল গবেষণার সংস্কৃতি না থাকা। গবেষণা কী জিনিস তা মাস্টার্সে গিয়েও অধিকাংশ ছাত্র জানে না। অথচ মেধার সঠিক পরিচর্যা, দক্ষ মানুষ তৈরী করা, সর্বোপরি জাতীয় উন্নতির জন্য গবেষণার কোন বিকল্প নেই। উন্নত বিশ্বের দেশগুলো বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণা খাতে সবচেয়ে বেশী অর্থ খরচ করছে। সরকারী-বেসরকারী বহু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা গবেষণায় পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে। ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা দিন দিন উন্নতির শিখরে আরোহণ করছে। কিন্তু আমাদের দেশে ছাত্ররা অনার্স পর্যায়ে গবেষণার চিন্তাই করতে পারে না। আর মাস্টার্স বা পিএইচডি পর্যায়েও তারা যে গবেষণা করেন, তা উন্নত বিশ্বের গবেষণার তুলনায় পদ্ধতিগতভাবে শিশুতুল্য। গবেষণার সার্বজনীন মান রক্ষায় যত্নবান না থাকায় এসব গবেষণায় মৌলিকত্ব প্রায়ই থাকে না। ফলে গবেষণার মূল বিষয়টি তাদের নিকটে অনাস্বাদিতই থেকে যাচ্ছে। কেউ যখন দেশের বাইরে গিয়ে উন্নত বিশ্বের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় যুক্ত হয়, তখনই কেবল নিজ দেশের গবেষণা সংস্কৃতির দৈন্য অনুভব করতে পারে। কিন্তু তখন আফসোস ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। কেবলই মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের মূল্যবান সময়টা কিভাবেই না নষ্ট হয়ে গেছে।

বিস্ময়ের ব্যাপার হ'ল বাংলাদেশে গবেষণা সংস্কৃতি এতই দুর্বল যে, গবেষণার জন্য সরকারী যে যৎসামান্য বরাদ্দ রয়েছে তা-ও অব্যয়িত থেকে যাচ্ছে প্রকৃত গবেষকের অভাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৭-২০১৮ সনে গবেষণার জন্য বরাদ্দ দেয়া হয় ১৪ কোটি টাকা। কিন্তু বছরান্তে দেখা গেছে তা থেকে মাত্র ৮ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ইউজিসিতে ২০১৭ সালে ১০০টি পিএইচ.ডি ফেলোশীপ থাকলেও মাত্র ৫৮ জন শিক্ষক তা গ্রহণ করেন। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থাও তথৈবচ। ফলে বিপুল সংখ্যক মেধার অপচয় হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

অন্যদিকে ধর্ম ও নৈতিকতার শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দিন দিন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। যতটুকু রয়েছে তা-ও কেবল বইয়ের দুই মলাটের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফলে বাস্তবতার ময়দানে শিক্ষকসমাজ হোক কিংবা ছাত্রসমাজ, সকলেরই নৈতিকতার বন্ধন অত্যন্ত শিথিল ও নড়বড়ে। সামান্য স্বার্থের টানে

মুহূর্তেই তারা মাকড়সার জালের মত এই নৈতিকতার বন্ধন ছিন্ন করতে একটুও দ্বিধাবোধ করে না। আর এভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিদ্যার আলয় না হয়ে দূর্নীতি, অপশিক্ষা, মেধার অপচয়, স্বার্থদুষ্টতা আর সীমাহীন নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

এই নাভিশ্বাস অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে গেলে সবার আগে ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতির করালগ্রাস থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে রক্ষা করতে হবে। একশ্রেণীর সুশীল ব্যক্তি ৫২, ৬৯, ৭১, ৯০-এর উদাহরণ টেনে ছাত্ররাজনীতির পক্ষে বুলি কপচান। তারা কি জানেন না সেই আন্দোলনগুলো মূলতঃ ছাত্ররাজনীতির অবদান নয়, বরং সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে গড়ে ওঠা সহজাত আন্দোলন? প্রয়োজনে আবারও ছাত্রসমাজ জেগে উঠবে যেভাবে সাম্প্রতিক কালে কোটা সংস্কার আন্দোলন ও নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ঘটেছে। এজন্য লেজুড়ভিত্তিক ছাত্ররাজনীতির কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি? যে রাজনীতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে স্বাধীনতার পর থেকে ছাত্ররাজনীতির বলি হয়ে ইতিমধ্যে প্রায় ২০০ ছাত্র-ছাত্রী নিহত হয়েছে, সেই রাজনীতির হাতে ক্যাম্পাসে শিক্ষার পরিবেশ তো দূরের কথা, কারও প্রাণটাও তো নিরাপদ নয়। বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর এমন একটি রাষ্ট্র পাওয়া যাবে না, যেখানে এই তথাকথিত ছাত্ররাজনীতির নিকৃষ্ট চর্চা রয়েছে।

সুতরাং যদি বিশ্ববিদ্যালগুলোকে প্রকৃতই জ্ঞানকাননে পরিণত করতে হয়, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হোক। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হোক। শিক্ষক-ছাত্র সবার মাঝে জ্ঞান আহরণ ও গবেষণার সংস্কৃতি যেন গড়ে ওঠে এবং নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরী হয়, এ ব্যাপারে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর উপযুক্ত ভূমিকা পালন করা এখন সময়ের দাবী। সার্টিফিকেট বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান না হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিদ্যার প্রকৃত আলয় হোক, ক্ষমতা আর সন্ত্রাসনির্ভর ছাত্ররাজনীতির কেন্দ্র না হয়ে সুস্থ সংস্কৃতি ও নৈতিকতার বিকাশকেন্দ্র হোক, অবৈধ প্রেমকানন না হয়ে সুরোভিত জ্ঞানকানন হোক- এটাই আজ দেশের প্রতিটি সচেতন, জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীর হৃদয়ের গভীরতম প্রত্যাশা। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

করোনাকাল আমাদের কী শেখালো?

৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯। চীনের উহান থেকে এক ভাইরাসের অপ্রতিরোধ্য যাত্রা শুরু হ'ল। নানা জল্পনা-কল্পনার এক ঘোরলাগা প্রহর অতিক্রান্ত হ'তে না হ'তেই বিশ্ববাসী দেখতে পেল এক অদৃশ্য মহাশত্রুর হাতে কিভাবে একে একে পর্যুদস্ত হচ্ছে বিশ্বের বাঘা বাঘা শক্তিধর দেশগুলো। এ এক অকল্পনীয় দৃশ্য। অর্থ-বিত্ত, ক্ষমতা কোন কিছুই এই শত্রুর মোকাবিলায় কাজে আসছে না। পারমানবিক অস্ত্রেরও ক্ষমতা নেই এই সূক্ষ্ম, চোখে না দেখা শত্রুকে ঠেকাবার। ক্ষমতার গর্বে, বিত্তের অহংকারে স্ফীত হয়ে যেসব দেশ বিশ্বব্যাপী অন্যায়ভাবে ছড়ি ঘোরাতো, তারা আজ অসহায় হয়ে দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে ছুটছে একটুখানি আশ্রয়ের আশায়। এ এমন এক শত্রু যার ভয়ে ভীত হয়ে সারাবিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ আজ গৃহবন্দী। আসমানে বিমান উড়ে না, যমীনে গাড়ি-ঘোড়া চলে না। রাস্তার মোড়ে জটলা নেই। খেলার মাঠে শিশু-কিশোরদের কোলাহল নেই। হাসপাতাল রোগীশূন্য। আদালত আসামীশূন্য। রাস্তাঘাট জনশূন্য। হাট-বাজার ক্রেতা-বিক্রেতাশূন্য। স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা শিক্ষক-শিক্ষার্থীশূন্য। স্টেশন-বিমানবন্দর যাত্রীশূন্য। কল-কারখানা শ্রমিকশূন্য। মসজিদ মুছল্লীশূন্য। হারামাইন হাজীশূন্য। সিনেমা হল, রেস্তোরাঁ, পার্ক, স্টেডিয়াম, পর্যটনকেন্দ্র কোথাও কেউ নেই। ভারত, কাশ্মীর, মিয়ানমার, ফিলিস্তীন, সিরিয়া, ইয়েমেন, লিবিয়া, আফগানিস্তানে প্রতিনিয়ত যারা নিত্যনতুন অস্ত্রের পরীক্ষায় ব্যস্ত ছিল, লাখো-কোটি নিরীহ আদম সন্তানের প্রাণ সংহার করে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি ঠেকানোর দায়িত্ব নিয়েছিল, তারা আজ কোথায় যেন কঠোর নীরবতার সাথে আত্মগোপনে গেছে।

এ এমন এক ভয়ংকর গোপন আততায়ী যার হিম আতংকে অসুস্থ রোগীর যত্নে কেউ এগিয়ে আসে না। একান্ত আপনজনরাও বাড়িতে জায়গা দিতে চায় না। হাসপাতালে নিলেও খোঁজ নেয় না। মৃত্যু হ'লেও দাফন করে না। জানাযা হ'লেও উপস্থিত থাকে না। পবিত্র রামাযান মাস জুড়ে মুসলিম দেশগুলোতে চিরাচরিত সেই পারস্পরিক সৌহার্দের পবিত্র দৃশ্যগুলো অনুপস্থিত। নেই ইফতারের কোন উৎসবমুখর আয়োজন, নেই তারাবীতে মুছল্লীদের সারি।

দেখা হ'লে নেই সহজাত মুছাফাহা কিংবা কোলাকুলির দৃশ্য। কি ডাক্তার, কি সাধারণ মানুষ; কি নারী, কি পুরুষ; কি মধ্যযুগীয় পশ্চাদপদ, কি আধুনিক; সবার মুখে মাস্ক আর হাতে গ্লাভস।

যে হিজাব আর নেকাব পরার জন্য মুসলিম নারীদের হেনস্থার শিকার হ'তে হ'ত, আজ তা পরিধান না করলেই হয় জরিমানা। পারিবারিক মিলনমেলা বন্ধ। বিবাহ-শাদী, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, সভা-সমাবেশ সবকিছু বন্ধ। অজানা আতংকে জগতজুড়ে কর্মচঞ্চল মানুষগুলো আজ স্রেফ ঘরবন্দী। কোয়ারেন্টাইন, আইসোলেশন আর লকডাউনের ঘেরাটোপে গোটা মানব সমাজ নিমজ্জিত এক সীমাহীন স্থবিরতায়। এই দৃশ্যপটে ধনী-গরীব, আমীর-ফকীর কোন বাছ-বিচার নেই। সমগ্র বনু আদম আজ এক কাতারে।

প্রিয় পাঠক! ২০২০ সালের প্রথম সূর্য যেদিন উদিত হয়েছিল, সেদিন কারো মনে ঘুণাক্ষরেও কি এমন চিন্তার উদ্রেক হয়েছিল? সেদিন কেউ কল্পনা করেনি পৃথিবীর এমনরূপ কখনও দেখতে হবে। আবার করোনা পরবর্তী পৃথিবীর রূপ কেমন হবে তা নিয়েও তারা ছিল চরম দ্বিধান্বিত। পৃথিবী কি আবার আগের রূপে ফিরে যাবে, নাকি নতুন রূপে নিজেকে সাজিয়ে নেবে? বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতি কোন দিকে মোড় নেবে? এক অন্তহীন জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল গোটা মানবসমাজ। সবাই অধীর অপেক্ষায় ছিল যাবতীয় শংকা আর উদ্বিগ্নতা কাটিয়ে কবে ফিরবে সুদিন। পৃথিবী আবার কবে ফিরবে তার আপন চেহারায়। দেখতে দেখতে করোনাকালের মৃত্যুমুখর সেই ধুসর দিনগুলো অতিক্রান্ত হয়ে গেল। মৃত্যুর মিছিলে ইতিমধ্যে যোগদান করেছে কোটিখানেক বনু আদম। আক্রান্ত হয়েছে প্রায় শত কোটি মানুষ। এই তো কিছুদিন আগেই চারিদিকে ছিল হতাশার গভীর অমানিশা। অনিশ্চয়তায় ডুবে ছিল ভবিষ্যতের সকল ভাবনা।

করোনার এই মহাবিপদকাল আমাদের চোখ খুলে দেখিয়ে দিয়েছে পৃথিবীর অমোঘ বাস্তবতা। মানবতার এই চরম দুঃসময় মানুষের ভেতরটা একদম নগ্ন করে প্রকাশ করে দিয়েছে। বিপদে পড়লে যে কেউ কারো নয়, তার চাক্ষুষ প্রমাণ আমরা নিত্যই দেখেছি করোনার সেই দুর্যোগকালে। আতঙ্কের মধ্যে পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, স্বামী-স্ত্রী, পিতামাতা-সন্তান সব সম্পর্কগুলো কেমন মিথ্যা হয়ে যায়। মানুষ অমানুষ হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছিল যে, স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত বুলেটিনে প্রতিনিয়ত জনসাধারণকে মানবিক আচরণ বজায় রাখার পরামর্শ দেয়া হচ্ছিল। অবশ্য এর বিপরীতপীঠে এমন

অনেক দৃষ্টান্ত মিলেছে যেখানে মানবিক দায়বদ্ধতা নিয়ে মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে, যা মানুষের মনে আস্থা ও প্রশান্তির অনাবিল সুবাতাস যুগিয়েছে। মানবসভ্যতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে এই মহানুভব মানুষগুলো। এভাবে কখনও মানবতার মর্মন্তুদ পরাজয়, কখনও মহোত্তম বিজয়ের দোলাচলে যাপিত হয়েছে আমাদের করোনাকালের নিত্যদিন।

করোনাকালে আমাদেরকে সবচেয়ে ভাবিত করেছিল মানবতার পরাজয়ের সকরুণ দৃশ্যগুলো। শিক্ষা-দীক্ষা, সমাজ-সভ্যতা, আধুনিকতা কোন কিছুই আমাদের ভেতরকার পাশবিকতাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। মানুষ যে বিপদের সময় তার সর্বাধিক প্রিয় মানুষগুলোকেও এভাবে অবহেলায়, অনাদরে ছুড়ে ফেলতে পারে, তা করোনা না এলে হয়ত জানা হ'ত না। যে দৃশ্যগুলো কেবল কঠিন ক্বিয়ামত দিবসের কথা ভেবে আমরা কল্পনা করতাম, কারোনাকালে দেখা গেছে তার চাক্ষুষ বাস্তবতা। সুবহানাল্লাহ! ক্বিয়ামত দিবস সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ভাষ্য- 'সেদিন মানুষ পলায়ন করবে নিজের ভাইয়ের কাছ থেকে, নিজের মাতা-পিতার কাছ থেকে, স্ত্রী ও সন্তান থেকে। সেদিন প্রত্যেকেরই এমন গুরুতর বিপদ থাকবে যা নিয়ে সে ব্যতিব্যস্ত থাকবে' *(আবাসা ৮০/৩৪-৩৭)*। সে এতটাই দুশ্চিন্তামগ্ন থাকবে যে, নিজের সবচেয়ে নিকটতম আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব থেকেও অমুখাপেক্ষী ও বেপরোয়া হয়ে যাবে। কেউ কারো প্রতি ভ্রূক্ষেপ করার মত অবস্থায় থাকবে না। যে মানুষ আখেরাতের তুলনায় অতীব তুচ্ছ বিপদে এভাবে পরম আত্মজনকে ছেড়ে যেতে পারে, ক্বিয়ামতের ভয়াবহ বিপদকালে তার অবস্থা কী হ'তে পারে তা বলাই বাহুল্য। ক্বিয়ামতের সেই ভয়াবহ দৃশ্যপটের বাস্তবতা আমরা তাই প্রতিনিয়তই অনুভব করেছি।

আমরা দেখেছি করোনায় আক্রান্ত শিশু সন্তানকে রংপুর মেডিকেল থেকে ঢাকায় ট্রান্সফারের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। কিন্তু মেডিকেল থেকে স্ট্রেচারে এ্যাম্বুলেন্সে তুলতে হবে, এটুকুর জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি। চট্টগ্রামের আনোয়ারায় সন্দেহভাজন মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর দায়ে একজন হাফেযকে মারধর করেছে স্থানীয় জনগণ। সিরাজগঞ্জের সন্দেহভাজন করোনা উপসর্গের রোগী বহনের দায়ে নৌকায় দেয়া হয়েছে আগুন আর মাঝিকে পিটুনি।

জামালপুরে জনৈক ব্যক্তি করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে তার পরিবারের লোকজন ঢাকা থেকে নিজ যেলায় লাশ নিয়ে এলে এলাকাবাসী দাফনে বাধা

দেয়। পরে ঢাকা থেকে একটি বেসরকারী সংস্থার স্বেচ্ছাসেবক দল এসে সেই ব্যক্তির কবর খোঁড়ে এবং জানাযা পড়ায়। এখানেই শেষ নয়, সেই ব্যক্তির দাফনের পর তার স্ত্রী ও সন্তানকে গ্রামবাসী তালা দিয়ে আটকে রাখে। কোন আত্মীয়-স্বজনকে তার বাড়ির ত্রিসীমানায় আসতে দেয়নি। মৃত ব্যক্তির বাড়িতে খাবার দেয়ার নিয়ম প্রতিবেশীদের। সেই সুযোগও দেয়া হয়নি। অনাহারী সেই পরিবারটি প্রতিবেশী কয়েকজনকে বাজার করে দেয়ার অনুরোধ করলে, তখন তাদেরকেও হুমকি দেয়া হয়ে যে, কেউ বাজার করে দিলে তাদেরকেও ঘরে তালা মেরে দেয়া হবে। অবশেষে স্থানীয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপে এর সুরাহা হয় বটে; কিন্তু পরিবারটিকে একঘরেই করে রাখা হয়। তাদের করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ এলেও গ্রামবাসী তা বিশ্বাস করেনি। পরিবারের কর্মক্ষম মানুষটির মৃত্যুবরণে তাদের শোকাহত হওয়ারও অধিকার ছিল না। মানুষ তাদের সান্ত্বনা দেয়া তো দূরের কথা, কেউ তাদের সাথে কথাও বলেনি। এই পরিবারগুলো জানে না মানুষ কি আগে থেকে এরকম অমানবিকই ছিল, নাকি করোনাই তাদের এমন অমানবিক বানিয়েছিল।

ফেনীর সোনাগাজীতে অবতারণা হয় আরো বীভৎস দৃশ্যের। জনৈক সাহাবুদ্দীন (৫৫) চট্টগ্রাম থেকে করোনার উপসর্গ নিয়ে গ্রামে ফিরেন। কয়েক দিন পর হাসপাতালে নমুনা দিয়ে দুপুরে বাড়ী ফেরার পর পরিবারের লোকজন তাকে একটি ঘরে একা রেখে বাহির থেকে দরজায় ছিটিকিনি লাগিয়ে রাখে। দেয়া হয়নি দুপুরের খাবার। বিকেলে তার শ্বাসকষ্ট ও কাশি বেড়ে যায়। এসময় তিনি চিৎকার করে খাবার চাইলেও কেউ দেয়নি। পানি চেয়েও পায়নি। বাড়িতে ছিল তার স্ত্রী, তিন কন্যা, তিন জামাতা ও ছোট ছেলে। ছেলেটি বাবার সাহায্যে এগিয়ে যেতে চাইলে বোনেরা বাধা দেয়। এভাবে ঘরবন্দী অবস্থায় চিৎকার করতে করতে রাত ১০টার দিকে তার মৃত্যু ঘটে। অবশেষে ছোট ছেলের চিৎকার শুনে রাত একটার দিকে স্থানীয় চেয়ারম্যান এগিয়ে আসেন এবং দাফনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু দাফনের জন্য স্থানীয় মসজিদের খাটিয়া দিতে অস্বীকার করা হয়। এমনকি কবর খোঁড়ার জন্য কোদালও দেয়নি কেউ।

গাজীপুরের এক মাকে তার নিজ সন্তানরা করোনা আক্রান্ত সন্দেহে গাড়িতে করে এনে টাঙ্গাইলের শফিপুরের জঙ্গলে ফেলে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে প্রশাসন তাকে উদ্ধার করে এবং সেই মায়ের করোনা টেস্ট নেগেটিভ এসেছিল। অন্যদিকে এক পিতা-মাতা তাদের চৌদ্দ বছরের সন্তানকে কিছু টাকা, পানি আর পাউরুটি দিয়ে রাতের আঁধারে বাঁশঝাড়ে ফেলে পালায়

চট্টগ্রামের লোহাগড়ায়। ফজরের পর এক বৃদ্ধাকে মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরানো অবস্থায় দেখতে পেলে তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়। দুনিয়াতে পিতা-মাতাই মানুষের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। তারাই যদি সন্তানকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে পালিয়ে যেতে পারে, তবে পরিস্থিতি কতটা অমানবিক পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে তা কল্পনা করা যায়? অনুরূপভাবে বগুড়ায় ৬৫ বছরের এক বৃদ্ধকে করোনা সন্দেহে তার স্ত্রী বাড়ি থেকে বের করে দেয় বৃষ্টিভেজা রাতে। বৃদ্ধের ছেলে-মেয়েরা নীরবে সে দৃশ্য দেখলেও তাদের অন্তরে মায়া হয়নি। পরে পুলিশ তাকে রাস্তা থেকে উদ্ধার করে।

এছাড়া এই হাসপাতাল সেই হাসপাতাল ঘুরে চিকিৎসা না পেয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন এমন রোগীর সংখ্যা অগণিত। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীকে ভাড়াটিয়ারা বাড়িতে ঢুকতে দিতে চাইছেন না বা বাড়ি ছাড়ার জন্য নোটিশ দিয়েছেন এমন উদাহরণের তো কোন অভাব নেই। এমনকি এক স্বাস্থ্যকর্মীর বাড়িতে সারারাত ঢিল ছুঁড়ে তার পরিবারকে বাড়ি ছাড়া করার চেষ্টা চালিয়েছিল তার প্রতিবেশীরা। হাসপাতালে বাবার লাশ রেখে ছেলেরা পালিয়েছে, রাতের গভীরে নাম-পরিচয়হীন লাশ রাস্তায় পড়ে থাকছে, জানাযা-দাফনের জন্য পরিবারের কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না, এমন খবর পাওয়া গেছে হরহামেশাই। এছাড়া খবরের বাইরেও রয়েছে এমন বহু খবর।

মানবতার এমনতরো করুণ বিপর্যয়দৃশ্য দেখার পাশাপাশি আমরা দেখেছি নিজের জীবন বিপন্ন করে ডাক্তার, পুলিশসহ বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও সাধারণ মানুষ কিভাবে মানুষের কল্যাণে এগিয়ে এসেছিল। আমাদের চোখ অশ্রুসজল হয়েছে যখন আমরা দেখেছি শেরপুরের ঝিনাইগাতি উপযেলার অশীতিপর বৃদ্ধ ভিক্ষুক নাযীমুদ্দীন নিজের বাড়ি বানানোর জন্য জমানো দশ হাযার টাকা করোনায় কর্মহীন হয়ে পড়া দরিদ্র মানুষের সেবায় দান করেছেন। আমাদের উজ্জীবিত করেছিল নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর মাকছূদুল আলম খোরশেদ ও তার বাহিনী কর্তৃক শতাধিক লাশ দাফনের কাহিনী, যে লাশগুলো তাদের আত্মীয়-স্বজনরা পর্যন্ত দাফন করতে রাযী হয়নি করোনার ভয়ে। দেশের প্রতিটি প্রান্তে গোচরে-অগোচরে অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং হৃদয়বান ব্যক্তিরা সাধ্যমত অভাবী মানুষের দুয়ারে খাদ্য ও অন্যান্য সহযোগিতা পৌঁছে দিয়েছেন। মানুষ মানুষের জন্য-এই মহানব্রতকে অক্ষুণ্ন রেখে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এভাবে বহু মানুষ যাবতীয় বিপদাপদকে তুচ্ছ করে সমাজসেবার ময়দানে তৎপর ছিলেন মাশাআল্লাহ। আমরা তাদের

প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ তাদের এই মহান খেদমত কবুল করুন- আমীন!

করোনার বিপর্যয়কালে মানবতার জয়-পরাজয়ের যে চাক্ষুষ দৃশ্য আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়েছে তা নিশ্চয়ই বর্তমান প্রজন্মের হৃদয়কন্দরে গভীর চিন্তার খোরাক যোগাবে। এই প্রজন্ম যুদ্ধ দেখেনি, সামষ্টিক কোন সংগ্রামের দৃশ্য দেখেনি, কিন্তু দেখেছে করোনা মহামারীতে বিপর্যস্ত বিশ্ব। এ এমন এক ক্রান্তি কাল, যুগান্তরের ইতিহাসে যার কোন তুলনা নেই। দৃশ্যমান কোন শত্রু ছাড়াই যে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি প্রান্ত এভাবে অজানা আতংকে স্থবির ও নিস্তব্ধ হ'তে পারে, তার কোন উদাহরণ আমাদের জানা নেই। একটি বিশ্বযুদ্ধও বোধহয় এতটা প্রলয়ংকরী হ'তে পারত না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবিশ্বাস্য উন্নতির এই যুগে এই অচিন্তনীয় ঘটনা আবারও প্রমাণ করেছে, মানবজাতি প্রকৃতই কতটা অসহায়, কতটা পরমুখাপেক্ষী। কেবল স্বাস্থ্যব্যবস্থাই নয়, গোটা বিশ্বব্যবস্থাই যেন ওলট-পালট হয়ে গেছে সামান্য অদৃশ্য অণুজীব মোকাবিলার অবিশ্বাস্য ব্যর্থতায়।

এই ব্যর্থতা নিশ্চয়ই বিশ্ব মানবসমাজকে আপন সীমাবদ্ধতাকে নতুনভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ দেবে। সীমালংঘনের পর সীমালংঘন করে যারা নিত্যই তৃপ্তির ঢেকুর তুলছিল, তারা তাদের পরিণতির কথা নিশ্চয়ই ভাববে। যারা অর্থ-বিত্ত আর ক্ষমতার মিথ্যা মোহে জীবনপাত করে চলেছিল, তারা জীবনের উল্টো পীঠ থেকে নিশ্চয়ই শিক্ষা নেবে। অন্যায়-অবিচার ছিল যাদের দৈনন্দিন বিনোদনের অংশ, এই রূঢ় অভিঘাত তাদের মাঝে নতুন জীবনবোধের উন্মেষ ঘটাবে। আর এই মহৎ উপলব্ধি থেকেই হয়ত জন্ম নেবে মানবতাবোধের নয়া সবক। যে সবক মানুষকে মানুষের প্রতি অধিকতর সহমর্মী করে তুলবে। অর্থহীন হিংসা-হানাহানির পথ ছেড়ে অর্থপূর্ণ মানবিক জীবনের পথে পরিচালিত করবে। আর এই পথ ধরেই তারা একদিন মহান স্রষ্টার প্রতি আত্মসমর্পণের চিরন্তন বার্তাকে প্রাণ উজাড় করে স্বাগত জানিয়ে ধন্য হবে। এটাই হোক আমাদের সর্বাঙ্গীন কামনা।

করোনাকাল আমাদেরকে দিয়েছে বহু নতুন ভাবনার উপলক্ষ। ২০০১ সালের নাইন ইলেভেন যেমন বিশ্বব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সূচিত করেছিল, ২০২০ সালের করোনা ভাইরাস হয়ত তার চেয়ে বড় পরিবর্তন এনেছে। যার নেতিবাচক দিকগুলোর মধ্যে অন্যতম হ'ল- মানুষ হয়ত দিনে দিনে আরো অসামাজিক, সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, প্রযুক্তিনির্ভর জীব হয়ে পড়বে। আর রাষ্ট্রগুলো

হয়ে পড়বে আরও বেশী জাতীয়তাবাদী ও আত্মকেন্দ্রিক। ফলে মানুষে মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্কগুলো হয়ে পড়বে শিথিল, উষ্ণতাহীন এবং নিরেট স্বার্থপ্রণোদিত। অপরদিকে ইতিবাচক দিকগুলো হ'ল, মানুষ হয়ত অর্থ আর ক্ষমতার মোহের পিছনে ছোটা থেকে কিছুটা হ'লেও পিছপা হবে। কেননা বিপদ যখন ঘনিয়ে আসে, তখন অর্থ আর ক্ষমতা যে কোনই কাজে আসে না, তা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছে করোনা। ফলে অন্যায়, পাপাচার, হিংস্রতা, অর্থ ও ক্ষমতার প্রতি লোলুপতা, অন্যের বিনাশকামিতার মত ধ্বংসাত্মক চিন্তা থেকে মানুষ বেরিয়ে এসে আরও মানবিক হওয়ার কথা ভাববে। সেই সাথে জীবন-জীবিকার ইঁদুর দৌড়ে পরিবার-পরিজনকে ভুলতে বসা মানুষ নিজেকে নিয়ে, পরিবার ও সমাজকে নিয়ে ভাবার সুযোগ পাবে। আর এভাবেই হয়ত জন্ম নেবে আগামীর পৃথিবীকে নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্য পরিচ্ছন্ন ও ইতিবাচক চিন্তাধারার। মানবসভ্যতার পুনর্বিনিমাণে যার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

সর্বোপরি করোনা ভাইরাস নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, পৃথিবীর পরিচালনায় একজন মহান সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন, যার সামান্য ইশারায় সবকিছু নিমিষে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। আসমান-যমীনের যিনি একচ্ছত্র মালিক, ফিরে যেতে হবে কেবল তাঁরই কাছে। করোনা আমাদের শিখিয়েছে, আমরা যতই নিজেদের বড় মনে করি, ক্ষমতাধর মনে করি, আইনের ঊর্ধ্বে মনে করি, আসল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ। করোনা আমাদের শিখিয়েছে বস্তুগত উপকরণে আমরা যতই সমৃদ্ধ হই না কেন, কোন কিছুই আমাদেরকে রক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়, কোন কিছু দিয়েই মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না, একমাত্র আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত।

অতএব সেই মহাশক্তিধর সত্তার কাছে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণই আমাদের জীবনের পরমার্থ। বস্তুতঃ পৃথিবী ভাঙ্গা-গড়ার এই পরীক্ষা আল্লাহ এজন্যই নিয়ে থাকেন, যেন মানুষ তাঁর দিকে ফিরে আসে এবং তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করে। অতএব আসুন আমরা তাঁরই কাছে পূর্ণাঙ্গভাবে আত্মসমার্পণ করি। তবেই আমরা দুনিয়া ও আখেরাতে সফলদের কাতারে অন্তর্ভুক্ত হতে পারব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ বলেন, (হে মুহাম্মাদ!) তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও, যারা তাদের উপর কোন বিপদ এলে বলে, নিশ্চয়ই আমরা তো আল্লাহ্রই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই আমরা ফিরে যাব' *(বাক্বারাহ ২/১৫৬)*।

নারীর প্রতি অশুভ দৃষ্টিভঙ্গি

মানুষ পাশবিকতার চরমতম পর্যায়ে না পৌঁছালে তার পক্ষে ধর্ষণ বা নারী নির্যাতনের মত বর্বরতার জন্ম দেয়া অসম্ভব। অথচ এই অচিন্তনীয় ঘটনাই এখন বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকার নিত্য-নৈমিত্তিক খবর। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে করোনা মহামারীর ভয়াবহ বিপর্যয় ও লকডাউনের মত কার্যত কার্ফ্যু পরিস্থিতির মধ্যে মাত্র নয় মাসে ৯৭৫টি ধর্ষণের ঘটনা পুলিশী রেকর্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে গণধর্ষণের মত ভয়ংকর অপরাধ ছিল ২০৮টি। এদের মধ্যে ৪৩জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। আর লজ্জায়-অপমানে আত্মহত্যা করেছে আরো ১২ জন নারী। এগুলো শুধু রেকর্ডভুক্ত ঘটনা। প্রকৃত সংখ্যা যে কয়েকগুণ বেশী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা এ ধরনের ঘটনার মাত্র ২০ শতাংশই প্রকাশ পায়। মান-সম্মানের ভয়ে লোকলজ্জায় বাকী ঘটনাগুলো অপ্রকাশিত থাকে। এর বাইরে করোনাকালীন পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়ে নিহত হয়েছে আরো ২৭৯ জন নারী। আর নির্যাতনে আত্মহত্যা করেছে ৭৪ জন নারী।

উপরোক্ত তথ্যগুলো থেকে কিছুটা হ'লেও আঁচ করা যায়, আমাদের সমাজ নারীদের নিরাপত্তা দিতে কতটা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে এবং কিভাবে এ সমাজে নারীরা মর্মান্তিক নির্যাতন ও নিগ্রহের শিকার হচ্ছে। অথচ দেশবিধায়কগণ দাবী করেন, দেশের আইন-কানূন ও সমাজব্যবস্থা নাকি নারীবান্ধব করে গড়ে তোলা হয়েছে! বস্তুতঃ প্রচলিত এই নারীবান্ধব সমাজ গড়ার শ্লোগান যে নারীকে কতটা অরক্ষিত ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় ফেলে দিয়েছে, তা আমাদের দায়িত্বশীলগণ যতদিন পর্যন্ত উপলব্ধি না করবেন, ততদিন নারীর জন্য নিরাপদ সমাজ গড়ার দাবী অবান্তরই প্রতীয়মান হবে।

সচেতন পাঠক! নারী নির্যাতন কেন হয়? বাংলাদেশের মত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে কেন এক শ্রেণীর বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষ ধর্ষণের মত বর্বরতায় লিপ্ত হচ্ছে? কেন ধর্ষণের পরিসংখ্যানে বাংলাদেশ মুসলিম দেশগুলির মধ্যে প্রথম? এই ধর্ষণ মনোবৃত্তির মূল উৎস কোথায়? এই প্রশ্নগুলির উত্তর আমাদের খোঁজা দরকার। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হ'ল- ধর্ষণ যখন মহামারীর আকার ধারণ করে তখন তা কেবল ব্যক্তিগত অপরাধ থাকে না, বরং সেই অপরাধের দায় সমগ্র সমাজের উপর পড়ে। যেই সমাজে মানবিক মূল্যবোধের চর্চা নেই,

নৈতিক শিক্ষার বাস্তবায়ন নেই, আইনের শাসন নেই, সেই সমাজে এই ধরনের অপরাধ যে ধারাবাহিক চলতেই থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। তাহ'লে কি আমাদের সামাজিক পরিমণ্ডলই এই ধর্ষক উৎপাদনের উর্বর রসদ যোগান দিচ্ছে? আসুন! বিষয়টি যাচাইয়ের চেষ্টা করি।

প্রথমতঃ চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করবেন যে, বর্তমানে ধর্ষণ মনোবৃত্তি তৈরীতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখছে মিডিয়া। পত্র-পত্রিকা ও সিনেমা-টিভিতে নারীকে যেভাবে অশালীনভাবে উপস্থাপন করা হয়, তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, যুবসমাজের মধ্যে বিকৃত মানসিকতা ঢুকিয়ে দেয়ার প্রাথমিক কাজটি মূলতঃ মিডিয়াই নিয়মিতভাবে আঞ্জাম দিচ্ছে। আর এর সাথে আরো ভয়ংকরভাবে যুক্ত হয়েছে অবাধ আকাশ সংস্কৃতির নীল দংশন, যার বিষাক্ত ছোবলে একশ্রেণীর যুবসমাজের মন-মস্তিষ্ক পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে ফেলেছে। সুতরাং আইন যতই কঠোর করা হোক না কেন, যদি মিডিয়ার এই জঘন্য উৎসমুখ বন্ধ না করা যায়, তবে কখনই সুস্থ ও নিরাপদ সমাজব্যবস্থা কামনা করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়তঃ নাটক, সিনেমা, বিজ্ঞাপন সবকিছুর মূল উদ্দেশ্য যেন একটিই- নারী-পুরুষের অনৈতিক সম্পর্ককে উৎসাহিত করা। নারী-পুরুষ বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ককে সেখানে এত স্বাভাবিকভাবে উপস্থাপন করা হয়, যেন তা কোন অপরাধের সংজ্ঞাতেই পড়ে না। ফলে যেনা-ব্যভিচারের বিস্তার দিন দিন বাড়ছে। নারী-পুরুষ সহজেই তাদের ইয্যত-আব্রু বিকিয়ে দিচ্ছে। এর বিপরীতে বিবাহ তথা বৈধ সম্পর্ককে দিন দিন করা হচ্ছে কঠিন থেকে কঠিনতর। পরিবার থেকে যেমন দ্রুত বিবাহকে উৎসাহ দেয়া হয় না, তেমনি সমাজও দ্রুত বিবাহকে অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখে। ফলে একদিকে নারী-পুরুষের বৈধ সম্পর্কের পথ কঠিন হয়ে যাচ্ছে, অপরদিকে সহজসাধ্য হচ্ছে অনৈতিক সম্পর্ক, যেনা-ব্যভিচার।

তৃতীয়তঃ নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও সহশিক্ষা অনৈতিকতা বিস্তৃতির অন্যতম কারণ। নারী শিক্ষা, নারী উন্নয়ন, লিঙ্গ বিদ্বেষ ও বৈষম্য দূরীকরণ তথা নারীর কর্মসংস্থানের নামে বর্তমানে যে প্রোপাগাণ্ডা চলছে, তার একটিই উদ্দেশ্য নারীদেরকে ক্ষমতায়নের প্রলোভন দেখিয়ে ঘর থেকে বের করে জীবন-জীবিকার কঠিন ময়দানে নামিয়ে দেয়া। তাতে সমস্যা ছিল না, যদি তাদের জন্য স্বতন্ত্র ও নিরাপদ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া হ'ত। কিন্তু তাদেরকে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতায় লাগিয়ে দিয়ে রীতিমত যুদ্ধে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। অপরদিকে সহশিক্ষার নামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পবিত্র অঙ্গনে তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীদেরকে অবাধ মেলামেশার সুযোগ করে দেয়া

হচ্ছে। নৈতিকতার মহা পরীক্ষায় সেখানে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই উত্তীর্ণ হ'তে পারে না। ফলে মানবীয় প্রবৃত্তির দুর্বলতম অংশের কাছে পরাজিত হয়ে অতি সহজে তারা অনৈতিকতার পথে পা বাড়াচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে পাপ-পঙ্কিলতার মহাসাগরে। এদেশের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এখন যেন ইভটিজিং, যেনা-ব্যভিচার ও অবাধ যৌনাচারের অনুশীলনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। জোড়ায় জোড়ায় অন্তরঙ্গভাবে বসে থাকা নর-নারীর প্রকাশ্য অপকর্মে শয়তানও বোধহয় লজ্জিত হয়। অথচ ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে নীরবে আমরা তা হযম করে চলেছি অহর্নিশ।

চতুর্থতঃ পথেঘাটে নারীর পর্দাহীন এবং অশালীন চলাফেরা নিঃসন্দেহে ধর্ষকদের কুপ্রবৃত্তি তৈরীতে বড় ভূমিকা রাখছে। নৈতিক মূল্যবোধ, লজ্জাশীলতা ও ইসলামের দেয়া নীতিমালাকে অবজ্ঞা করে একজন নারী যখন অশালীন পোষাকে ঘর থেকে বের হয়, তখন সে যেন সমাজের কুরুচিশীল কীটগুলোকে অনৈতিকতার দিকে প্রচ্ছন্ন আহ্বান জানায়। সুতরাং নারীবাদীরা ধর্ষণের পিছনে পর্দাহীনতার পরোক্ষ দায় যতই আড়ালের চেষ্টা করুক না কেন, যতদিন নারী স্বেচ্ছাচারী ও পর্দাহীন থাকবে, ততদিন নারীর প্রতি সহিংসতা বিদূরিত হওয়া অসম্ভব।

পঞ্চমতঃ যদিও সরকার ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছে, কিন্তু সেই আইনের বাস্তবায়ন না হওয়া এবং প্রচলিত বৃটিশ বিচারব্যবস্থার সীমাহীন দুর্বলতাও নারী নির্যাতন বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। ২০০১ থেকে ২০২০ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত নারী নির্যাতন মামলা সমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ পর্যন্ত আদালতে মাত্র ৩.৫৬% মামলার রায় হয়েছে।

আর উচ্চ আদালতের জটিলতা কাটিয়ে মাত্র ০.৩৭% মামলায় দণ্ডাদেশ কার্যকর হয়েছে। শুধু তাই নয়, পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ২০১১ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৬টি যেলায় ধর্ষণের অভিযোগে ৪৩৭২টি মামলা হয়েছে। কিন্তু দোষী সাব্যস্ত করা গেছে মাত্র ৫জনকে। অর্থাৎ মুখে মুখে আইনের বুলি কপচানো হ'লেও বাস্তবে এসব মামলা ও আইনী ব্যবস্থা কেবল প্রহসন ছাড়া কিছু নয়। শুধু তাই নয়, অর্থ ও ক্ষমতার দাপটে প্রকৃত দোষীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আড়ালে থেকে যায়। বিপদগ্রস্ত হয় নির্দোষীরা। সুতরাং নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করতে গেলে প্রচলিত এই বিচারব্যবস্থার আশু পরিবর্তন কিংবা সংস্কারের কোন বিকল্প নেই। ইসলামের কঠোর বিচারব্যবস্থা যদি চালু করা যেত, তবে নিঃসন্দেহে নারীর প্রতি সহিংসতার হার বহুলাংশেই নিবারণ করা সম্ভব হ'ত।

সর্বোপরি নারীদের প্রতি আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিরাট ত্রুটি রয়ে গেছে। আমাদের পরিবারে ও সমাজে ইসলামের নৈতিক শিক্ষার চর্চা না থাকায় নারীদেরকে একদল মানুষ ভোগ্যপণ্য মনে করে যথেচ্ছ ব্যবহার করছে। অপরদল নিছক সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র মনে করে। অথচ পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুষ্ঠু সমাজ গঠনে তাদের ভূমিকাও অপরিসীম। তারা কখনও আমাদের মা, কখনও বোন, কখনও স্ত্রী, কখনও কন্যা। একশ্রেণীর বিপথগামী নারীদের কারণে নারীদের প্রতি আমাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হ'তে পারে না। সুতরাং পরিবার ও সমাজে নারীর যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। সেই সাথে শারঈ পর্দা, দৃষ্টির হেফাযতসহ তাদের প্রতি ইসলামের নির্দেশিত হকগুলো আদায় করতে হবে। পরিবার ও সমাজে এই আদর্শিক মূল্যবোধের চর্চা নিশ্চিত করতে হবে। নতুবা শুধু আইন দিয়ে নারী নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব নয়।

যুবসমাজের প্রতি আহ্বান, একজন পুরুষ যদি নারীকে নিজের মা-বোনের আসনে রাখে, তবে তাদের প্রতি অসংগত বা অভব্য আচরণের কোন প্রশ্নই আসতে পারে না। সুতরাং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধকে শক্তিশালী করুন। আল্লাহকে ভয় করুন। নিজের ব্যক্তিত্বের সুরক্ষা ও চারিত্রিক সৌন্দর্য অক্ষুণ্ন রাখতে চাইলে অবশ্যই নারীদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে হবে। যদি তা না থাকে, তবে যেকোন সময় চারিত্রিক অধঃপতন নেমে আসবে। অতএব আসুন নিজেরা সর্বতোভাবে পবিত্র থাকি এবং নিজেদের ব্যক্তিত্বে সুস্থ চিন্তা ও ইসলামী মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাই। সেই সাথে সমাজকেও পবিত্র রাখার জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করি। প্রচলিত কিশোর গ্যাং কালচার, বয়ফ্রেণ্ড-গার্লফ্রেণ্ড কালচার, বখাটেপনা, ইভটিজিং, যেনা-ব্যভিচার ও পর্দাহীনতা প্রভৃতি সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে সোচ্চারকণ্ঠ হই। এভাবে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যদি আমরা একটি সচেতন, জাগ্রত ও আল্লাহভীরু প্রজন্ম গড়ে তুলতে পারি, তাহ'লে এসব অপরাধ সামাজিকভাবেই দমন হবে ইনশাআল্লাহ। সরকারের প্রতিও আমাদের আহ্বান থাকবে- কেবল ধর্ষণের বিরুদ্ধে কেতাবী আইন নয়; বরং বাস্তবতার ময়দানে এই জঘন্য পাপাচারের উৎসমুখগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে এবং তা সমাধানের জন্য সর্বাত্মক ও বাস্তবমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অপরাধী ও পাপীষ্ঠদের সহযোগী, যুলুম ও প্রতারণায় ভরপুর বৃটিশ আইনের পরিবর্তে স্বচ্ছ, মানবিক ও ন্যায়বিচারপূর্ণ ইসলামী আইন ও বিচারব্যবস্থা চালু করতে হবে। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে যাবতীয় অন্যায় ও অনৈতিকতার বিরুদ্ধে ইসলামের রূপরেখা মেনে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের তাওফীক দান করুন- আমীন!

নাস্তিকতার ভয়ংকর ছোবল

১৫ই ফেব্রুয়ারী'১৩। রাজধানী ঢাকায় জনৈক নাস্তিক ব্লগার রাজীব হায়দারের নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে নাস্তিকতার যে ভয়াল চিত্র উন্মোচিত হয়, তা সমগ্র দেশবাসীকে স্তম্ভিত করে দেয়। নাস্তিকতা যে কত নিকৃষ্ট হ'তে পারে, ধর্মহীনতা যে মানুষকে পশুত্বের ও নৈতিক অবক্ষয়ের কোন অতলে নিক্ষেপ করতে পারে, তথাকথিত 'মুক্তবুদ্ধি'র চর্চার আড়ালে ইসলাম-বিদ্বেষের যে কি জঘন্যতম কুৎসিত অবয়ব লুকিয়ে আছে, তার এক বাস্তব প্রতিমূর্তি অত্যন্ত প্রকটভাবে ফুটে উঠে এই চিত্রে। লক্ষণীয় যে, ইন্টারনেটে অবাধ তথ্যপ্রবাহের সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশে গত কয়েক বছর ধরে নাস্তিকতার প্রচার ও প্রসার বেশ জোরালোভাবে শুরু হ'লেও কোন এক অজানা কারণে গণমাধ্যমে এ সম্পর্কে কোন রিপোর্ট বা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়নি। ফলে এ দেশে নাস্তিকতার এই ভয়ংকর রূপটি জনসমাজে এক প্রকার অজ্ঞাতই ছিল। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এই ইসলামবিদ্বেষী নাস্তিক চক্রটি দিনে দিনে শক্তিশালী হয়ে দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তরুণ শিক্ষার্থীদের মগজ ধোলাইয়ের জন্য সুদূরপ্রসারী মিশন গ্রহণ করে। এদের মরণ ছোবলের শিকার হয়ে শহুরে শিক্ষিত তরুণ সমাজের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিজের দ্বীন-ধর্ম সম্পর্কে বিপজ্জনকভাবে বীতশ্রদ্ধভাব ও সংশয় পোষণ করা শুরু করেছে।

শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের এই দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের জীবনাচারকে বিশুদ্ধ ঈমান-আক্বীদার প্রশ্নে কোনভাবেই সন্তোষজনক বলা না গেলেও এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ধর্ম এখানকার জনজীবনে একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। ধর্মপালনে শিথিলতা থাকলেও মানুষের মধ্যে ধর্মানুভূতি যথেষ্ট তীব্র। ফলে দীর্ঘদিন যাবৎ এ দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় সুকৌশলে ধর্মহীনতা প্রসারের ব্যাপক চেষ্টা পরিলক্ষিত হ'লেও প্রকাশ্যভাবে ধর্মদ্রোহিতা বা নাস্তিকতার কোন স্থান কখনই হয়নি। তাই যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক না কেন, জনগণকে পক্ষে টানার জন্য অন্ততঃ ভোটের সময় হ'লেও ধর্মের গুণগান করতে দেখা যায়। যে কারণে দাউদ হায়দার, আহমাদ শরীফ, তাসলীমা নাসরীন, হুমায়ুন আজাদের মত গুটিকয় ধর্মবিদ্বেষী নাস্তিক যারা সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিল, বাংলাদেশের গণমানুষের হৃদয়ের গভীরে তাদের তো কোন আশ্রয় হয়ইনি; বরং তাদের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত হয়েছে প্রবল

ক্ষোভ ও ঘৃণাবোধ। এমনকি তাদের অনেককেই শেষ পর্যন্ত দেশ ছাড়তে বাধ্য হ'তে হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে ইন্টারনেটের প্রসার ঘটার পর থেকে জনসাধারণের নাগালের বাইরে বাংলা ব্লগস্ফিয়ার জুড়ে যে এক শ্রেণীর নাস্তিক চক্র গড়ে ওঠে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে সেখানে যে উদ্বেগজনক ও কুৎসিত অপপ্রচার শুরু করে, তা পূর্ববর্তী নাস্তিকদের সকল অপতৎরতাকে বহুগুণে ছাড়িয়ে গেলেও তাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ কোন প্রতিরোধ গড়ে উঠেনি। এর কারণ হ'ল এদের অবস্থান সমাজে নয় বরং ইন্টারনেটের ভার্চুয়াল জগতে। প্রকৃতপক্ষে ইন্টারনেটে বাংলা ব্লগস্ফিয়ার সম্পর্কে যাদের ধারণা নেই, তারা কল্পনাও করতে পারবে না যে, বাংলাদেশে এত বিরাট সংখ্যক নাস্তিক ঘাপটি মেরে আছে। অনেককেই বলতে শুনেছি ব্লগে না আসলে বাংলাদেশে যে এত নাস্তিক আছে, তা হয়ত জানতেই পারতাম না।

বাংলাভাষায় সামাজিক ব্লগ হিসাবে ২০০৫ সালে সর্বপ্রথম 'সামহয়্যার ইন ব্লগ'-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। ইন্টারনেটের প্রসার লাভ করার সাথে সাথে ব্লগিং-এর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকলে একে একে সৃষ্টি হয় নাগরিক ব্লগ, আমার ব্লগ, প্রথম আলো ব্লগ, সোনার বাংলা ব্লগের মত জনপ্রিয় ব্লগগুলো। কখনো লেখালেখির অভ্যাস ছিল না, এমন বহু তরুণের লেখার হাতেখড়ি হয়েছে ব্লগের মাধ্যমে। যদিও ইদানীং ফেসবুক-টুইটারের দাপটে ব্লগসাইটের জনপ্রিয়তা কমে এসেছে। ব্লগগুলোর জনপ্রিয়তার মূল কারণ ছিল, স্বাধীনভাবে যে কোন বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করা এবং অন্যের কাছে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি পৌঁছে দেয়ার অনন্য সুযোগ পাওয়া। নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ব্লগের এই অভূতপূর্ব স্বাধীনতার কোন জুড়ি নেই। ফলে সরকারী বিধি-নিষেধের আওতার বাইরে অবাধ ও স্বাধীন মত প্রকাশের এই উন্মুক্ত অঙ্গনটি ধর্মবিদ্বেষী নাস্তিকদের জন্য মহাসুযোগ হয়ে ওঠে। যেহেতু এ দেশে সামাজিকভাবে ধর্মবিরোধী নাস্তিকদের কোন ঠাঁই নেই, তাই এই নিরাপদ (!) স্থানে এসে তারা কখনও স্বনামে কিংবা অধিকাংশই বেনামে মনের সুখে নাস্তিকতার প্রচার ও ধর্মবিদ্বেষ ছড়ানোর মওকা পেয়ে যায়। অন্যদিকে 'উদারমনা' নাস্তিক্যবাদী বিভিন্ন ব্লগ মডারেটররাও 'মুক্তচিন্তা' প্রকাশের নামে এদেরকে সাদরে ঠাঁই দিতে থাকে। এভাবেই ব্লগ হয়ে ওঠে নাস্তিকদের জন্য উন্মুক্ত ও নিরাপদ অভয়ারণ্য। স্বঘোষিত নাস্তিক ব্লগ 'মুক্তমনা'র মডারেটর তা স্বীকার করে বলেছে, 'গত কয়েক বছরে স্বচ্ছ চিন্তা-চেতনা সম্পন্ন মুক্তমনা যুক্তিবাদীদের বিশাল উত্থান ঘটেছে বিভিন্ন ফোরামে এবং আলোচনাচক্রে, যা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যমে সম্ভব ছিল না মোটেই'।

ইন্টারনেটে বিচরণশীল নাস্তিকরা মূলতঃ ৩ ভাগে বিভক্ত।- (১) যারা ঘটনাক্রমে কিংবা পরিবেশগত কারণে ধর্মবিরোধী হয়ে উঠেছে এবং ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে নেতিবাচক সমালোচনায় লিপ্ত হয়ে থাকে। তবে সাধারণতঃ কিছুটা সংযত ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের সুশীলতা প্রমাণে সচেষ্ট থাকে। এই শ্রেণীর ভদ্রবেশী নাস্তিকের সংখ্যা অবশ্য খুব নগণ্যই।

(২) যারা প্রবল ধর্মবিদ্বেষী। এরা এমনই উগ্র যে, যে কোন সুযোগে অত্যন্ত অশ্লীল ও ক্লেদাক্ত ভাষায় ধর্মকে আক্রমণ করে। কুরআনের আয়াতসমূহ, রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যক্তিজীবন ও ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাবলী নিয়ে মিথ্যা ও কুরুচিপূর্ণ অপবাদ আরোপ করা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করাই তাদের প্রধান কাজ। তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল জঘন্য ও অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করা। তাদের চিন্তাধারা ও গালাগালির রূপ-প্রকৃতি এতটাই নিম্নরুচির যে তাদেরকে সাধারণভাবে মনুষ্যশ্রেণীভুক্ত ভাবতেই কষ্ট হয়। ব্লগে এই প্রকার ইতর শ্রেণীর নাস্তিকের সংখ্যাই সর্বাধিক।

(৩) যারা সরাসরি ধর্মের বিরুদ্ধে লেখালেখি করে না, নিজেদের নাস্তিকও বলে না। তবে ধর্মবিরোধী আলোচনায় নাস্তিকদের প্রতি তারা সহানুভূতিশীল। তারা সংশয়বাদী, অজ্ঞেয়বাদী, যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী, সুশীল, উদারমনা ইত্যাদির ছদ্মাবরণে প্রকারান্তরে নাস্তিক্যবাদের সেবাদাস হিসাবেই কাজ করে। দেশে এই শ্রেণীর নাস্তিকের সংখ্যাও প্রচুর।

তবে মজার ব্যাপার এই যে, নীতিগতভাবে সর্বধর্মবিরোধী হ'লেও কার্যক্ষেত্রে এসব নাস্তিকদের একমাত্র টার্গেট হ'ল ইসলাম। ইসলামই তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তু। শোনা যায়, নাস্তিকদের অনেকেই নাকি মূলতঃ হিন্দু। যারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য মুসলিম নাম ব্যবহার করে এবং ইসলামকে হেয় করার চেষ্টা করে। এদের নিজস্ব কিছু ব্লগও রয়েছে। যেমন মুক্তমনা, আমার ব্লগ, ধর্মকারী, নবযুগ প্রভৃতি। যেখান থেকে তারা এমনই উগ্রভাবে ধর্মবিদ্বেষের বিষবাষ্প ছড়ায়, নোংরামী আর ঘৃণ্য মনোবৃত্তির এমন দুর্গন্ধময় প্রদর্শনী করে, যা কোন সভ্য সমাজে অকল্পনীয়। বরং চাক্ষুষ না দেখলে তা বিশ্বাসই করা যায় না। ইসলামের বিভিন্ন বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে টিটকারীর মাধ্যমে যে জঘন্যতম বমন উদ্রেককারী বিকৃতরুচির লেখা তারা সেখানে স্থান দিয়েছে, তা জনস্বার্থে প্রকাশ করতে চাইলেও কোনমতেই বিবেকে সায় দিচ্ছে না। রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনচরিত নিয়ে সেখানে এত অশ্লীল কার্টুনচিত্র আর জঘন্য কোলাজ উপস্থাপন করা হয়েছে, যা কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে স্বচক্ষে দেখা সম্ভব নয়।

নরকের কীট, সাক্ষাৎ শয়তান এই কুলাংগাররা কিভাবে এ দেশের মাটিতে বসে এমন কন্টেন্ট প্রকাশ করার দুঃসাহস পেল, তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে।

ইন্টারনেটে তথাকথিত প্রগতিশীল ও মানবতাবাদী নাস্তিকদের এই নোংরা ও কদর্য অপপ্রচার যে বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। তারা চায় এ দেশকে পুরোপুরি ধর্মহীন সেক্যুলার রাষ্ট্রে পরিণত করতে। আর এই ধর্মহীনতার মধ্যেই তারা খুঁজতে চায় বাঙালীর নবজাগরণ (?)। বাংলাদেশে ইসলামবিদ্বেষী লেখালেখির সুতিকাগার খ্যাত 'মুক্তমনা'র পরিচিতিতে লেখা হয়েছে-'মুক্তমনা'র মাধ্যমে আমরা একদল উদ্যমী স্বাপ্নিক দীর্ঘদিনের একটি অসমাপ্ত সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে পরিচালনা করছি। যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন আক্ষরিক অর্থেই হয়ে উঠছে 'চেতনামুক্তি'র লড়াই। যার মাধ্যমে জনচেতনাকে পার্থিব সমাজমুখী (অর্থাৎ ধর্মহীন) করে তোলা সম্ভব....আজ ইন্টারনেটের কল্যাণে বিশ্বাস (ধর্ম) এবং যুক্তির সরাসরি সংঘাতের ভিত্তিতে যে সামাজিক আন্দোলন বিভিন্ন ফোরামগুলোতে ধীরে ধীরে দানা বাঁধছে, মুক্তমনারা মনে করে তা প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ-চার্বাকদের লড়াইয়ের মত বিশ্বাস ও যুক্তির দ্বন্দ্বেরই একটি বর্ধিত, অগ্রসর ও প্রায়োগিক রূপ। এ এক অভিনব সাংস্কৃতিক আন্দোলন, যেন বাঙালীর এক নবজাগরণ'।

বর্তমানে বহুগুণ শক্তিশালী, অবাধ ও স্বাধীন মুক্তমঞ্চ হিসাবে গড়ে উঠেছে ফেসবুক, টুইটারের মত সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমসমূহ। যেখানে প্রতিদিন বহু ইসলামীবিদ্বেষী বাংলা পেজ খোলা হচ্ছে। সেসব পেজে সমানে ছড়ানো হচ্ছে হিংসা ও ঘৃণার বিষাক্ত মন্ত্র। পবিত্র কুরআনের আয়াতের অনুকরণে ব্যাঙ্গাত্মক প্যারোডি রচনা, রাসূল (ছাঃ)-কে গালিগালাজের সেসব দৃশ্য সামান্যতম ঈমানও অবশিষ্ট রয়েছে এমন ব্যক্তির হৃদয়েও রক্তক্ষরণ না ঘটিয়ে পারবে না।

শাহবাগ আন্দোলনে এই নাস্তিক ব্লগার গোষ্ঠীই প্রথম রাস্তায় নেমেছিল। 'যুদ্ধাপরাধের বিচার' ছিল তাদের সাইনবোর্ড। কিন্তু অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল ব্লগের ক্ষুদ্র মঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসে সমাজের বৃহত্তর অঙ্গনে নিজেদের একটা অবস্থান তৈরী করার চেষ্টা এবং পরম কাঙ্খিত সেই নাস্তিক্যবাদী সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বীজ বপন করা। যার মাধ্যমে এ দেশের গণমানুষের মন ও মনন থেকে ধর্ম নামক অনুষঙ্গটির শেষ শিকড়টিও তারা উপড়ে ফেলতে চেয়েছিল। 'একাত্তরের চেতনা'র মুলো ঝুলিয়ে এবং ইসলাম ও মুক্তিযুদ্ধকে মুখোমুখি দাঁড়

করিয়ে তারা মীমাংসা করে ফেলতে চেয়েছিল এ দেশের জাতীয় চেতনা ও সংস্কৃতিতে ইসলাম নামক এই 'আরবীয় ধর্মে'র (?) আর কোন স্থান থাকবে কি-না সেই প্রশ্নটিরও।

তবে আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে তাদের সে স্বপ্ন পূরণ হয়নি। বাংলাদেশের তরুণ সমাজ আবারও ঘুরে দাঁড়িয়েছে। নাস্তিকতার বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান যেভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাতে আগামী দিনে নাস্তিকতার দৌরাত্ম প্রকাশ্যভাবে যে কমে আসবে, সেটা খুবই প্রত্যাশিত ইনশাআল্লাহ। বর্তমানে এদের সীমাহীন দৌরাত্ম্য মূলতঃ ইন্টারনেট অঙ্গনেই সীমাবদ্ধ। এর বাইরে সমাজে প্রকাশ্যে নাস্তিকতার চর্চা করার মত সুযোগ যে এদের নেই, তা শাহবাগ আন্দোলনের ব্যর্থতা থেকেই তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। যদিও শিক্ষিত উঠতি বয়সের তরুণ সমাজের হাতে ইন্টারনেট এখন অনেক সহজলভ্য। ফলে তারাই সর্বপ্রথম এই নাস্তিকদের অপপ্রচার ও মগজধোলাইয়ের শিকার হচ্ছে। সাম্প্রতিক অতীতে তরুণদের মস্তিষ্ক বিকৃত করার জন্য আরজ আলী মাতুব্বর, আহমাদ শরীফ, হুমায়ূন আজাদদের অনুসারীদের সংখ্যা এ দেশে নিতান্তই কম ছিল না। তথাকথিত বিজ্ঞানমনস্ক ও মানবতাবাদী কবি-সাহিত্যিকরা এবং সেক্যুলার মিডিয়াগুলো এতদিন আড়ালে-আবডালে সংগোপনে সুকৌশলে নাস্তিকতা প্রচার করে আসছিল অসাম্প্রদায়িকতা, প্রগতিশীলতা ও মানবাধিকার প্রভৃতি সুরক্ষার জন্য কুম্ভিরাশ্রু বর্ষণ করে। কিন্তু বর্তমানের এই জঙ্গী সাইবার নাস্তিকরা তাদের চেয়ে বহুগুণে ভয়ংকর। যে দেশে দাউদ হায়দার, তাসলীমা নাসরীনদের ঠাঁই হয় না, সেই দেশে তাদের চেয়ে হাজার গুণ বর্বর এই উগ্র নাস্তিক গোষ্ঠী কিভাবে বহাল তবিয়তে টিকে থাকে, তা আমাদের বোধগম্য নয়।

উল্লেখ্য যে, ২০১১ সালে আমেরিকার 'সেন্টার ফর আমেরিকান প্রগ্রেস' আমেরিকায় ইসলামোফোবিয়া কিভাবে ছড়ানো হচ্ছে তার উপর ৬ মাস ব্যাপী তদন্ত চালায়। অতঃপর The Roots of the Islamophobia Network in America শিরোনামে ১৩০ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি গবেষণা রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্ট মতে, আমেরিকার ৭টি সংস্থা গত ১০ বছরে ৪২ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানোর কাজে। যার একটি বড় অংশ ব্যয় করা হয় ইন্টারনেটে ইসলামবিদ্বেষী ম্যাটেরিয়াল সমৃদ্ধ করা এবং বিভিন্ন ফোরাম ও ব্লগের মাধ্যমে হিংসা ছড়ানোর কাজে। সুতরাং এ দেশের যুবসমাজকে ধ্বংস করার জন্য এই নাস্তিক চক্রকে বিশেষ কোন মহল পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে কি-না, তা অনতিবিলম্বে খতিয়ে দেখা যরূরী।

ইতিপূর্বে বাংলাদেশ সরকার 'সাইবার ক্রাইম' বিষয়ক আইন করলেও সেখানে ধর্মবিদ্বেষ ছড়ানোর বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট আইন আছে কি-না, বা থাকলেও তা কতটুকু কার্যকর, তা বোঝার উপায় নেই। দেশ ও জাতির সুরক্ষায় এই চিহ্নিত নাস্তিক গোষ্ঠীর অপপ্রচার দমনে ভূমিকা গ্রহণ করা সরকারের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

যাইহোক তরুণ সমাজকে বলব, ইসলামবিদ্বেষী মহল দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে এবং রাষ্ট্র ও সমাজকে ধর্মহীন করার জন্য সুকৌশলে দিবা-রাত্রি পরিশ্রম করে যাচ্ছে। এতদিন তারা আমাদেরকে সাংস্কৃতিক দেউলিয়াত্বের দিকে ঠেলে দেয়ার ষড়যন্ত্র চালিয়েছে। আজ তারা আর রাখ-ঢাক না করে সরাসরি মুসলিম জাতির মূল চেতনাকেন্দ্র পবিত্র কুরআন ও রাসূল (ছাঃ)-কে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে। সুতরাং আর অপেক্ষার সময় নেই। এদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য যেমন গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে, ঠিক তেমনি এদের হাত থেকে সমাজকে বাঁচানোর জন্য এবং নিজেদের আমল-আক্বীদা পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ইসলাম সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জনের কোন বিকল্প নেই। ব্লগ ও ফেসবুকে অপপ্রচারের খপ্পরে পড়ে অথবা কৌতুহলবশত আরজ আলী মাতুব্বর কিংবা হালআমলের নাস্তিককুল শিরোমণি ক্রিস্টোফার হিচেন্স, রিচার্ড ডকিন্সদের বই-পত্র নাড়া-চাড়া করতে গিয়ে শিক্ষার্থী তরুণরা যেন বিভ্রান্তির শিকার না হয়, সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সেই সাথে নাস্তিক্যবাদী ও মুখোশধারী কবি-সাহিত্যিকদের নষ্ট সাহিত্য অধ্যয়ন থেকে বিরত থাকতে হবে। আর অভিভাবকদেরও দায়িত্ব হবে কোনরূপ শিথিলতা না দেখিয়ে তাদের সন্তানদের শৈশব থেকেই ইসলামী চেতনায় সমুন্নত করা। যেন জীবনের উষালগ্নে তারা কোনরূপ বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত না হয়। আল্লাহ আমাদেরকে এই নাস্তিকদের ষড়যন্ত্রকে রুখে দেওয়ার তাওফীক দান করুন এবং এদের কুটচাল থেকে এ দেশের মুসলিম সমাজকে হেফাযত করুন- আমীন!

আত্মপীড়িত তারুণ্য ও জঙ্গীবাদ

চেতনার উন্মেষকাল যে বয়সে শুরু হয়, জীবন ও জগতের নানারূপ আলো-অন্ধকার যখন চিত্তমানসের সূক্ষ্ম রাজপথে গমনাগমন শুরু করে, সে বয়সটিই হল কৈশোর-যৌবনের সম্মিলনকাল। জীবনের মোড় অনেকটাই নির্ধারিত হয়ে যায় এই ধাপটিতে এসে। দিক নির্ধারণী এই পর্যায়টিতে পরিবার ও সমাজ মিলে যে পরিপার্শ্ব, তার ভূমিকাই থাকে প্রায় শতভাগ। কখনও সেই ভূমিকা হয় ইতিবাচক, কখনওবা নেতিবাচক। আজকে যে তরুণদেরকে আমরা বিপথগামী আখ্যা দিচ্ছি, সক্রোধে জঙ্গী বলে ক্ষোভ ঝাড়ছি, তারা কিন্তু এই সমাজে আর দশজনের মতই পিতা-মাতার অপার স্নেহে, পরম মমতায় বেড়ে ওঠা সন্তান। তাদের হিংস্রতা, জঙ্গী মনস্তত্ত্ব একদিনে গড়ে উঠেনি। চলমান সমাজ, রাষ্ট্র কিংবা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বহুলাংশে এর প্রভাবক হিসাবে কাজ করেছে।

মানুষ কখন চরমপন্থী হয়ে ওঠে, তা নিয়ে মনোবিজ্ঞানীরা হাযারও বিশ্লেষণ করেছেন। তবে বিশ্লেষণ ছাড়াই এটুকু বুঝা যায় যে, মানুষ যখন নিজেকে অধিকার বঞ্চিত ভাবে, সমাজকে নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী মনে করতে থাকে এবং তার প্রতিকারের কোন উপায় তার জানা না থাকে, তখনই এর প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নেয় বিচার-বুদ্ধিহীন মরিয়া পদক্ষেপ, যাকে আমরা চরমপন্থা বলছি।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, বিচারহীনতার যে সংস্কৃতি আমরা আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করছি; যে অত্যাচার, নির্যাতন, সহিংসতা, মিথ্যাচার, প্রতারণা, দ্বিচারিতা, অমানবিকতা, অযৌক্তিকতায় ভরা পৃথিবী আমাদের মুক্ত বিবেকের দুয়ারে প্রতি মুহূর্তে প্রবলভাবে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে, তা বিশেষতঃ আবেগী তরুণপ্রাণের পক্ষে সামাল দেয়া কঠিনই। তার বিদ্রোহী মন সর্বদা এসব থেকে পরিত্রাণের পথ খোঁজে। সমাধানের উপায় তালাশ করে। তার চিত্তমানস জুড়ে আকুলি-বিকুলি করতে থাকে হাযারো ভাবনা, পরিকল্পনা। জীবনের এই সংশয়াচ্ছন্ন বয়সটিতে যারা সঠিক শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা

পেয়েছে, সঠিক মানুষদের সংস্পর্শ পেয়েছে, তারা এক সময় সমাধানের পথটি ঠিক ঠিক খুঁজে নেয়। কিন্তু যারা এই সৌভাগ্যের অধিকারী হয়নি, বরং কোন পথভ্রষ্ট ও স্বার্থবাদী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর খপ্পরে পড়েছে, তারা সমাধানের শুদ্ধ পন্থার পরিবর্তে সমাজবিধ্বংসী এবং আত্মবিনাশী রাস্তাকেই সমাধানের পথ ভেবে বসে। আগ-পিছ চিন্তা না করে সমাজের প্রতি নিদারুণ দায়বোধশূন্য এক রঙিন ইউটোপিয়া তার অরক্ষিত হৃদয়জগতে খেলা করতে থাকে। যা কেবল মুদ্রার একপিঠই দেখে, অপর পিঠ দেখে না। জীবনের একরৈখিক সীমানাই চেনে, বহুমুখিতার দুয়ার খুলে দেখে না। কল্পিত শত্রুর প্রতি কেবল জিঘাংসার ক্রোধাগ্নিই লালন করে, সর্বাঙ্গীন মানবমুক্তির পথ সন্ধান করে না। জঙ্গীবাদ ও চরমপন্থায় আক্রান্ত ব্যক্তি তাই যে কোন সমাজের জন্য সর্বগ্রাসী আত্মবিনাশের পথ উন্মুক্ত করে।

২০১৬ সালে গুলশানের হলি আর্টিজান হামলার পর লাভের লাভ এই হয়েছে যে, দেশের কথিত বুদ্ধিজীবীদের চোখ কিছুটা হলেও খুলেছে। হিস্টিরিয়া রোগীর মত যারা কথায় কথায় মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা এবং নিরীহ মাদরাসা ছাত্রদেরকে জঙ্গীবাদের মূল নিয়ামক হিসাবে দেখিয়ে এসেছেন বছরের পর বছর, তারা এখন নতুন করে ভাবতে বসেছেন যে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, সমাজের বিত্তশালী অংশের সন্তানরা কেন সুন্দর জীবনের মায়া ছেড়ে এই পথ বেছে নিল? এখন তারা মায়া দেখাচ্ছেন, আত্মসমালোচনা করছেন। কিন্তু শেষ বেলায় সমাধানের পথ খুঁজতে এসে আবার সেই বালখিল্যতার পরিচয় দিচ্ছেন। আগে তারা রব তুলতেন জঙ্গীবাদ দমন করতে হলে মাদরাসা শিক্ষা বন্ধ করতে হবে, আর এখন রব তুলছেন যে জঙ্গীবাদ দূর করতে তরুণদের রবীন্দ্র সংগীত শেখাতে হবে, নাচ-গানের সংস্কৃতি চর্চায় যুক্ত করতে হবে! হায়রে বুদ্ধিবাদী মূর্খতা!

আসলে এসব বুদ্ধিজীবীরা কখনই আত্মপীড়িত মুসলিম তরুণদের মনের আগুনকে অনুধাবনের চেষ্টা করেননি। ফলে তা নেভানোর গরজও তারা বোধ করেননি। তাইতো তথাকথিত 'মুক্তমনা'রা যখন মুক্ত-স্বাধীনভাবে অনলাইন জুড়ে বিশ্রী ভাষায় ইসলাম ও ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে গালিগালাজ করছিল, তখন তারা বাকস্বাধীনতার নামে তাদের সপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। দেশের পত্র-পত্রিকাগুলো যখন ইসলামী দল ও প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে একাধারে মিথ্যাচার চালিয়ে এসেছে, জঙ্গী অপবাদ দিয়েছে, তখন

যাচাই-বাছাই না করেই তাদের বিরুদ্ধে মারকাটারি রব তুলেছেন। অন্যদিকে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে যখন ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার হীন কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে, তখন তারা নিশ্চুপ। 'পীস টিভি'র মত নখদন্তহীন নিরেট শান্তিবাদী গণমাধ্যমকে মিথ্যা অভিযোগে বন্ধ করা হলেও তারা তাদের বহুল চর্চিত বাক স্বাধীনতা হরণের অভিযোগ তোলেন না। বৈশ্বিক নিষ্ঠুর অপরাজনীতির করাল গ্রাসে দেশে দেশে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর যখন মর্মন্তুদ নির্যাতন পরিচালিত হচ্ছে, লক্ষ-লক্ষ নিরপরাধ মানুষ ও নারী-শিশুর রক্তের স্রোতে আল্লাহ্‌র যমীন লালে লাল হয়ে যাচ্ছে, তখন তারা অতি সযত্নে সেসব প্রসঙ্গ থেকে দূরে থেকে নিজেদের মুখে কুলুপ এঁটে রাখেন। সত্যের বিরুদ্ধে তাদের এই নগ্ন অবস্থান আর মিথ্যার পক্ষে নীরব গুণগান স্বভাবতই চিরসবুজ তারুণ্যের একটা অংশকে বিক্ষুব্ধ করবে। সুতরাং এক শ্রেণীর মুসলিম তরুণের হৃদয়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বেলে দিয়ে তাদেরকে বিপথে ঠেলে দিতে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের দায় কোন মতেই এড়ানোর সুযোগ নেই।

ইদানিং তারা বড় গলায় আলেমদের পরামর্শ দিতে চান। আমরা বলব, আলেমদেরকে পরামর্শ দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তারা তাদের দায়িত্ব ঠিকমতই পালন করেছেন ও করে যাচ্ছেন। দেশে এমন কোন ইসলামী সংগঠন নেই, এমন কোন মসজিদ-মাদরাসা নেই, যেটি জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করে না। সামান্য ইসলামী জ্ঞানও যার আছে, তার পক্ষে কখনই ধর্মের নামে নিরীহ মানুষ হত্যার এই পথ বেছে নেয়ার সুযোগ নেই। আমরা নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি, জঙ্গীবাদের প্রসারে ধর্ম বা কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের চুল পরিমাণ ভূমিকা নেই, যদিও সাধারণতঃ ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা দিয়েই এদের মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টি করা হয়।

সুতরাং জঙ্গীবাদের মূলোৎপাটনে এবং এই সকল পথভ্রষ্ট তরুণদেরকে সুপথে ফিরিয়ে আনতে সরকার ও দেশের জ্ঞানী সমাজকে অবশ্যই সমস্যার মূলে যেতে হবে। সকল প্রকার দায়িত্বহীন আচরণ ও হঠকারী পদক্ষেপ থেকে ফিরে আসতে হবে। দেশে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার ফিরিয়ে আনতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী শিক্ষাকে যথাযথ মর্যাদায় স্থান দিতে হবে। ইসলামের সঠিক শিক্ষা সমাজে উন্মুক্তভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। তরুণদের কথা শুনতে হবে। তাদেরকে সমাধানের পথ দেখাতে হবে। যদি তাদের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়, তাদেরকে নিরাপত্তাহীন করে তোলা হয়, তাদেরকে গুরুত্ব না

দিয়ে কোণঠাসা করে রাখা হয়, মুসলিম হিসাবে আত্মপরিচয়ের সংকটে ফেলে দেয়া হয়, ইসলামবিদ্বেষ অব্যাহতভাবে ছড়ানো হয়, তবে তাদের একটা অংশ জঙ্গীবাদ ও চরমপন্থাতেই সমাধান খোঁজার চেষ্টা করবে। আর তাদের আবেগকে ব্যবহার করবে সুযোগসন্ধানী মহল।

তারুণ্যের ধর্মই দ্রোহ। এই দ্রোহের মন্ত্রে একবার ভুলভাবে দীক্ষিত হলে ন্যায়-অন্যায়ের বিবেচনাবোধ, হিতাহিত জ্ঞান আর অবশিষ্ট থাকে না। তখন যত উপদেশবাণীই শোনানো হোক না কেন, তারা তোয়াক্কা করে না। ধর্ম-অধর্ম মানে না। নিজের জন্য, সমাজের জন্য যে কোন বিধ্বংসী কাজেও পিছপা হয় না। সুতরাং এই দ্রোহের কারণগুলো যত দ্রুত চিহ্নিত করা যাবে এবং তা সমাধানের আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে, ততই জঙ্গীবাদ নামের এই বিষবৃক্ষ উৎপাটনের পথ উন্মুক্ত হবে। এর ব্যত্যয় ঘটলে জঙ্গী ভূতের এই বাড়বাড়ন্ত অবস্থা আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রকে কোথায় যে নিয়ে যাবে, তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদের শিখণ্ডীদের মঞ্চস্থ বিশ্ব ইতিহাসের জঘন্যতম মানবহত্যার উৎসবকেন্দ্র আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশের করুণ পরিণতি আমাদের সেই হুঁশিয়ারী সংকেতই দেয়। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন। আমীন!

আল্লাহ বলেন,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ
فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا،

‘যে কেউ জীবনের বদলে জীবন অথবা জনপদে অনর্থ সৃষ্টি করা ব্যতীত কাউকে হত্যা করে, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করে। আর যে ব্যক্তি কারু জীবন রক্ষা করে, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করে’।

-মায়েদাহ ৫/৩২।

ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা

গত ১৮ই নভেম্বর'২০ ফরিদপুরের সালথা উপযেলার কামদিয়া গ্রামে অবস্থিত একটি আহলেহাদীছ মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশের উপস্থিতিতে বর্বরভাবে ভেঙ্গে-চুরে তছনছ করা হয়। ভারতের বাবরী মসজিদ ধ্বংসকারীদের মত হিন্দু সম্প্রদায়ের কেউ নয়, বরং তারা ছিল উলামা পরিষদ ও তাওহীদী জনতার ব্যানারে কয়েকশ' কওমী মাদ্রাসার ছাত্র ও সাধারণ মুসলিম জনতা। সন্ত্রাসী কায়দায় লুট করে নেয়া হয় মাদ্রাসা ও মসজিদের যাবতীয় আসবাবপত্র। শিক্ষার্থীদের লেপ-তোষক পর্যন্ত লুট করা হয়েছে। এমনকি শিক্ষার্থীদের ব্যবহৃত পবিত্র কুরআনকে পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন করেছে হামলাকারীরা। পরিশেষে মাদ্রাসার ধ্বংসস্তূপে তারা ব্যানার টাঙিয়ে দেয় সদম্ভ হুমকিবার্তা- 'আহলে হাদীসের আস্তানা সালথা থানায় থাকবে না'। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই নিকৃষ্ট ঘটনার ভিডিও ফুটেজ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ায় বিবিসিসহ শীর্ষস্থানীয় মিডিয়াগুলিতে ঘটনাটি বিশ্বব্যাপী প্রচার পায়।

বিষয়টি এখানেই থেমে থাকেনি। এর মাত্র দু'সপ্তাহের ব্যবধানে একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটতে যাচ্ছিল সুনামগঞ্জে। শহরের একমাত্র আহলেহাদীছ মসজিদটি উচ্ছেদের লক্ষ্যে ১লা ডিসেম্বর'২০ তথাকথিত একদল 'তৌহিদী জনতা' চেষ্টা করেছিল জমায়েত হওয়ার। তবে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনার মুখে প্রশাসন সজাগ হয় এবং তাদেরকে নিবৃত্ত করে। মাত্র বছরখানেক পূর্বে ২০১৯ সালের ১১ই জুলাই ভোলা সদরের একটি আহলেহাদীছ মসজিদকে ভাঙচুর করে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। যার জ্বলন্ত ছবি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ে। সেসময়ও সারা দেশব্যাপী ঘটনাটি আলোচিত হয়েছিল। ২০১৮ সালের মে মাসে সিলেট শহরের আত-তাকওয়া মসজিদকে ভেঙে সুরমা নদীতে ভাসিয়ে দেয়ার জন্য প্রকাশ্য জনসভায় হুমকি দেয় সিলেট শহরের শীর্ষস্থানীয় আলেম সমাজ এবং সরকার ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। সাম্প্রতিক সময়ে চট্টগ্রাম, বরিশাল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রভৃতি স্থানে আহলেহাদীছ মসজিদ ধ্বংসের জন্য বারবার পাঁয়তারা করেছে 'তৌহিদী জনতা'র ব্যানারে স্থানীয় হানাফী, কওমী কিংবা পীরপূজারী গোষ্ঠী।

বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফী সমাজ কর্তৃক আহলেহাদীছ মসজিদ ভাঙচুর ও পুড়িয়ে দেয়া বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। বরং এধরনের ঘটনা বিগত দিনেও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অহরহ ঘটেছে। বিশেষতঃ আহলেহাদীছ অধ্যুষিত এলাকার বাইরে নতুন কোন আহলেহাদীছ মসজিদ নির্মাণ করাকে মন্দির বা অন্য কোন ধর্মের উপসনালয় স্থাপনের চেয়েও নিকৃষ্ট কাজ মনে করা হয়। ভাঙচুর ও হামলার ঘটনা তো মাঝে-মধ্যে মিডিয়াতে আসে। এর বাইরেও সন্ত্রাসী হুমকি ও গালি-গালাজের মুখে কত যে মসজিদের অস্তিত্ব হুমকির মধ্যে পড়েছে তার কোন পরিসংখ্যান নেই। প্রতিনিয়ত নিরাপত্তাহীনতার মধ্য দিয়ে কাটাতে হয় এসব মসজিদের মুছল্লীদের। অনেক মসজিদে ভয়ে যোহর ও আছরের ছালাতের আযান পর্যন্ত মাইকে দেয়া হয় না। প্রশাসনের নাকের ডগায় এসব ঘটনা ঘটলেও তারা নির্বিকার। কেননা তারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থের বাইরে যেতে চায় না।

আহলেহাদীছদের সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফী সমাজের মাযহাবী পার্থক্য নতুন কোন বিষয় নয়। হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী আহলুল হাদীছ এবং নির্দিষ্ট একজন ইমামের অনুসারী বা আহলুর রায়পন্থীদের মধ্যে পার্থক্য যুগ যুগ ধরে সুপরিচিত বিষয়। অথচ দুঃখজনক ব্যাপার হ'ল বাংলাদেশে আহলেহাদীছদের সাথে সহাবস্থান তো দূরে থাক, তাদেরকে 'মুসলিম' হিসাবেই স্বীকৃতি দিতে চান না হানাফী আলেমদের অনেকে। বরং 'আহলেহাদীছ' শব্দের প্রতি তাদের রয়েছে প্রচণ্ড রকম স্পর্শকাতরতা। এত বিদ্বেষ ও আক্রোশ তারা এই পরিভাষার জন্য কেন বরাদ্দ রেখেছেন, তা গবেষণার বিষয়। জানি না তারা এই শব্দের মধ্যে তাদের আদর্শিক পরাজয়ের বার্তা খুঁজে পান কি-না। নতুবা কেন ফরিদপুরের আহলেহাদীছ মসজিদ ভাঙার প্রতিবাদ করতে গিয়েও উদারমনা হানাফীরা পর্যন্ত আহলেহাদীছ বিশেষণের প্রতি তাদের সুপ্ত এ্যালার্জি লুকিয়ে রাখতে পারেন না? কেন তারা বিভক্তির হাযারো আক্বীদা ও মানহাজগত কারণকে গৌণ রেখে বিশেষভাবে 'আহলেহাদীছ' নামকেই 'বিভেদ সৃষ্টিকারী' মনে করেন?

আমরা বিস্ময় বোধ করি যে, আহলেহাদীছদের শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে বক্তব্য তাদের কাছে উস্কানীমূলক মনে হয়। অথচ কিছু দিন পর পর যখন বিভিন্ন এলাকায় আহলেহাদীছ বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে অত্যন্ত আপত্তিকর ও কুরুচিপূর্ণ ভাষায় আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার

করা হয়, তখন তারা কেন নীরব থাকেন? শুধু তাই নয় বিভিন্ন কওমী মাদ্রাসায় আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে বিশেষ বিভাগ পর্যন্ত খুলে কোমলমতি ছাত্রদেরকে বিদ্বেষের কলুষ শেখানো হচ্ছে। দিন দিন যত বেশী আহলেহাদীছ আন্দোলনের সংস্কার কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে, ততই তাদের অনুদারতার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর তাদের এই অসহিষ্ণুতা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ কখনও মসজিদ ভাঙচুর পর্যন্ত গড়াচ্ছে!

আমরা আরও অবাক হই যখন তারা তথাকথিত উদারতা দেখিয়ে বলেন যে, মসজিদ আল্লাহ্র ঘর। অতএব আহলেহাদীছ মসজিদ বলা ঠিক নয়। আবার কেউ বলেন, ইসলামের ইতিহাসে ফিক্বহের ভিত্তিতে নাকি কখনো মসজিদ ভিন্ন করা হয়নি। অথচ ইতিহাস জাজ্বল্যভাবে সাক্ষী যে, ৮০১ থেকে ১৩৪৩ হি. পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৫৪২ বছর যাবৎ মুসলমানদের কেন্দ্রস্থল কা'বা গৃহের চারপাশে চার মাযহাবের মুছল্লীদের জন্য চারটি পৃথক মুছাল্লা ছিল!

কারা করেছিল এটা? এখনো কি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হানাফী বা শাফেঈ নামাংকিত মসজিদ নেই? আমরা কথিত উদারতার বার্তাবাহকদের কাছে জানতে চাই, তারা কি কখনও এই উদারতা দেখিয়ে কোন হানাফীদের পরিচালিত মসজিদে এক ওয়াক্তের জন্যও কোন আহলেহাদীছকে ইমামতির সুযোগ দিবেন? কিংবা বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে বছরে মাত্র একটি জুম'আয় কোন আহলেহাদীছ আলেমকে খুৎবা দেয়ার প্রস্তাবকে স্বাগত জানাবেন? নিশ্চয়ই না। তবে কেন আপনারা উদারতার ভনিতা করে সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের চেষ্টা করেন? বরং বাস্তবতা হ'ল এই যে, বহু হানাফী মসজিদে আহলেহাদীছদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে কিংবা তাদেরকে ছালাত আদায় করতে দেখলে হরহামেশা কটূক্তি করা হয়। কিন্তু কোন আহলেহাদীছ মসজিদে ভিন্ন কোন মাযহাবের অনুসারীদের ছালাত আদায়ে বাধা দেয়া হয়েছে বা কটূক্তি করা হয়েছে, এমন একটি প্রমাণও কি তারা দেখাতে পারবেন? সুতরাং এইসব বিভ্রান্তিকর, অবাস্তব উদারতার চর্চা বন্ধ করুন এবং দ্বিমুখী মুনাফিকী নীতি পরিহার করুন।

পরিশেষ বলব, আমরা চাই এদেশে যুগ যুগ ধরে চলে আসা আহলেহাদীছ-হানাফী পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও সহাবস্থানের পরিবেশ অক্ষুণ্ন থাকুক। দ্বীনী ও সামাজিক সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হোক। আলোচনার মাধ্যমে পরস্পরের বিভেদের দরজাগুলো ধীরে ধীরে বন্ধ হোক।

আমরা বিশ্বাস করি, যদি সত্যিকার অর্থেই আমরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনার সর্বসম্মত নীতির উপর ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারি এবং রাসূল (ছাঃ) নির্দেশিত 'মা আনা 'আলাইহে ওয়া আছহাবী' (রাসূল ছা. ও তাঁর ছাহাবীগণের আদর্শ অনুসরণ)-এর মূলনীতি সুরক্ষায় নিজেদের জান-মাল উৎসর্গ করতে পারি, তবে খুব সহজেই আমরা ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার গাঢ় অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে পারব। আমাদের ঐকান্তিক কামনা এটাই যে, একদিন দেশের সকল হানাফী ও আহলেহাদীছ মসজিদ থেকে একযোগে তাওহীদ ও সুন্নাতের পক্ষে আওয়াজ উঠবে এবং শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে উঠবে। সেটা সম্ভব হ'লে মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে প্রকৃত ঐক্য ফিরে আসতে আর কোন বাধা থাকবে না ইনশাআল্লাহ। আহলেহাদীছ আন্দোলনের সংস্কার প্রচেষ্টার মূল বার্তা এটাই। সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফী সমাজ কি হকের এই আওয়াজ শুনতে পান? যদি শুনতে না পান, তাহ'লে অন্ততপক্ষে যারা শুনতে পেয়েছেন, তাদের প্রতি ইহসান করুন। সহনশীলতার চর্চা করুন। বৈরিতা ও উস্কানীমূলক কার্যক্রম পরিহার করুন। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেদায়াতের পথে অটুট রাখুন এবং যাবতীয় যুলুম-নির্যাতন থেকে হকপন্থীদের রক্ষা করুন-আমীন!

আল্লাহ বলেন,

তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সুন্দর পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ভালভাবেই জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি ভালভাবেই জানেন কে সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে।

-নাহল ১৬/১২৫।

ইসলামী বিচারব্যবস্থার যৌক্তিকতা

ইসলামী বিচারব্যবস্থায় শাস্তির কঠোরতা প্রসঙ্গে 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকায় ছদ্মনামে একটি সংক্ষিপ্ত লেখা লিখেছিলাম। বিষয়টি ছিল ইভটিজিং-এর প্রতিবাদ করায় নাটোরের কলেজ শিক্ষক মিজানুর রহমানের হত্যাকারী দুর্বৃত্ত রাজনের কী ধরনের শাস্তি হওয়া দরকার এ নিয়ে শীর্ষস্থানীয় জনপ্রিয় এক বাংলা সামাজিক সাইটের সদস্যদের করা কিছু মন্তব্য নিয়ে। যার নমুনা ছিল এমন– 'না মরা পর্যন্ত গণধোলাই'...'সবার সামনে গুলি করে মারা কিংবা একবারে শিরচ্ছেদ'...'ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি করে মারা উচিৎ এবং সেটি সকল টেলিভিশনে বাধ্যতামূলক লাইভ টেলিকাস্ট করা হোক। আমি প্রশাসনে থাকলে সেটাই করতাম'....'জনসম্মুখে ফাঁসি চাই। তার আগে মুক্ত গণধোলাই'....'মিজানকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে সেভাবে হত্যা করা হোক'...'ডগ স্কোয়াডে দিতে হবে এবং কামড় খাওয়াতে হবে না মরা পর্যন্ত'... 'যতদ্রুত সম্ভব মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার করতে হবে'... 'ট্রাকের পিছনে দড়ি বেঁধে সারাদেশে ঘুরাতে হবে যাতে তার বীভৎস চেহারা দেখে কেউ এমন কাজ করার আর চিন্তাও না করে। আমার ক্ষমতা থাকলে আল্লাহ্‌র কসম আমি তাই করতাম ঐ ঘৃণ্য নরপশুদের'...'প্রকাশ্য জনসম্মুখে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা উচিৎ যাতে ভবিষ্যতে আর কোন নরপশুর জন্ম না হয়'...। আরো যেসব মন্তব্য করা হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশযোগ্য নয়।

উপরোক্ত মন্তব্যগুলো পড়লে স্পষ্টতঃই বোঝা যায় ঐ মর্মান্তিক ঘটনা মানুষের মনে কিরূপ তীব্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল। ফলে এমন কোন উচ্চতম শাস্তির কথা অবশিষ্ট নেই যা মন্তব্যদাতারা উল্লেখ করতে কসুর করেছেন। অথচ তাদের কেউই কিন্তু নিহত মিজানের আত্মীয় বা পাড়া-প্রতিবেশী নন। নিতান্তই অপরিচিত এসব লোকজন দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসব মন্তব্য করেছেন। একবার চিন্তা করুন, যে পরিস্থিতিতে একজন অনাত্মীয়-অপরিচিত ব্যক্তির অন্তরে নিহত ব্যক্তির জন্য এতটা প্রতিক্রিয়া জন্ম নেয় সেখানে নিহত ব্যক্তির যারা একান্ত পরিবার-পরিজন তাদের মানসিক অবস্থা কেমন হতে

পারে? কত তীব্র হতে পারে তাদের প্রতিক্রিয়া? অবশ্যই অবশ্যই বহুগুণ বেশি। নিশ্চয়ই তারা কামনা করবেন তাদের কল্পনায় ভাসা সর্বোচ্চ শাস্তিটাই।

উপরোক্ত ঘটনায় আরো লক্ষ্যণীয় যে, মন্তব্যদাতারা প্রত্যেকেই শিক্ষিত ও আধুনিক সুশীল সমাজের মানবতাবাদী প্রতিনিধি হিসাবে গর্ববোধ করেন এবং তাদের অধিকাংশেরই দাবী, হত্যাকারীর শাস্তি জনসম্মুখে প্রকাশ্যে কার্যকর করা হোক যাতে ভবিষ্যতে এমন কাজ করার কেউ চিন্তাও না করে। এক্ষণে এই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবীর পিছনে এতগুলো লোকের যে স্বতঃস্ফূর্ত এবং কঠোরতম অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে তা কি কেবল অবাস্তব, অস্বাভাবিক কিংবা আবেগীয় বলে উড়িয়ে দেয়া যায়?

প্রিয় পাঠক, উপরোক্ত প্রেক্ষাপট থেকেই চিন্তা করুন ইসলামী বিচারব্যবস্থার যৌক্তিকতা। সুস্পষ্টতঃই এটা প্রতিভাত হবে যে, মানবপ্রবৃত্তির যে স্বাভাবিক দাবী তার মাঝেই ইসলামী বিচারব্যবস্থার আপাত কঠোর শাস্তি নীতির প্রাসঙ্গিকতা নিহিত। প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার চরম উন্নতির যুগে তুমুল উৎসাহের সাথে হরহামেশাই প্রচারিত হচ্ছে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা কি রকম বর্বর তার প্রকাশ্য কিংবা আকার-ইঙ্গিতের বিবরণ। যারা কিছুটা সংযমী তারাও আল্লাহ্‌র আইনকে কেবল মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থার জন্য উপযোগী ছিল বলে পাণ্ডিত্যপূর্ণ মন্তব্য করে নিজেদেরকে আধুনিক জাহির করেন। অথচ কেতাদুরস্ত বিতর্কের বাইরে বাস্তবতায় এসে উপরোক্ত ঘটনায় এই তাদেরই স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহের ভাষা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কৃত্রিমতার খোলস ঠেলে ক্ষণিকের জন্য হলেও তারা বাস্তবতার আলোয় একাকার হয়েছেন। একই সাথে ইসলামের কঠোর বিচারব্যবস্থার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকেও অবচেতনভাবে উচ্চকিত করেছেন।

প্রসঙ্গটি নুতনভাবে উঠে আসে ৮ই অক্টোবর'১২ সউদী আরবে ৮ জন বাংলাদেশী নাগরিকের শিরচ্ছেদ নিয়ে। যে ঘটনাটি বাংলাদেশী মিডিয়া ও সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি বহুল আলোচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দুঃখের বিষয় হল, এই শিরচ্ছেদকে কেন্দ্র করে ইসলামী আইন কেমন বর্বর, তা নিয়ে ক'দিন মাঠ সরগরম করেছিল বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ আন্তর্জাতিক কয়েকটি মানবাধিকার সংস্থা এবং তাদের ধ্বজাধারীরা। আর সাথে সাথে ঝড় উঠেছিল বাংলাদেশী প্রিন্ট মিডিয়াসহ বিকল্প মিডিয়া হয়ে উঠা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতেও। তাছাড়া

সঊদী আরবে কোন ঘটনা ঘটলেই তার সাথে ইসলামকে মিশিয়ে বিশ্ব মিডিয়ার শোরগোল তোলা একটা নিয়মিত অভ্যাস। এই মায়াকান্না যে তারই অংশ তা বলাই বাহুল্য। এসব শঠ মানবতাবাদীর কাছে ভিকটিমের চাইতে অপরাধীর অধিকার অনেক বেশী মূল্যবান। সমাজকে অপরাধমুক্ত করার চাইতে অপরাধ এবং অপরাধীকে প্রতিরক্ষা দেয়াই যেন তাদের কাজ হয়ে দাঁড়ায়। যাইহোক এই শিরচ্ছেদের ঘটনায় তাদের তোলা কিছু প্রশ্ন ও তার প্রেক্ষিতে ইসলামী বিচারব্যবস্থার যৌক্তিকতা ও সৌন্দর্য তুলে ধরা হ'ল।

(১) মানবাধিকার সংস্থাগুলোর প্রথম দাবী ছিল, এই শাস্তিপ্রাপ্ত বাংলাদেশীদের সাজা মওকুফের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে সঊদী সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা উচিৎ ছিল। তাদের এই দাবী যে কতটা অযৌক্তিক তা তাদের দাবীতেই সুস্পষ্ট। তারা কি আইনের শাসনে বিশ্বাস করে না? অপরাধীকে শাস্তিদানের নীতিতে মানে না? তবে কেন চাপ সৃষ্টি করতে হবে? ঐ দণ্ডপ্রাপ্তরা কি নিরপরাধ ছিল? তারা তো অপরাধ করেই ধরা পড়েছে এবং প্রচলিত আইনেই তাদের বিচার হয়েছে। দীর্ঘ আইনী প্রক্রিয়ার পর তারা দণ্ডপ্রাপ্তও হয়েছে। জেনে বুঝে যারা অপরাধ করেছে এবং শাস্তির যোগ্য হয়েছে তাদের সাজার বিপক্ষে কথা বলা বা সাজা মওকুফের দাবী তুলতে হবে কেন? আপনার পিতা বা সন্তান এমনভাবে নিহত হলে আপনার দরদ এভাবে উথলে উঠত? আপনি কি চিন্তা করেছেন, অপরাধীর প্রতি আপনার এই 'দরদ' নিহতের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের অধিকারের প্রতি কিভাবে অবজ্ঞা প্রদর্শন করল? এই তো কিছুদিন পূর্বে যখন প্রেসিডেন্ট যিল্লুর রহমান লক্ষ্মীপুরের বিএনপি নেতা নূরুল ইসলামের হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিলেন, তখন নিহত নূরুল ইসলামের স্ত্রীর কথা কি মনে পড়ে? তিনি বলেছিলেন, 'প্রেসিডেন্ট কি পারবেন তাঁর স্ত্রী আইভীর খুনীদের ক্ষমা করতে?' একই প্রশ্ন যদি আপনাকেও করা হয়, আপনার উত্তর কি হবে? নাকি দোষীরা ইসলামী আইনে শাস্তি পেয়েছে– এটাই আপনাদের মেকি দরদের মূল উৎস? এটাই আপনাদের অন্তর্জ্বালা?

মানবাধিকার সংস্থাগুলো বড়জোর দাবী করতে পারত যে, বিচারিক প্রক্রিয়া সঠিকভাবে অনুসৃত হয়েছে কিনা তা যাচাই করা। কিন্তু তা না করে অপরাধীদের সাজা মওকুফের যে হাস্যকর দাবী তারা তুলেছে, এতে কি তারা নিজেরাই মানবাধিকার লংঘন করছে না? দেশের বিচারালয়গুলোতে দুর্বল, দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থাপনার কারণে যখন শত শত খুনী অবলীলায় বেরিয়ে যেয়ে আবার অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে, যখন নিহতের পরিবারের আহাজারিতে গ্রাম-

গঞ্জের আকাশ বাতাস মাতম করছে, তখন তাদের কানে ঠুলি পড়ে থাকে। যখন দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী হায়েনাদের আগ্রাসনে লক্ষ-কোটি মানুষ নির্বিচারে মরছে, তখন তাদের ন্যায়ের কণ্ঠ থাকে নিশ্চুপ। আর কয়েকজন সংঘবদ্ধ দুর্বৃত্ত যখন অপরাধ করে শাস্তি পায় তখন শুরু হয় তাদের মায়াকান্না? ধিক, তাদের মানবতাবোধ! ধিক তাদের বিবেক! মাযলূমের কাছে, মানবতার কাছে এভাবেই তারা বারাংবার নিজেদেরকে চরম মুনাফিক হিসাবে প্রমাণ করেছে।

(২) তারা প্রশ্ন তুলেছে, শিরচ্ছেদের মত অমানবিক প্রথা আধুনিক সমাজে কিভাবে বৈধতা পায়? এর উত্তরে বলতে হয়, একজন মানুষকে যে পদ্ধতিতেই হত্যা করা হোক না কেন, যে কোন বিবেচনায় তা 'অমানবিক'ই বটে। তা ফাঁসির মাধ্যমেই হোক, ডার্ক রুমে ইঞ্জেকশন পুশ করেই হোক আর প্রকাশ্যে শিরচ্ছেদের মাধ্যমেই হোক। কিন্তু সমাজের শান্তি-শৃংখলা রক্ষার্থে এই 'অমানবিকতা' আমাদেরকে স্বীকার করে নিতেই হয়। এমনকি বলা যায় যে, মানবতাকে রক্ষার জন্য এই 'অমানবিকতা'র কোন বিকল্প নেই। তাই অনাদিকাল থেকেই মানবসমাজে মৃত্যুদণ্ডের বিধান প্রচলিত রয়েছে এবং থাকবে। এক্ষণে অপরাধীর জন্য এতটুকুই করণীয় যে, যত কম কষ্ট দিয়ে সম্ভব তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা। মৃত্যুদণ্ডের আর যেকোন প্রক্রিয়ার চেয়ে শিরচ্ছেদ ভয়ংকর হ'লেও মোটেই অধিক যন্ত্রণাদায়ক নয়, বরং কম। কেননা এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, মানুষের নার্ভ সিস্টেম চালিত হয় ব্রেন থেকে। মস্তিষ্কে কোন অনুভূতি না পৌঁছানো পর্যন্ত সেই অনুভূতিটা মানুষ অনুভব করে না। সেই কারণে মস্তিষ্কই সবকিছুর মূল। যখন মানুষ কোন আঘাত পায় সেটার অনুভূতিটা মস্তিষ্কে বহন করে নিয়ে যায় নার্ভ সিস্টেম। আর সকল নার্ভ সিস্টেম মানুষের ঘাড়ের স্পাইনাল কর্ডের ভিতর দিয়ে মস্তিষ্কে চলে গিয়েছে। এখন যদি কারো ঘাড়ের স্পাইনাল কর্ডে নার্ভ সিস্টেম কাটা পড়ে, তখন মস্তিষ্ক পর্যন্ত সেই আঘাতের অনুভূতি পৌঁছতে পারে না বা মানুষ সেই অনুভূতি বুঝতে পারে না। সেই কারণে যদি কাউকে শিরচ্ছেদ করা হয় তখন তার কোন অনুভূতি মস্তিষ্কে যেতে পারে না। ফলে উক্ত ব্যক্তি কোন কিছুই অনুভব করতে পারে না। সুতরাং শিরচ্ছেদ দৃশ্যতঃ যত কঠিনই মনে হোক না কেন, এটা কোন যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর উদাহরণ নয়।

(৩) তারা বলে, 'জনসম্মুখে প্রকাশ্যভাবে শাস্তি কার্যকর করা মধ্যযুগীয় বর্বরতা। এ লোমহর্ষক এই দৃশ্য মানুষের মনে নেগেটিভ অবসেশন ও স্নায়ুবিক

বৈকল্যের সৃষ্টি করে।' এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য কেবল ইসলামী আইনের বিরোধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা যে 'সভ্য' সমাজ এই ধরনের যুক্তি দেয় সেই সমাজেই সভ্যতার নামে স্নায়ুবিক বৈকল্য সৃষ্টির জন্য হাযারো উপকরণ বিদ্যমান। মুভি-সিনেমা থেকে শুরু করে ছোট্ট দুধের শিশুর জন্য তৈরী গেমসেও পর্যন্ত সেখানে প্রতিনিয়ত ভায়োলেন্স শেখানো হয়, আর মানুষ হত্যার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। হরর সিনেমা ও উপন্যাসের নামে কোমলমতি শিশুদের আধিভৌতিক কল্পনার জগতে বিচরণ করানো হচ্ছে, যার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া নিয়ে মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা প্রতিদিনই লেখালেখি করছেন। অথচ মানবাধিকারকর্মীদের নযর কেবল ইসলামী বিধানের প্রতি। মূলতঃ ইসলামী আইনে শাস্তি প্রদানের অর্থ কেবল অপরাধীর অপরাধের শাস্তি কার্যকর করা নয়। বরং সমাজকে অপরাধ থেকে বিরত রাখাই এর উদ্দেশ্য। এজন্য অপরাধীকে সকলের অগোচরে শাস্তি না দিয়ে প্রকাশ্যে শাস্তি দেয়া হয়। যেন এর মাধ্যমে জনমনে অপরাধের ভয়ংকর পরিণতির দৃষ্টান্তমূলক চিত্র অংকিত হয়ে যায়। রাষ্ট্র কর্তৃক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও মজলুমের অধিকার প্রতিষ্ঠার এ দৃশ্য যখন মানুষ স্বচক্ষে দেখবে তখন তাদের মধ্যকার অপরাধপ্রবণতা স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পাবে। সমাজে নৈতিক শিক্ষার সাথে যদি এই শাস্তির ভীতি যোগ না করা হয় তবে অপরাধ কখনই দূর করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে গোপনে শাস্তি মূলতঃ অপরাধকে এবং অপরাধীকে সামাজিকভাবে আড়াল করারই শামিল; যা আর যাই হোক সমাজ থেকে অপরাধ দূরীকরণে স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে না, যেমনটি পারে প্রকাশ্য শাস্তি। সুতরাং এই আইনকে বর্বরতা আখ্যা দিয়ে যারা সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থকে জলাঞ্জলী দেওয়ার আহ্বান জানায় তারা নিজেরাই যে প্রকৃতপক্ষে মানবাধিকার লংঘনকারী, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

(৪) ১ জনের বদলে ৮ জনের মৃত্যুদণ্ড–এ কেমন বিধান? এ ধরণের স্থূল প্রশ্নও তুলেছে একদল মানবাধিকার কর্মী। এমনকি বিবিসিতেও তা প্রচারিত হয়েছে। মনে হচ্ছে সঊদী আরবে আইন-কানুন বলে কিছু নেই, শুধু ধরে ধরে মানুষ হত্যাই তাদের কাজ। এতে ইসলামী আইনের প্রতি তাদের বিদ্বেষের মাত্রা কোথায় পৌঁছেছে, তা অনুমান করা যায়। নতুবা বিষয়টিকে একক অপরাধে ৮ জনের সমভাবে যুক্ত থাকার উপর বিচার না করে ১ জনের মৃত্যু= ৮ জনের শাস্তি -এর মত সরল সমীকরণ মিলানোর বালখিল্যতায় তারা নামত না। একজনের হত্যাকাণ্ডে ৮ জন ব্যক্তির সম্পৃক্ত থাকা কি অসম্ভব? যদি

সম্পৃক্ত থাকে তাহলে সেই মোতাবেক ৮ জন কেন ৮০০ জনও যদি এই অপরাধে সম্পৃক্ত হয় তবুও তাদের প্রত্যেককে অপরাধের তারতম্য অনুযায়ী শাস্তি প্রদানই কি ন্যায়বিচারের দাবী নয়? এতে সংশয়ের কী আছে তা আমাদের বোধগম্য নয়।

এবারে আসুন দেখা যাক ইসলামী আইনে ক্বিছাছের মূল তাৎপর্য সম্পর্কে কুরআনে কী বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে ক্বিছাছ গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অতঃপর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। হে বুদ্ধিমানগণ! ক্বিছাছের মধ্যে তোমাদের জন্যে জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার *(সূরা বাক্বারাহ ১৭৮-১৭৯)*।

পবিত্র কুরআনের ক্বিছাছ সংক্রান্ত আয়াতটি পড়লেই বুঝা যায় কুরআনের এই আইনটি কতটা মানবতাপূর্ণ এবং সামাজিক মানুষের অবস্থার সাথে কতটা সংগতিশীল। মানবাধিকারের দিকটি বিবেচনা করলে আয়াতে দু'টি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়–

১. এই আয়াত নিহত ব্যক্তির অধিকার পুরোপুরিভাবে সংরক্ষণ করেছে। মাযলুম ব্যক্তিটির পরিবার যদি হত্যাকারীকে ক্ষমা না করে তবে পৃথিবীর কোন শক্তির যেমন ক্ষমতা নেই যে হত্যাকারীকে রক্ষা করবে, তেমনি যদি নিহতের পরিবার হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয় তবুও রাষ্ট্রের সেখানে কিছুই বলার নেই।

২. এখানে হত্যাকারীর অধিকারও সংরক্ষিত হয়েছে। সে যদি নিজের ভুল বুঝতে পারে অথবা কোন কারণে অন্যায় বিচারের শিকার হয় তবে নিহতের পরিবারের কাছে তার মাফ চেয়ে নেয়ার অধিকার পুরোপুরি সংরক্ষিত রয়েছে। যদি সে নিহতের পরিবারকে যুক্তিসংগত কারণ দেখিয়ে রক্তপণ দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে পারে তবে তাতেও রাষ্ট্রের আপত্তি থাকে না।

পৃথিবী আর কোন আইনে বা বিচার-ব্যবস্থায় একইসাথে এভাবে হত্যাকারী ও নিহত উভয়ের অধিকার পূর্ণ সংরক্ষণের কোন বাস্তব নযীর কি কেউ দেখাতে পারবে?

আয়াতের শেষে আল্লাহ এই আইন প্রয়োগের যৌক্তিকতা দেখিয়ে চমৎকারভাবে বলেছেন, 'হে বুদ্ধিমানগণ! ক্বিছাছের মধ্যে তোমাদের জন্যে রয়েছে জীবন, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।' কি অসাধারণ কথা! একটি ক্বিছাছ বাস্তবায়ন তথা ১ জন হত্যাকারীর জীবন গ্রহণের মাধ্যমে সমাজের আর ১০টা অপরাধীর অপরাধপ্রবণতাকে সহজাত প্রক্রিয়ায় নিষ্ক্রিয় করে দেয়া হয়। ফলে তা যেন আর ১০ জন ব্যক্তির জীবনকে অবচেতনভাবেই রক্ষা করে। এ জন্য সভা-সেমিনার, মিছিল-মিটিং, পুলিশ-র‍্যাব কোনকিছুরই প্রয়োজন হয় না। মানুষ নিজ থেকেই সমাজকে রক্ষার কাজে নিয়োজিত হয়ে যায়। এখানেই তো আল্লাহর বিধানের সৌন্দর্য ও যৌক্তিকতা।

সঊদী আরব যে এত সমালোচলা ও পশ্চিমা চাপের মধ্যেও ইসলামী বিচারব্যবস্থাকে ধরে রেখেছে এজন্য তারা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। একারণে সঊদী আরবের আইন-শৃংখলা অন্যান্য বহু দেশের তুলনায় যে অনেক গুণ উন্নত– একথা নিতান্ত জ্ঞানপাপীও অস্বীকার করবে না। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাজনৈতিক হানাহানিতে খুন, নারী নির্যাতন, এ্যাসিড নিক্ষেপ, ইভটিজিং- ইত্যাকার সামাজিক অপরাধের যেসব কাহিনী প্রতিদিন আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকাজুড়ে ভরা থাকে, তা সঊদী আরবে কেউ কল্পনাও করতে পারে না। ফলে সে দেশে কারাবন্দীর সংখ্যা আমেরিকার চেয়ে ৭০ গুণ কম, যার মধ্যে আবার অর্ধেকের বেশীই বিদেশী।

পরিশেষে বলা যায়, বৃটিশ আইন দ্বারা পরিচালিত বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা আর ইসলামী আইনে পরিচালিত সঊদী বিচারব্যবস্থার মধ্যে যদি তুলনা করা হয়, তবে আকাশ-পাতাল তফাৎটা বোঝার জন্য কোন পরিসংখ্যানের প্রয়োজন হবে না। এ দেশের বৃটিশ প্রবর্তিত বিচারব্যবস্থা যে ন্যায় প্রতিষ্ঠার চেয়ে অপরাধীদের রক্ষক হিসাবেই অধিক ব্যবহৃত হচ্ছে, তা একেবারে ওপেন সিক্রেট। বাংলাদেশের সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা আকবর আলী খান বিচারব্যবস্থার এই নাজুক বাস্তবতা উল্লেখ করতে যেয়ে আক্ষেপ করে বলেন যে, 'বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা একটি জুয়ার আড্ডায় পরিণত হয়েছে'। এ দেশের বিচারব্যবস্থার এই নোংরা হাল-হাকীকত উপলব্ধির পরও যাদের কণ্ঠস্বর নীরব থাকে, তাদের মুখে সঊদী বিচারব্যবস্থাকে মধ্যযুগীয় বর্বরতা আখ্যা দিয়ে বাগাড়ম্বর করা নিতান্তই হাস্যকর শোনায়। বরং চূড়ান্ত সত্য কথা হ'ল, প্রকৃতঅর্থে আইনের শাসন চাইলে এবং বৈষম্যহীন, সুস্থ ও সুশৃংখল

সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইলে, ইসলামী আইন ও বিচারব্যবস্থাই হ'ল একমাত্র সমাধান।

কেননা ইসলামী শাসনব্যবস্থাই হ'ল প্রকৃত মানবিক শাসনব্যবস্থা। ইসলামী আইনই হ'ল প্রকৃত আইন। এ বিধান স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই মানবজাতির জন্য প্রেরণ করেছেন। এ বিধান মানুষের জন্য যে সকল নীতিমালা আবশ্যকীয় করে দিয়েছে তা সকলের জন্য সমানভাবে কল্যাণকর ও তাদের স্বাভাবিক চাহিদার অনুকূল। এ ব্যবস্থা সর্বকালের, সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্য এবং মানব সমাজের শৃংখলাবিধানে সর্বাধিক উপযোগী বিধান। আপাতঃদৃষ্টিতে তা যত কঠোরই মনে হোক না কেন, তার অভ্যন্তরে মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক দাবী এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির যে সুসমন্বয় ঘটেছে তার কোন বিকল্প দৃষ্টান্ত নেই। তাই সমাজে প্রকৃতঅর্থে শান্তি ফিরিয়ে আনতে চাইলে এবং রাষ্ট্র পরিচালনাযন্ত্র ন্যায়বিচারপূর্ণ কাঠামোয় উত্তীর্ণ করতে চাইলে এই বিচারব্যবস্থাকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। কেবল সামাজিক নিরাপত্তার স্বার্থেই নয়; বরং মুসলিম হিসাবে ঈমান রক্ষার স্বার্থেও আমাদেরকে এ বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন। আমীন!

আল্লাহ বলেন,

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ

يٰٓأُولِى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

হে জ্ঞানীগণ! হত্যার বদলে হত্যার মধ্যে তোমাদের জীবন নিহিত রয়েছে, যাতে তোমরা সতর্ক হও।

-বাক্বারাহ ২/১৭৯।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা

২০১৫ সালের ৭ই জানুয়ারী ফ্রান্সের বিদ্রুপ ম্যাগাজিন 'শার্লি এবদো'র কার্যালয়ে শরীফ কৌচি এবং সাঈদ কৌচি ভ্রাতৃদ্বয়ের সশস্ত্র হামলা এবং তাতে পত্রিকাটির সম্পাদকসহ ১২ জন ব্যক্তি নিহত হওয়ার ঘটনায় সারাবিশ্ব উত্তাল হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্যবিশ্বের জনগণ ও মিডিয়া ঘটনাটিকে দেখেছিল তথাকথিত 'মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে হামলা' হিসাবে। একই সাথে চিরাচরিত 'ইসলাম বিদ্বেষী জুজু' উস্কে দিতে ব্যবহার করে নতুন অস্ত্র হিসাবে। এই জুজুর কারণে ফ্রান্সের অর্ধশতাধিক স্থানে মসজিদে এবং সাধারণ মুসলমানদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো হয়। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে ২০০৬, ২০০৯ এবং ২০১২ সালেও এই পত্রিকাটি অত্যন্ত উস্কানীমূলকভাবে রাসূল (ছা.)-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করেছিল।

প্রথমেই পরিষ্কার করে নেয়া ভালো যে, শার্লি এবদো'র কার্টুনিস্টরা ইসলামের দৃষ্টিতে হত্যাযোগ্য অপরাধী হ'লেও যে প্রক্রিয়ায় তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে তা ইসলাম সমর্থন করে না। কেননা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে ইসলামের সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। এখানে নিজের ইচ্ছামত কোন কিছু করার সুযোগ নেই। ইসলামী শাসনব্যবস্থায় একজন ব্যক্তি যত বড় অপরাধীই হোক না কেন, তাকে শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব ব্যক্তি বিশেষের উপর বর্তায় না, সে দায়িত্ব রাষ্ট্র তথা আইনগত প্রতিষ্ঠানের। এটি সর্বজনস্বীকৃত বিষয়। কেননা অপরাধী চিহ্নিত করা এবং তার অপরাধের পরিমাপ ও শাস্তি নির্ধারণ করা এগুলোর জন্য একটি নিরপেক্ষ ও সুনির্দিষ্ট আইনী সংস্থার প্রয়োজন। কোন একক ব্যক্তির মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালন কখনই সম্ভব নয়। সেকারণ সে দায়ভার তাকে দেয়াও হয়নি। এতদসত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি সীমা অতিক্রম করে নিজেই শাস্তি দেয়ার উদ্যোগ নেয়, সেক্ষেত্রে সে-ই অপরাধী হবে। সুতরাং শার্লি এবদো'র কুখ্যাত কার্টুনিস্টরা যত বড় অপরাধীই হোক না কেন তাদের বিচারের ভার নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়ে হত্যাকারী ভাতৃদ্বয় সীমালংঘন করেছে এবং আইনকে নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে। যা ইসলাম মোটেও সমর্থন করে না। সুতরাং তারা যেটা করেছে, তা নিঃসন্দেহে অগ্রহণযোগ্য। নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কেরাম কেউই এমন কাজকে সমর্থন দেননি।

এবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। 'শার্লি এবদো' নামক এই কুরুচিপূর্ণ ম্যাগাজিনই কেবল নয়, ইতিপূর্বে ডেনমার্কসহ বেশ কয়েকটি দেশের পত্র-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষতঃ নাইন-ইলেভেনের পর থেকে ইসলামবিদ্বেষী প্রচারণার অংশ হিসাবে এই জঘন্য অপতৎপরতা চালাচ্ছে কিছু মিডিয়া। আর তাতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মদদ যুগিয়ে যাচ্ছে সমগ্র পশ্চিমা বিশ্ব। এই নির্লজ্জ মদদদানের পেছনে তাদের দাবী হচ্ছে, 'ইউরোপীয় সভ্যতা'র মহা অর্জন হল 'ফ্রীডম অফ এক্সপ্রেশন', 'ফ্রীডম অফ স্পীচ' তথা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং বাকস্বাধীনতা। এটি ইউরোপীয় সমাজের এমন এক প্রশ্নাতীত অধিকার ও প্রাচীন ঐতিহ্য; যা কোনমতেই খর্ব করার উপায় নেই। সুতরাং এই অধিকারের সূত্র অনুযায়ী যদি কোন পত্রিকা ইসলামের নবীর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করে, তবে তাতে বাধা দেয়া যাবে না। উল্টো মুসলমানদেরই নাকি উচিৎ পরমতসহিষ্ণু হওয়া এবং এই অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো!

'শার্লি এবদো'য় হামলার ৪ দিন পর ১১ই জানুয়ারী এই 'বাকস্বাধীনতা'র প্রতি সমর্থন জানাতেই ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে জড় হয়েছিল বিশ্বের প্রায় ৫০টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা তাদের প্রতিনিধিসহ ১০ লক্ষেরও বেশী মানুষ। তাদের সবার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছিল একটি শ্লোগান-'জ্য সুই শার্লি' অর্থাৎ 'আমরাই শার্লি (অর্থাৎ আমরা 'শার্লি এবদো'র মতপ্রকাশের অধিকারের ব্যাপারে একমত')। হাস্যকর ব্যাপার হ'ল, এই র‍্যালিতে যোগ দিয়েছিল ফিলিস্তীনীদের তাজা রক্তে রঞ্জিত ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুসহ সারাবিশ্বে মানবাধিকার লংঘনে শীর্ষস্থানীয় ক'টি দেশ। তাছাড়া স্বয়ং ফ্রান্সের হাতই তো রঞ্জিত হয়ে রয়েছে আফ্রিকার কয়েকটি দেশের লাখো মানুষের রক্তে। মাত্র কিছুদিন আগে তাদের নেতৃত্বেই সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ও অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে লিবিয়ার মত স্বচ্ছল ও স্বনির্ভর একটি দেশ। মানুষের প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকারকে নিয়েই যারা ছেলেখেলা করে দিনরাত, তারাই কিনা সুবোধ বালকের মত এসেছে মানুষের তথাকথিত মতপ্রকাশের অধিকার নিয়ে আওয়ায তুলতে! কি অদ্ভূত এক বিশ্বে বাস করি আমরা!

লন্ডন থেকে প্রকাশিত হাফিংটন পোস্টের রাজনৈতিক ভাষ্যকার মেহেদী হাসান তাঁর আর্টিকেলে পাশ্চাত্যের এই 'বাকস্বাধীনতা' তত্ত্বের শঠতা তুলে ধরে তথাকথিত উদারপন্থীদের নিকটে খুব শক্ত কিছু প্রশ্ন রেখেছিলেন। তিনি জোর গলায় বলেন, এই বাকস্বাধীনতার দাবী নিয়ে বাগাড়ম্বরের পিছনে উদ্দেশ্য আর

কিছুই নয়, শুধুমাত্র এটা প্রমাণ করা যে, পাশ্চাত্য হ'ল আলোকপ্রাপ্ত ও উদারপন্থী। আর মুসলমানরা হ'ল পশ্চাদপন্থী ও বর্বর। এজন্য সাবেক ফরাসী প্রধানমন্ত্রী নিকোলাস সারকোজি ঘটনার পরপরই বলেন, 'এটা সভ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা'। উদার-বামপন্থী ফরাসী নেতা জন স্নো আরো একধাপ বাড়িয়ে একে আখ্যায়িত করেন 'সভ্যতার সংঘাত' হিসাবে!

প্রশ্ন হ'ল, বাকস্বাধীনতা কি কখনও সীমাহীন বা নিয়ন্ত্রণহীন হ'তে পারে? অথবা যে অর্থে পশ্চিমারা সেটাকে ব্যবহার করছে, তা কি তারা নিজেরাই বিশ্বাস করে? মেহেদী হাসান চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন যে, বাকস্বাধীনতা নিয়ে কেমন ডাহা মিথ্যাচার এবং দ্বিচারিতায় লিপ্ত এই বাকস্বাধীনতার ফেরিওয়ালারা। তিনি প্রশ্ন রাখেন, যারা আজ রাসূল (ছা.)-এর ব্যঙ্গচিত্র আঁকছে, তারা কি ইহুদীদের হলোকস্টকে ব্যঙ্গ করে চিত্র আঁকতে পারবে? তারা কি ৯/১১-এর দিন টুইন টাওয়ারে নিহত ভিকটিমদের নিয়ে ক্যারিকেচার (বিদ্রূপাত্মক কার্টুন) আঁকতে পারবে? কিংবা আঁকতে পারবে ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন ধর্মকে কটাক্ষ করে? তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, কল্পনা করুন! একজন ব্যক্তি প্যারিসের ১১ই জানুয়ারী'র র‍্যালিতে যোগ দিয়েছে। তার বুকের ব্যাজে লেখা 'জ্য সুই শরীফ' (অর্থাৎ শার্লি এবদো'য় হামলাকারী শরীফ কৌচা)। আর তার হাতে বহন করছে নিহত সাংবাদিকদের ব্যঙ্গচিত্র। এমতাবস্থায় সমবেত জনতা লোকটির উপর কী আচরণ করবে? তারা কি এই একলা চলা লোকটাকে বাকস্বাধীনতার উপর অটল একজন 'হিরো' হিসাবে আখ্যায়িত করবে? নাকি এর বিপরীতে গভীরভাবে আহত বোধ করবে? বাস্তবতা কি এটাই নয় যে, লোকটি যদি প্রাণ নিয়ে পালাতে পারে সেটাই হবে বিস্ময়কর?

যাবতীয় তত্ত্বকথার বাইরে সাদাচোখে যদি এই হিসাবটা মিলাতে যাই, তবে তাদের বাকস্বাধীনতার দাবী কোনমতেই কি ধোপে টিকতে পারে? পোপ ফ্রান্সিস সেদিকে দিকনির্দেশ করে বলেন, 'যদি আমার মায়ের নামে কেউ কোন খারাপ কথা উচ্চারণ করে, তাহ'লে একটা ঘুষি অবশ্যই তার প্রাপ্য। সেটাই স্বাভাবিক নয় কী!' এমনকি যে কার্টুনিস্ট এই জঘন্য কাজে হাত দিয়েছে, তার পিতামাতার নামেও যদি কেউ গালি দেয় সে কি পাল্টা প্রতিক্রিয়া না জানিয়ে চুপ করে বসে থাকবে? একজন রক্ত-মাংসের সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হ'লে সেটা কখনই সম্ভব নয়। সুতরাং সীমাহীন ও অনিয়ন্ত্রিত বাকস্বাধীনতা কখনই সভ্যতার অংশ নয়; বরং অসভ্যতা।

একজন মুসলিমের কাছে রাসূল (ছা.)-এর প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসার স্থানটি পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে পবিত্র। যার অন্তরে ক্ষীণতর ঈমানও অবশিষ্ট আছে, তার কাছেও রাসূল (ছাঃ)-এর চেয়ে প্রিয়তর মানুষ আর কেউ নেই। এমনকি যে মুসলমান আমলের ধার ধারে না, সেও পর্যন্ত রাসূল (ছা.)-এর জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে। আর সেই মহা শ্রদ্ধার মানুষটিকে যখন কেউ হাসির খোরাক বানাতে চায় কিংবা অবমাননাকরভাবে উপস্থাপন করে, তখন তার অন্তরে কতটা আঘাত লাগে! কতটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়! পরিমাপ করা যায়! বাকস্বাধীনতার ফেরীওয়ালারা কি সেটা বোঝে না?

বোঝে। সবই বোঝে। আর এই বোঝার কারণেই ঠিক এই মুহূর্তে দুনিয়ার বহু দেশে সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ চালানো হ'লেও কোনটাই তাদের দৃষ্টি কাড়ে না। দৃষ্টি কাড়ে কেবল প্যারিসই। সমবেত হয় তারা প্যারিসেই। কেবলমাত্র এই সময়ই তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে 'জ্য সুই শার্লি'। এখানেই শেষ নয়, কাটা ঘাঁয়ে নুনের ছিটা দিতে সেই একই 'শার্লি এবদো' আবারও এক সপ্তাহ পর প্রকাশ করেছে রাসূল (ছা.)-এর ব্যঙ্গচিত্র। সেই সংখ্যার পাঠকচাহিদা এতই বেড়েছে যে, যে পত্রিকার প্রচারসংখ্যা ছিল ৬০ হাযার, তা নিমিষেই উপনীত হয়েছে ৫০ লাখে! সেই সংখ্যা ছাপানোর জন্য ফ্রান্স সরকারসহ বিভিন্ন জাতীয়-আন্তর্জাতিক সংস্থা দিয়েছে মোটা অংকের অনুদানও! এই তো হ'ল পশ্চিমা মানবাধিকারের নিকৃষ্ট নমুনা!

মেহেদী হাসান খেদ নিয়ে লিখেছেন, 'মুসলমানদের গায়ের চামড়া বোধহয় খৃষ্টান, ইহুদীদের চেয়ে মোটা হওয়ার আশা করা হয়। নতুবা কিভাবে রাসূল (ছা.)-এর ব্যঙ্গচিত্র ছাপিয়ে তুমি কামনা কর যে, মুসলমানরা এটা দেখে হাসবে বা মজা পাবে? তুমি কিভাবে দাবী কর যে, মুসলিম সমাজকে হাতে গোনা ক'জন চরমপন্থীকে (যারা কিনা তোমাদের কারণেই সৃষ্টি) বাকস্বাধীনতার প্রতি হুমকি হিসাবে ঘোষণা দিয়ে রাস্তায় নামতে, যখন এর চেয়ে আরও অনেক বড় হুমকি থেকে তোমরা চোখ সরিয়ে রেখেছ? (এই ফ্রান্সেই মুসলিম মহিলাদের নেকাব পরা এখনও নিষিদ্ধ এবং জরিমানাযোগ্য অপরাধ!)'।

বৃটিশ সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক তাঁর নিবন্ধে লিখেছেন, 'বাস্তবতা এটাই যে, এই অঘটনগুলো ঘটার পর মিডিয়ায় সবসময় বলা হয় 'হু এবং হাউ' অর্থাৎ 'কে ঘটিয়েছে এবং কিভাবে ঘটিয়েছে'। কিন্তু খুব কমই বলা হয় 'হোয়াই' অর্থাৎ কেন ঘটিয়েছে'। চরমপন্থী এবং ইসলামের প্রকৃত নীতি সম্পর্কে অজ্ঞ

দু'ভাইয়ের কাজকে আমরা সমর্থন করি না। কিন্তু তাদের এই কাজের পিছনে শার্লি এবদো'ই কি পরিষ্কারভাবে দায়ী নয়? পশ্চিমা সমাজব্যবস্থার এই নগ্ন দ্বিচারিতাই কি তাদের উসকিয়ে দেয়নি? তারা কি আদতে 'মতপ্রকাশের অধিকার'কে রোধ করার জন্যই আক্রমণ চালিয়েছিল? নাকি নবী (ছাঃ)-এর প্রতি অসম্মানে বিক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিশোধ নিতে গিয়েছিল? সুতরাং এই 'জ্য সুই শার্লি' শ্লোগান ভণ্ডামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

পশ্চিমারা এই বিকৃত 'বাকস্বাধীনতা'র বুলি কেবল মুসলমানদের বিরুদ্ধেই কপচায়। কিন্তু নিজেদের বেলায় তাদের কী ভূমিকা? 'উইকিলিকস'-এর সাংবাদিকদের ব্যাপারে তাদের পদক্ষেপ কী ছিল? ইয়েমেনের ড্রোন-বিরোধী সাংবাদিক আব্দুল্লাহ হায়দার শাইকে আটক করার জন্য কেন আমেরিকা আজ ইয়েমেন সরকারকে চাপ দিচ্ছে? গতবছরই গাযায় বহু সাংবাদিক নিহত হওয়ার পরও তারা টু-শব্দটি কেন উচ্চারণ করেনি? কেন এঞ্জেলা মার্কেলের জার্মানীতে হলোকস্টের বিরোধী কোন কথা উচ্চারণ করলে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়? কেন ডেভিড ক্যামেরনের ইংল্যান্ডে গণতন্ত্রবিরোধী মুসলিম ধর্মনেতাদেরকে টেলিভিশনে আসতে না দেয়ার জন্য সংসদে বিল তোলা হয়? কেন ইউরোপ-আমেরিকার দেশসমূহে ডা. জাকির নায়িক, ড. আবু আমিনা বিলাল ফিলিপসের মত খ্যাতনামা দাঈদেরকে প্রবেশাধিকার দেয়া হয় না? কেন 'শার্লি এবদো' নতুন সংখ্যা প্রকাশের দিনই তথা ২১শে জানুয়ারী ফ্রান্সের পুলিশ দিযোদন নামক এক কৌতুকাভিনেতাকে গ্রেফতার করল সাম্প্রদায়িক এবং ইহুদী বিদ্বেষী প্ররোচনার দায়ে? এইভাবে হাযারটা প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে 'বাকস্বাধীনতা'র ফেরিওয়ালাদের কাছে। যার কোন উত্তর তাদের কাছে নেই।

মার্কিন সাংবাদিক নোয়াম চমস্কি এই 'জ্য সুই শার্লি' হিপোক্রিসির এমন অনেকগুলো উদাহরণ টেনে লিখেছেন, 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-যেটা মূলতঃ 'আধুনিক যুগের সবচেয়ে চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদী প্রচারণা' (the most extreme terrorist campaign of modern times) এবং বারাক ওবামার বৈশ্বিক গুপ্তহত্যা অভিযান, যেটি ১১ই জানুয়ারী প্যারিস র‍্যালির দিনও নিয়োজিত ছিল সিরিয়া, ইয়েমেনের সাধারণ মানুষ হত্যায়; সেই দেশটিই কি-না মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্য র‍্যালিতে নামে? তারপর নিবন্ধের একেবারে শেষ বাক্যে লিখেছেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহবান জানিয়ে যে কথা বলা হচ্ছে যে, 'সন্ত্রাস সন্ত্রাসই, এর মধ্যে দ্বিতীয় কিছু নেই'-

এটা চূড়ান্ত অসত্য কথা। অবশ্যই এর মধ্যে দ্বিতীয় কিছু রয়েছে। সেটা হ'ল 'আমাদের সন্ত্রাস বনাম তোমাদের সন্ত্রাস'। অর্থাৎ পশ্চিমারা যে সন্ত্রাস চালাচ্ছে তার কোন বিচার নেই। কিন্তু অন্যরা সন্ত্রাস করলে তার বিচার হ'তে হবে।

এভাবেই প্যারিসের 'জ্য সুই শার্লি' র‍্যালিতে আর যা-ই হোক কোন শান্তি, মানবাধিকার, পরমতসহিষ্ণুতার বার্তা ছিল না। বরং তা পশ্চিমাদের ডাবল স্টান্ডার্ডকে আরো নগ্নভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। যার মধ্যে লুক্কায়িত আছে সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবাদ আর পরমতকে অশ্রদ্ধার লকলকে বিষাক্ত জিহ্বা। তাদের বিরাট সাফল্য যে তারা গোটা বিশ্বকে অন্ধ বানিয়ে তাদের ঔপনিবেশিক কালো ইতিহাসকে যেমন লুকিয়ে ফেলতে পেরেছে, ঠিক তেমনিভাবে আজও তাদের আসল চেহারাকে মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে রেখে বুক ফুলিয়ে সভ্যতার ঘোষণা দিতে পারছে।

শেষ কথা হ'ল, পাশ্চাত্যের এমন উসকানীমূলক কর্মকাণ্ডে আমাদের বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না। কোন রকম উগ্রবাদী ও চরমপন্থী কর্মে লিপ্ত হওয়া যাবে না। রাসূল (ছা.)-কে যে যত মন্দভাবেই চিত্রিত করুক না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তা কখনই রাসূল (ছা.)-এর উপর আরোপিত হয় না। একদল দুশ্চরিত্র শয়তানের কর্মকান্ডে রাসূল (ছা.)-এর সুমহান মর্যাদার কোনই ক্ষতি হয় না, তেমনি ইসলামেরও কিছু যায় আসে না। এজন্য **প্রথমতঃ** এদেরকে সম্ভবপর এড়িয়ে যেতে হবে, বিশেষতঃ এসব উস্কানীর পিছনে যখন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর গোপন এজেন্ডা কার্যকর রয়েছে। এ ব্যাপারে একটি হাদীছও বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। মক্কার জাহেলী আরবরা যখন রাসূল (ছাঃ)-কে ব্যঙ্গ করে কষ্ট দিতে চেয়েছিল, তখন তিনি তাদেরকে পাল্টা জবাব না দিয়ে অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত জবাব দিয়েছিলেন। তিনি ছাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলছিলেন, 'তোমরা কি দেখছ না আমার উপর কুরাইশদের নিন্দা ও অভিশাপকে আল্লাহ কিভাবে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন? তারা তো গালি দিচ্ছে 'মুযাম্মাম' তথা 'নিন্দিত'কে। আর আমি তো 'মুহাম্মাদ' তথা প্রশংসিত *(বুখারী হা/৩৫৩৩)*। অর্থাৎ তিনি এদেরকে স্রেফ এড়িয়ে গিয়েছিলেন। একটু ভাবলেই বোঝা যায় সভ্যতার সর্বোচ্চ নিদর্শন দেখিয়ে, নিজের সুউচ্চ মর্যাদায় এতটুকু আঁচড় কাটতে না দিয়ে কী অসাধারণভাবেই না তিনি এমন পরিস্থিতি সামাল দিয়েছিলেন! উম্মতের জন্য এই হাদীছটির চেয়ে উত্তম শিক্ষা আর কী হ'তে পারে! সুতরাং এই নিকৃষ্ট নরাধমদের দুর্গন্ধময় কর্মকাণ্ডকে বিন্দুমাত্র পাত্তা না দেয়াটাই হ'তে পারে এদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় জবাব।

দ্বিতীয়তঃ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব না হ'লে কড়া প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাতে হবে। কিন্তু তার প্রকাশভঙ্গিটা যেন অসংযত না হয়। প্রতিবাদের নামে আজকাল যা হয় অর্থাৎ পুলিশের সাথে সংঘর্ষ বাঁধানো, বোমাবাজি, ভাংচুর এবং প্রাণঘাতী কাজে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি একেবারেই অর্থহীন কাজ। এসবের বাইরে বৈধ সকল উপায়ে প্রতিবাদ করা যেতে পারে। সবচেয়ে উপযুক্ত হয় যদি মুসলিম সরকারগুলোর পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ জানানো যায় কিংবা আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যায়। সঊদী আরব সহ নেতৃস্থানীয় মুসলিম দেশগুলো যদি ঐক্যবদ্ধভাবে এসবের বিরুদ্ধে কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করত, তাহ'লে মানুষের অনুভূতি নিয়ে এই খেলা নিশ্চয়ই বন্ধ হ'ত। দুষ্কৃতিকারীরা এসব অপরাধ করার কোন সুযোগ পেত না। দুর্ভাগ্য আমাদের সামনে যোগ্য নেতৃত্ব নেই। মুসলিম দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানরা প্রায় সবাই আজ মেরুদণ্ডহীন নপুংসকের ভূমিকা পালন করছেন। ন্যায়ের পক্ষে একটি শক্ত কথা বলার ক্ষমতা পর্যন্ত তাদের নেই। তাদের অকর্মণ্যতার দরুণ আজ সংখ্যায় ১৬০ কোটি হয়েও ইসলামের অনুসারীদেরকে মাথা নত করে চলতে হচ্ছে। আল্লাহ আমাদের শাসকদেরকে সুমতি দান করুন। আমীন!

তৃতীয়তঃ ইসলামী আইনে এমন অপরাধীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। সুতরাং কোন মুসলিম দেশে এমন ঘটনা ঘটলে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সরকারকে অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে হবে। যদি তা না নেয়, তবে জনগণের কর্তব্য হ'ল সরকারকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা। তারপরও যদি সরকার ব্যবস্থা না নেয়, তবে সে জন্য সরকার দায়ী হবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলিম উম্মাহকে হেফাযত করুন! আমাদের সামনে যোগ্য নেতৃত্ব দিন। বাতিলের অন্যায় আক্রমণকে যথাযথভাবে মুকাবিলা করার শক্তি দিন এবং বাতিলের সামনে হকের ঝাণ্ডাকে উঁচু রাখার তাওফীক দান করুন- আমীন!

মূর্তি ও ভাস্কর্য সংস্কৃতি

বাংলাদেশে ভাস্কর্য সংস্কৃতির প্রসার মূলতঃ নতুন কোন বিষয় নয়। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই অফিস-আদালতে, বিনোদন পার্কে, রাস্তার মোড়ে কিংবা গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার সামনে আমরা মূর্তি ও ভাস্কর্য লক্ষ্য করে থাকি। এই সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ইসলামপন্থীদের ঘৃণা থাকলেও রাজপথে জোরালো প্রতিবাদ সম্ভবত শুরু হয় ২০০৮ সালে; যখন ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর গোলচত্বরে লালনের মূর্তি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সেসময় সারাদেশের ইসলামপন্থীরা ব্যাপক প্রতিবাদ জানান। তারা চাননি বিদেশীরা বিমানবন্দর থেকে বের হয়েই ৯০% মুসলিম অধ্যুষিত এই দেশকে একটি পৌত্তলিক সংস্কৃতির দেশ মনে করুক। শেষ পর্যন্ত তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাদের দাবীর মুখে পিছু হটে এবং লালনের ভাস্কর্য নির্মাণ থেকে বিরত থাকে। সেই সময় ভাস্কর্য ও মূর্তি পৃথক বস্তু-এমন ধারণার পক্ষে জনপ্রিয় লেখক হুমায়ুন আহমাদসহ কতিপয় বুদ্ধিজীবী লেখালেখি করেন, যা তথাকথিত সংস্কৃতিসেবীরা লুফে নেয় এবং ভাস্কর্য নির্মাণের পক্ষে অসার যুক্তিতর্ক শুরু করে।

এরপর ২০১৭ সালে হাইকোর্টের সামনে গ্রীক দেবী থেমিসের মূর্তি স্থাপন করা হ'লে একইভাবে সারাদেশে প্রতিবাদ ও নিন্দা জানানো হয়। সেবারও ইসলামী সংগঠনগুলোর অব্যাহত প্রতিবাদের মুখে সরকার অবশেষে মূর্তিটি সরিয়ে নেয়।

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর সংসদে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা প্রধানমন্ত্রীর প্রকাশ্য ঘোষণা ছাড়াই একপ্রকার নীরবে সারা দেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল ও ভাস্কর্য নির্মাণে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং সম্প্রতি একের পর এক এসব ভাস্কর্যের উদ্বোধনকাজ শুরু করে। এর প্রেক্ষিতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব কড়া প্রতিবাদ জানান এবং বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশ্যে একটি বিবৃতি প্রদান করেন, যা ২৫শে অক্টোবর ২০২০ দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত হয়। এছাড়া জুম'আর খুৎবা ও বিভিন্ন ভাষণে এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। অতঃপর ১৪ই নভেম্বর রাজধানীর ধোলাইপাড়ে বিশাল এলাকা জুড়ে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মাণের বিরুদ্ধে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এক বিরাট বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। এরপর থেকেই সরকারী মহলে বিষয়টি নিয়ে আবারও বাক্যবিনিময় শুরু হয়। সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী-এমপি বিষয়টি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিয়ে ওলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা শুরু করেন এবং আক্রমণাত্মক ভাষায় হুমকি-

ধমকি প্রদান করতে থাকেন। ফলে পরিস্থিতি চরমভাবে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন এলাকায় ওয়াজ-মাহফিলে বাধার সৃষ্টি করা হয় এবং ভাস্কর্য-মূর্তির বিরুদ্ধে কথা বলাকে অলিখিতভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। এরই মধ্যে ৪ঠা ডিসেম্বর দিবাগত রাতে কে বা কারা কুষ্টিয়া শহরে শেখ মুজিবের নির্মিতব্য ভাস্কর্য ভাঙচুর করে এবং এর দায় চাপানো হয় ভাস্কর্যবিরোধী আন্দোলনকারীদের উপর। সেই প্রেক্ষিতে হেফাজতে ইসলাম-এর আমীর মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী ও যুগ্ম মহাসচিব মামূনুল হকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করা হ'লেও শেষ পর্যন্ত তা আদালতে গৃহীত হয়নি। সর্বশেষ ১৪ই ডিসেম্বর ২০২০ শীর্ষস্থানীয় কওমী আলেমদের সাথে আলোচনায় বসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তিনি আলোচনার মাধ্যমে মতৈক্যে পৌঁছানোর ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সাম্প্রতিক মূর্তি ও ভাস্কর্য বিতর্কে যে বিষয়টি উঠে এসেছে তা হ'ল, মূর্তি বা ভাস্কর্য সংস্কৃতিকে এদেশের মুসলমানরা অন্তর থেকেই ঘৃণা করেন। আর এই বিরোধ কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং সম্পূর্ণ ঈমানী জায়গা থেকে। যার ফলে ক্ষমতাসীন সরকারী দলেরও একটা বড় অংশ এর বিরোধিতা করেছেন। অপরদিকে আলেম সমাজও স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের অবদানের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে যেভাবে নিয়ন্ত্রিত প্রতিবাদী ভাষা উপস্থাপন করেছেন এবং সরকারের সাথে আলোচনায় বসে সমাধানের চেষ্টা চালিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে সাধুবাদের যোগ্য। আমরা আলেমদেরকে সর্বদা এই ভূমিকাতেই দেখতে চেয়েছি, যেখান থেকে তারা প্রতিপক্ষ নন, বরং সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল অভিভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে আলেমদের এই ইতিবাচক মেলবন্ধনের মাধ্যমেই সমাজে প্রকৃত কল্যাণের দুয়ার উন্মুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ।

অপরদিকে মূর্তির পক্ষাবলম্বনকারীদের সীমাহীন অজ্ঞতা ও দ্বিচারিতা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, এদেশের ধর্মশিক্ষা কতটা অবহেলিত এবং সাধারণ শিক্ষিতদের মধ্যে ধর্মজ্ঞান কতটা নিম্নপর্যায়ের। ধর্ম সম্পর্কে প্রাথমিক পর্যায়ের জ্ঞান রাখা এসব মন্ত্রী-এমপি, মেয়রগণ যে হাস্যকর ভাষায় মূর্তি-ভাস্কর্যের পক্ষে কথা বলেছেন, যেভাবে উল্টা আলেমদেরকেই ধর্মশিক্ষা দেয়ার ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন, তা রীতিমত বিস্ময়কর ও অমার্জনীয় অপরাধ।

তারা দাবী করেছেন যে, মূর্তি ও ভাস্কর্য ভিন্ন বস্তু। ভাস্কর্যকে যদি পুজা না করা হয়, তবে তাতে শিরক হবে না। অথচ শিরকের উৎপত্তিই হয়েছিল সমাজের ভাল মানুষদের মূর্তি গড়া ও তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে। এজন্য ইসলাম শিরকের সমস্ত পথ ও পন্থাকে রুদ্ধ করে দিয়েছে এবং সকল প্রকার ছবি, মূর্তি, প্রতিকৃতি নির্মাণকারী ক্বিয়ামতের দিন সর্বাধিক শাস্তির অধিকারী

হবে বলে হুঁশিয়ার করেছে।

প্রশ্ন তোলা হয়েছে, বাংলাদেশে এর আগেও বহু ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে, অথচ তখন আপত্তি করা হয়নি। তাহলে এখন কেন করা হচ্ছে? আমরা বলব, ভাস্কর্য ও মূর্তি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কোন যুগের হকপন্থী আলেমই চুপ থাকতে পারেন না। সুতরাং অতীতেও প্রতিবাদ হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে যে বৃহত্তর পরিকল্পনা নিয়ে মূর্তি সংস্কৃতি বিস্তারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, তা অতীতের যেকোন সময়ের তুলনায় বহুগুণ ব্যাপকতর। সেকারণে প্রতিবাদও বৃহত্তর আকারে হয়েছে। সুতরাং এ নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টির অবকাশ নেই।

আমরা চাই, এদেশ থেকে কেবল শেখ মুজিবুর রহমানই নন, বরং জাতীয় নেতাদের নামে যত ভাস্কর্য রয়েছে, যত পশু-পাখি, জীব-জন্তুর ভাস্কর্য রয়েছে, সবই উৎখাত করতে হবে। শিরকের যাবতীয় অনুঘটককে বন্ধ করতে হবে। কেননা একজন মুসলিম কখনও পৌত্তলিকতার সাথে আপোষ করতে পারে না। কখনও তার হৃদয়ে মূর্তির মত জড়বস্তুর প্রতি ভালোবাসা স্থান নিতে পারে না। কখনও তার তাওহীদী চেতনায় শিরকের বু-বাতাস বইবার সুযোগ থাকতে পারে না। বরং মূর্তিপ্রীতির জাহেলিয়াতকে হৃদয়জগত থেকে সমূলে উৎখাত করার জন্যই ইসলাম।

এই সুযোগে বৃহত্তর আলেম সমাজের প্রতিও আমাদের আহ্বান, মূর্তি ও ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে যে তাওহীদী হুংকার তোলা হয়েছে, তা যেন কেবল একমুখী না হয়, বরং এদেশের কয়েক লক্ষ মাযার-খানকার বিরুদ্ধেও একইভাবে আওয়ায তুলতে হবে। কেননা ভাস্কর্যের কারণে যত মানুষ আজ ঈমান হারাচ্ছে, তার চেয়ে বহুগুণ মানুষ প্রতিনিয়ত ঈমানহারা হয়ে ফিরছে মাযার-খানকা থেকে। সুতরাং ভাস্কর্যের চেয়ে অনেকগুণ ভয়ংকর এই শিরক-বিদ'আতের আড্ডাখানাগুলোর বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করা উচিৎ। তাদেরকে উৎখাতের জন্য রাষ্ট্রের কাছে আমাদের দাবী তোলাও অতীব যরূরী। যদিও এ বিষয়ে অধিকাংশ আলেম যথারীতি নীরব ভূমিকা পালন করে আসছেন। এ ব্যাপারে তাদের সক্রিয় ভূমিকা একান্ত কাম্য।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে তথাকথিত সুশীলদের পক্ষ থেকে এই মূর্তি সংস্কৃতিকে মুক্তবুদ্ধির চর্চা বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে এবং একে স্বাধীনতা যুদ্ধের অর্জন হিসাবে দেখানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে। অথচ এটা সকলেরই জানা যে, পাকিস্তানের সাথে মুক্তিযুদ্ধ কোনক্রমেই ধর্মীয় বা আদর্শিক লড়াই ছিল না। বরং সেটা ছিল যালেমের বিরুদ্ধে মযলূমের যুদ্ধ। এদেশের মানুষ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের জন্য যুদ্ধ করেনি। বরং তাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল পাকিস্তানী শাসকদের যুলুম-শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে। শেখ মুজিব ছিলেন এই মাযলূম

জনগোষ্ঠীর রাহবার, যিনি এই যুলুমের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে হুংকার তুলে বাংলার মানুষকে স্বাধিকার আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। তিনি কখনও স্বাধীনতা যুদ্ধের মূলনীতি হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নির্ধারণ করেননি। সেটা করার কোন কারণও ছিল না। কেননা তিনি তো নিজেই ছিলেন নেতৃস্থানীয় মুসলিম লীগার, যিনি ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত-পাকিস্তান দেশভাগের পক্ষে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। একজন সাচ্চাদিল মুসলিম হিসাবে নিজেকে সবসময় পরিচিত করেছেন এবং মুসলমানদের স্বাধিকারের পক্ষে রাজনীতি করেছেন। তিনি স্পষ্টতই জানতেন যে, এই বাংলাদেশের জন্মসূত্র হ'ল ইসলাম। তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র পাতায় পাতায় যা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে।

মূলতঃ পূর্ববাংলার জনগোষ্ঠী যদি মুসলিম না হ'ত, তাহ'লে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলাদেশ নামক পৃথক রাষ্ট্রের জন্মই হ'ত না। বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবীতে যেসব আন্দোলন হয়েছে, তাতে কোথাও ধর্মনিপেক্ষতাবাদের কথা ছিল না। উনসত্তরের ছয়দফা দাবীতেও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সংবিধানের যে চারটি মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়, তাতে প্রথম এই মূলনীতিটি যুক্ত করা হয়, যা ছিল ভারতের চাপে। দেশের জনসাধারণের আদর্শ ও নৈতিক চেতনার সাথে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং এই মূলনীতি নিঃসন্দেহে এদেশবাসীর উপর অন্যায় ভাবে চাপিয়ে দেয়া, যাতে তাদের আদর্শিক মূল্যবোধকে নির্লজ্জভাবে পদদলিত করা হয়েছে। অতএব একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কখনই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল না। একথা আজ আমাদেরকে জনসম্মুখে বার বার স্পষ্ট করে বলতে হবে। নতুবা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে আমাদের যা প্রতিনিয়ত শুনানো হচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে আমাদেরকে ভয়ংকরভাবে প্রতারিত করবে এবং আমাদের জাতীয় ইতিহাসের চরম বিকৃতি সাধন করবে।

পরিশেষে বলব, আমরা আশাবাদী যে, বর্তমান সময়ে এদেশের আমজনতার মাঝে কিছুটা হলেও যে ধর্মীয় সচেতনতা বেড়েছে এবং তৃণমূল পর্যায়ে যেভাবে তাওহীদের শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ছে, তা নিঃসন্দেহে এদেশে দ্বীনী সংস্কৃতি বিস্তারের পথকে আরো বেশী এগিয়ে নেবে এবং পর্যায়ক্রমে খানকা-মাযারসহ শিরকের যাবতীয় শিখণ্ডীগুলোর বিরুদ্ধেও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ গড়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ। রাজনীতি, সংস্কৃতি কিংবা ধর্ম- যে সূত্রেই কোথাও শিরকের আড্ডাখানা গড়ে উঠুক না কেন, তার বিরুদ্ধে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গড়ে তুলতে হবে। রাজনৈতিক ভীতি হৌক কিংবা সামাজিক চাপ, কোন অবস্থাতেই যেন আমরা অন্যায় ও অসত্যের পক্ষাবলম্বন না করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন। আমীন!

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অব্যক্ত কান্না ও বিশ্ব সমাজের দায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে শুরু হয়েছিল যে অন্তহীন যাত্রা, তার শেষ দেখা হ'ল না আজ অবধি। বিগত ২০০ বছর ধরে মগ দস্যুদের বর্বরতার মুখে এক অদ্ভূত অজানার পথে অবিশ্রান্ত ছুটে চলেছে আরাকানের এই রোহিঙ্গা মানুষগুলো। পদে পদে সয়ে চলেছে আদিম গোত্রবাদ, বর্ণবাদ আর পাশবিক বর্বরতার নির্বিরাম খোঁচা। ভাবতে কষ্ট হয় যে, তারা আমাদের মতই মনুষ্য প্রজাতির অংশ। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাগর্বী বিশ্বে যেখানে গলির নেড়ি কুকুরের অধিকার সংরক্ষণে হাযারও সংগঠন বিদ্যমান, সেখানে জলজ্যান্ত মানুষ হয়ে তারা পশুর মত স্রেফ কচুকাটা হচ্ছে, তাবৎ বিশ্বকে নিশ্চল স্বাক্ষী রেখে।

১৭৯৯ সালে তারা প্রথম জীবনবাজি রেখে দলে দলে শরণার্থী হয়েছিল চট্টগ্রাম অঞ্চলে। তারপর আবারও ১৯৭৮, ১৯৯১, ২০১২, ২০১৬ সালে। প্রতিবারই মগেরা তাদেরকে পশুর মত হাঁকিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা করেছে। ১৯৮২ সাল থেকে তাদেরকে তো মিয়ানমারের নাগরিক হিসাবেই স্বীকার করা হয় না। তারপরও যেসকল ভূমিপুত্র বাপ-দাদার ভিটার মায়ায় মুখ বুজে থেকে গিয়েছে তারা যেন বাস করে আসছিল আসমানের নিচে পৃথিবীর উপরে সর্ববৃহৎ উন্মুক্ত কারাগারে। রোহিঙ্গাদের ভাষায় একই খাঁচায় ক্ষুধার্ত বিড়ালের সাথে ইঁদুরের বসবাসের বাস্তব প্রতিকল্প সে জীবন। কয়েক লক্ষ বনু আদম। আমাদের মতই অনুভুতিসম্পন্ন মানুষ। অথচ তাদের জীবনে ন্যূনতম স্বাধীনতা নেই, শিক্ষা নেই, আশা-ভরসা নেই, নেই নতুন দিনের হাতছানি। অবলা পশুর মত একঘেয়ে বয়ে চলা জীবন তাদের। রক্তের নদী, লাশের মিছিল, সম্ভ্রমহারার আর্তচিৎকার, ইয়াতীমের হাহাকার মিলে-মিশে এক মর্মন্তুদ শোকগাঁথা তাদের উপরকার আকাশ-বাতাস। সর্বশেষ আগ্রাসনে শেষ আশ্রয়স্থল সেই ভিটে-মাটিটুকুও তাদের হারিয়ে আসতে হল।

তাদের অপরাধ অনেক। তারা গরীব, খেটে খাওয়া মানুষ; তারা দেখতে অসুন্দর, কালো বর্ণের। তারা স্বাধীন জীবনের প্রত্যাশী। তারা যুলুম থেকে বাঁচতে আগ্রহী। তারা মানুষের মত বাঁচতে চায়। মানবিক অধিকার চায়। সবচেয়ে বড় অপরাধ তারা মুসলমান। যে অপরাধে ফিলিস্তীন, কাশ্মীর,

বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, কসোভো, ইরাক, আফগানিস্তান, সিরিয়া, ইয়ামানের নৃশংসতম গণহত্যাগুলো স্রেফ লাশের সংখ্যায় রূপ নিয়েছে, সেই একই অপরাধে অপরাধী রোহিঙ্গারাও। সুতরাং তাদেরকেও কেবল লাশের সংখ্যা গুণে যেতে হবে এবং আপন পালার অপেক্ষায় থাকতে হবে- এটাই ভবিতব্য। এখানেই লুকিয়ে আছে বিশ্বমোড়লদের নীরব উপভোগের রহস্য। দেশের জনৈক সেক্যুলার নিরাপত্তা বিশ্লেষক এএনএম মুনিরুযযামান রোহিঙ্গাদের বিষয়ে জাতিসংঘের দুর্বল অবস্থান দেখে কষ্ট হলেও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, 'তারা মুখে না বললেও এখানে একটি ধর্মীয় দিক আছে। অন্য ধর্মের হ'লে হয়তো প্রতিক্রিয়া ভিন্ন হ'ত'।

জাতিসংঘসহ অভিজাত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো নিজেদের আরোপিত এক কাঠামোবদ্ধ মানবাধিকার প্রচার করে থাকেন। তবে সেটা এতটাই সুনির্দিষ্ট পরিমাণে ও সুনির্দিষ্ট স্থানে যে, মানবাধিকার ধারণাটাই সেখানে কতটুকু অবশিষ্ট রয়েছে তা গবেষণার বিষয়। পুঁজিবাদী স্বার্থই সেখানে এক এবং একমাত্র সত্য। পুঁজির সুরক্ষায় যেখানে যতটুকু প্রয়োজন, তার ভিত্তিতেই ওঠানামা করে সেই মানবাধিকারের নিক্তি। ফলে তাতে মিয়ানমারের শত অপরাধও ধরা পড়ে না। আদিম বর্বরতায় শত শত গ্রাম পুড়ানো, শত-সহস্র নিরপরাধ মানুষের জীবন হরণের করার পরও সেটা যুলুম হিসাবে তো গণ্য হয়ই না; বরং প্রচার করা হয় পুঁজিপতি বিশ্বের 'আত্মরক্ষার অধিকার' হিসাবে। অপরদিকে যখন মাযলূমরা যুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, প্রতিবাদী হয়, নিজের মা-বোন হত্যা ও নির্যাতনের প্রতিকার চায়, তখন উল্টো তারাই হয় অপরাধী। কেননা তারা পুঁজির শত্রু। আর সেই শত্রু যদি মুসলমান হয়, তবে তো কথাই নেই। তাদের জন্য 'জঙ্গী বা সন্ত্রাসী' শব্দবন্ধ তো রেডিমেড প্রস্তুত আছেই। যুৎসই প্রয়োগের অপেক্ষাও করতে হয় না। নৃশংস গণহত্যা চালানোর পরও যখন প্রকাশ্যে মিয়ানমারের সমর্থনে এগিয়ে আসতে দেখা গেল ভারত ও চীনকে, তখন আর বোঝার বাকি রইল না পুঁজির কাছে মানবতা কত বড় অসহায়। বোঝা গেল কেন জাতিসংঘ মিয়ানমারের এত জঘন্য অপরাধের চিত্র প্রকাশিত হওয়ার পরও দ্বিধান্বিত এই বিষয়ে যে, একে 'গণহত্যা' বলা যাবে কি যাবে না কিংবা এটি 'জাতিগত নিধন' আখ্যা দেয়া ঠিক হবে কিনা।

সাবেক জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান কমিশন রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব প্রদান ও চলাফেরার স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু সেখানেও রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার নিশ্চিতের চেয়ে তার কাছে গুরুত্ব পেয়েছে

মৌলবাদ (র‍্যাডিকালাইজেশন) ঠেকানো! অর্থাৎ যতটুকু মানবিকতা দেখানোর সুফারিশ করেছেন তাও সরল মানবতার জন্য নয়, বরং পুঁজিপতি বিশ্বের স্বার্থ রক্ষার জন্য! সেই সাথে বছরের পর বছর রোহিঙ্গাদের ওপর চলা গণহত্যার জন্য দায়ীদের বিচারের কথা কোথাও বলা হয়নি কমিশনের রিপোর্টে। যেন গণহত্যাগুলো রোহিঙ্গাদের প্রাপ্য ছিল! এভাবে তথাকথিত বাকস্বাধীনতার বিশ্বে প্রাণ নিয়ে বাঁচার স্বাধীনতা পর্যন্ত যেখানে নেই, সেখানে মানবতা যে কত তুচ্ছ মূল্যের জিনিস তা আরও একবার বেরিয়ে এল।

বাংলাদেশের সেক্যুলার চেতনাজীবীদের একটা অংশ আবার একে ধর্মীয় সংঘাত হিসাবে মানতে নারায। তাদের জন্য এটা মেনে নেয়া কঠিন যে, মগ বৌদ্ধরা ধর্মীয় কারণে রোহিঙ্গাদের উচ্ছেদ করতে আগ্রহী। কেননা তাদের কাছে মুসলমান ব্যতীত পৃথিবীর আর সকলেই মানবতাবাদী, অসাম্প্রদায়িক এবং শান্তিবাদী। তাদের কাছে বরং রোহিঙ্গারাই সন্ত্রাসী, ইয়াবা ব্যবসায়ী, চোর-বাটপার। সে কারণেই বৌদ্ধরা তাদের ওপর আক্রমণ করেছে। অতএব তাদের একমাত্র চিন্তার বিষয় যে, পালিয়ে আসা রোহিঙ্গারা যেন দেশে ইয়াবার বিস্তার না ঘটায় এবং আইন-শৃংখলার অবনতি না ঘটাতে পারে। এভাবে এই শ্রেণীর মানবতাও এক বিকট মুনাফেকী চেতনার কাছে বন্ধকীকৃত।

মানবতার কল্যাণের জন্য পৃথিবীর সর্বোচ্চ মর্যাদাবান যে নোবেল শান্তি পুরস্কার, তাও এখন এক আতংকের নাম। কেননা যারা এই শান্তি পুরস্কার পাচ্ছেন, তারা অচিরেই অশান্তির নায়ক কিংবা পুঁজিপতিদের বরকন্দাজ হিসাবে আবির্ভুত হচ্ছেন। অংসান সুকি, বারাক ওবামা প্রমুখ তার বাস্তব প্রতিমূর্তি।

আধুনিক বিশ্বের এই স্বার্থবাদী ও প্রতারক মানবতাবাদের একটি প্রকৃষ্টতম উদাহরণ রোহিঙ্গা নির্যাতন। ২০০ বছর হয়ে গেল তাদের দুঃস্বপ্ন দেখার শুরু। আজও সে দুঃস্বপ্নের রাত কাটেনি তাদের জীবনে। প্রতিটি রাত তাদের জন্য আসে অতীত দুঃস্বপ্ন কাটিয়ে ভবিষ্যৎ দুঃস্বপ্নের আশংকা নিয়ে। আর কত প্রজন্ম ধরে চলবে রোহিঙ্গাদের ওপর এই বর্বরতা? আর কত মানবতার বুলি কপচানো হলে তারা ফিরে পাবে তাদের মানবীয় অধিকার?

কিছু প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : চারিদিকে ফিৎনা-ফাসাদ। মনে হয় সবাই যেন ইসলাম বিমুখ। এসব দেখে আমি প্রায়ই মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ি এবং আল্লাহর সাহায্য থেকে হতাশ হয়ে যাই। আমি কিভাবে এ মানসিক ত্রুটি কাটিয়ে উঠব? দ্বীনের উপর সার্বক্ষণিক অটল থাকতে আমার করণীয় কি?

এ ধরনের মনঃপীড়া, উদ্বেগ-পেরেশানীতে যুবকদের অনেকেই আক্রান্ত। এটা কেবল আল্লাহ সম্পর্কে দুর্বল ধারণা, অগভীর চিন্তা ও অন্তরের সংকীর্ণতারই ফলশ্রুতি। দুর্ভাগ্যজনক যে, বহু মুসলমান ইসলামকে তাদের পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকার তথা স্রেফ বাপ-দাদার ধর্ম মনে করে *(যুখরুফ ২৩)*। ফলে ইসলাম তাদের কাছে অনুসরণীয় আদর্শ নয়; বরং বংশীয় পরিচয় মাত্র।

মূলতঃ এ দ্বীন আল্লাহ্‌র শক্তি ও ইজ্জতের বদৌলতে চিরবিজয়ী। এর কোন পরাজয় নেই। কেননা মানবতার চূড়ান্ত বিজয় পরকালীন মুক্তিতেই নিহিত, দুনিয়াবী ক্ষমতা বা সম্পদের মাঝে নয়। বর্তমান বিশ্বপ্রেক্ষাপটে মুসলিম উম্মাহ যে জাগতিক শক্তিতে পিছিয়ে রয়েছে এটা কেবল তাদের ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণেই। মুসলিম হিসাবে আমরা শর্তগুলো পূরণ করতে পারলেই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত সাহায্য নেমে আসবে ইনশাআল্লাহ *(নূর ৫৫)*। বর্তমান অবস্থায় আল্লাহ নির্দেশিত পথ থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করে আমরা কিভাবে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করতে পারি?

বর্তমান বিশ্বের নানা ঘটনা মুসলিম বিশ্বের জন্য বিপদ ডেকে আনলেও বহু ইতিবাচক এবং ইসলামের জন্য কল্যাণকর বিষয়েরও সূচনা করেছে। বিগত বছরগুলোতে খৃষ্টান ও ইহুদী বিশ্ব মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে যেভাবে নিজেদের পুরনো হিংসাত্মক চেহারা উন্মোচন করেছে তাতে সারাবিশ্বে স্পষ্ট হয়ে গেছে আধুনিক সভ্যতার দাবীদারদের অসার বাগাড়ম্বরতা। ফলে একদিকে যেমন পশ্চিমারা নতুনভাবে ইসলামকে জানার চেষ্টা করছে এবং তাদের মাঝে ইসলাম গ্রহণের প্রবণতা পূর্বের চেয়ে অনেকগুনণ বেড়ে গেছে। অন্যদিকে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেও আলহামদুলিল্লাহ দ্বীনের প্রতি সচেতনতা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী জাগ্রত হয়েছে। অতএব আল্লাহর সাহায্য থেকে হতাশ হওয়ার

কারণ নেই *(হিজর ৫৫-৫৬)*। বস্তুতঃ প্রকৃত সত্যের পথে ধাবমান একজন মু'মিন সবসময়ই বিজয়ী *(আলে ইমরান ১৩৯)*।

আর দ্বীনের প্রতি দৃঢ়কদম হওয়ার জন্য প্রাথমিক শর্ত হ'ল ইসলামের দিকে পুরোপুরি ফিরে আসা এবং চলার পথকে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী পরিশুদ্ধ করা। এর সাথে প্রয়োজন নিজেকে সার্বক্ষণিক অনুশীলনের মধ্যে রাখা। নিয়মিত অনুশীলন ছাড়া কোন চাওয়াকেই বাস্তবায়ন করা যায় না। নিম্নে কিছু করণীয় উল্লেখ করা হ'ল।-

১- সিজদার সময় একান্তে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চান। রাসূল (ছাঃ) এ ধরনের পেরেশানীর অবস্থায় এ দো'আ পড়তেন يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك বা يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك 'হে অন্তরের পরিবর্তনকর্তা! আমাদের অন্তরকে তুমি তোমার আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯)*।

২- সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করুন *(মু'মিন-৫৫)*। সকাল-সন্ধ্যায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করুন *(রা'দ-২৮)*। রাত-দিনের মাসনূন দোআ'গুলো মনে করে পড়ুন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমার জিহ্বা যেন সবসময় আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকে *(মিশকাত হা/২২৭৯)*।

৩- আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ও বড়ত্বকে স্মরণ করুন। আল্লাহর দৃশ্যমান ও অদৃশ্য নিদর্শনাবলীকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করুন *(বাক্বারা-১৬৪)*। দিনে দশ সেকেন্ডের জন্য হলেও আল্লাহর স্মরণে চোখ বন্ধ করে উর্ধ্বলোকে বিচরণ করুন।

৪- ছাহাবা ও সালাফে ছালেহীনের জীবনেতিহাস পাঠ করুন। তাদের আল্লাহর রাস্তায় অটল থাকার হিম্মত ও মহিমাকে অন্তরে গেঁথে নিন।

৫- ছালাতকে খুশু-খুযূ সহকারে তার পরিপূর্ণ হক আদায় করে পড়ুন, ঠিক যেভাবে রাসূল (ছা.) দেখিয়ে দিয়েছেন। ছালাতের মাঝে যে অনন্যসাধারণ পবিত্রতা, ইতিবাচক প্রভাব এবং হৃদয়ের প্রশান্তি রয়েছে তা কেবল যথার্থভাবে আদায়কারীই অনুভব করতে পারে।

৬- ছাদাকা করুন বিশেষতঃ গোপনে, যাতে রিয়ার কোনই সুযোগ না থাকে *(বাক্বারাহ ২৭১)*। মনের উপর এর যে বিরাট প্রভাব রয়েছে তা কেবলমাত্র দাতাই অনুভব করতে পারেন।

৭. সমাজকল্যাণমূলক কাজে মনোনিবেশ করুন। মানুষকে বিপদ-আপদে সহযোগিতা করুন। সৎকাজের জন্য উৎসাহিত করুন। অসৎকাজ দেখলে সাধ্যমত নিষেধ করুন। উত্তম বন্ধুদের সাহচর্যে থাকুন। সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ ফিরে আসলে আপনি নিজেকে অন্যরূপে আবিষ্কার করবেন।

৮. সর্বোপরি পরকালীন চিন্তাকে সবসময় অগ্রাধিকার দিন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার সব চিন্তাকে আখেরাতমুখী করবে, আল্লাহ তার দুনিয়াবী চিন্তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াবী চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকবে, সে কোথায় ধ্বংস হয়ে গেল সে ব্যাপারে আল্লাহ কোন যিম্মাদারী নিবেন না' (*ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/২৬৩*)।

এভাবে নিজেকে জাগ্রত রাখতে পারলে আপনার মানসিক অস্থিরতা দূর হবে এবং সৎআমলের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ *(শূরা ২৩)*। আল্লাহর বান্দা হিসাবে নিজেকে মর্যাদা দিন *(বনী ইসরাঈল-৭০)*। এতে অন্তরে অপার্থিব এক পবিত্রতা, এক সুস্থির প্রশান্তি অনুভব করবেন যা আপনাকে ন্যায় ও কল্যাণের উপর দৃঢ় রাখবে *(নূর ৩৫)*। সাথে সাথে পাপকাজগুলো একে একে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করুন। সৎআমল বেশী বেশী করার মাধ্যমে পাপ কাজের মানসিকতা দুরীভূত হয়ে যায় *(হূদ ১১৪)*। অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন বিনোদনে সময় নষ্ট করা থেকে সতর্কতার সাথে নিজেকে বিরত রাখুন। নতুবা শয়তানের প্ররোচনায় আপনার আমল ধীরে ধীরে শিথিল হতে থাকবে *(নূর ২১)*। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের উপর অটল রাখুন এবং যাবতীয় অকল্যাণ থেকে হেফাজত করুন। আমীন!

প্রশ্ন : আমি বর্তমানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র । পাঁচ বছর পূর্বে আমি যাবতীয় পাপকাজ থেকে তওবা করে আল্লাহর অশেষ রহমতে দ্বীনের প্রতি পূর্ণভাবে অবিচল থাকার চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমি দাড়ি রেখেছি এবং ইসলামী আদব-কায়দাগুলো রপ্ত করেছি। কিন্তু দুঃখজনক হলো আমার পরিবার, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব আমার এই পরিবর্তনকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে এবং অনেকে আমাকে উপহাস করে। আমার করণীয় কী?

আপনাকে মুবারকবাদ জানাই দ্বীনের পথে ফিরে আসা এবং তার উপর অটলভাবে টিকে থাকার দৃঢ় মানসিকতা অর্জনের জন্য। আল্লাহ আপনাকে দুনিয়া ও আখিরাতে যথাযোগ্য মর্যাদায় ভূষিত করুন। আপনি আপনার নিকটজনদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে উপহাসের শিকার হয়েছেন তা দ্বীনের পথের পথিকদের জন্য অতি স্বাভাবিক একটি

বিষয়, যা থেকে নবী-রাসূলগণ ও তাদের অনুগামীগণ কেউই পরিত্রাণ পাননি। পৃথিবীবাসীর জন্য সর্বোত্তম আদর্শ হওয়া সত্ত্বেও নবী-রাসূলদের এমন একজন ছিলেন না যিনি স্বীয় কওমের দ্বারা লাঞ্ছিত হননি। এমনকি সাধারণভাবে পৃথিবীর অধিকাংশ জ্ঞানী-মনীষীদেরকে এ ধরনের অভিজ্ঞতা বরণ করতে হয়েছে। অতএব এতে কষ্ট নেয়া যাবে না। আপনি সর্বোচ্চ কল্যাণের পথে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন, ভ্রষ্টতা তথা শয়তানের পথ পরিহার করে ছিরাতে মুস্তাকীম তথা আল্লাহর পথে যাত্রা শুরু করেছেন, এটাই আপনার জন্য মহাসৌভাগ্যের বিষয়। এ পথে আপনার সামনে বহু বাধা-বিপত্তি আসবে।

মুমিনদের প্রতি কাফিরদের এরূপ উপহাসের বিবরণ তো পবিত্র কুরআনেই এসেছে, 'যারা অপরাধী তারা মুমিনদের দেখে উপহাস করত। তারা যখন তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতো তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করত। পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাওয়ার সময়ও তারা হাসাহাসি করত। মুমিনদেরকে দেখে তারা বলত, এরা তো নিশ্চিতভাবে পথভ্রষ্ট' *(তাত্বফীফ ২৯-৩১)*। আর আল্লাহও বলেছেন যে, তিনি নিজেই তাদের প্রতি পরিহাসকারী এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশদানকারী, যাতে তারা সীমালংঘনে মত্ত হয়ে থাকতে পারে *(বাক্বারা ১৪-১৫)*। অতএব তাদের মূর্খতা ও অজ্ঞতাকে গুরুত্ব না দিয়ে কুরআনের ভাষায় তাদেরকে 'সালাম' বলে নম্রতার সাথে এড়িয়ে চলুন *(হূদ ৬৯, ফুরক্বান ৬৩, ক্বাছাছ ৫২)*। কেননা তারা তো শয়তানের ফেরেবে পড়ে স্বীয় প্রবৃত্তির পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে যেখান থেকে আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করেছেন।

সুতরাং তাদের সাথে নম্র ও রহমদিল হয়ে কথা বলুন। উদ্ধত আল্লাহদ্রোহী ফেরাউনের সাথে নবী মূসা ও হারুণ (আঃ)-এর বিনম্র আলাপচারিতা থেকে শিক্ষা নিন। তবে এসব পরিস্থিতিতে অবশ্যই নিজেকে দুর্বল ও অপমানিতভাবে উপস্থাপন করবেন না। প্রয়োজনে কঠোর হবেন। যেভাবে রাসূল (সাঃ) কা'বা ঘরে কাফিরদের ক্রমাগত বিদ্রুপবাণে অতিষ্ঠ হয়ে হঠাৎ একদিন তীব্র ক্রোধ প্রকাশ করেন, যা ছিল কাফিরদের কাছে বজ্রপাত সমতুল্য। এতে তারা ভীত ও লজ্জিত হয়ে স্থান ত্যাগ করেছিল। সুতরাং সংশোধনের উদ্দেশ্যে এসব অজ্ঞদের প্রতি সাময়িক কঠোরতা প্রকাশ করতে পারেন।

এছাড়া তাদের প্রতি আপনার কিছু কর্তব্য রয়েছে। যেমন- (১) আন্তরিকভাবে সদুপদেশ দেয়া। (২) উপহার সামগ্রী দেওয়া বা বাড়িতে দাওয়াত করা যাতে তাদের অন্তরের পীড়া দূরীভূত হয়। (৩) প্রয়োজনীয় বই পড়তে দেওয়া। (৪)

সবসময় তাদের জন্য আল্লাহর নিকট হেদায়াত প্রার্থনা করা। (৫) দ্বীনী বৈঠকসমূহে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

এভাবে আল্লাহ হয়তো আপনার মাধ্যমে তার জন্য হেদায়াতের পথ খুলে দিবেন। যার চেয়ে কল্যাণকর কোন বিষয় আপনার ও তাদের জন্য কিছুই হ'তে পারে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যদি আল্লাহ তোমার মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে হেদায়াত লাভ করান তবে তা তোমার জন্য লাল উটের (অতি মূল্যবান জিনিস) চেয়েও উত্তম হবে' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৬০৮০)*। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের দ্বীনের উপর দৃঢ়চিত্তভাবে কায়েম থাকার তাওফীক দিন এবং পথভ্রষ্টদেরকে পথপ্রদর্শন করুন। আমীন!

প্রশ্ন : সংগঠন কি? একজন সংগঠকের বৈশিষ্ট্য ও কর্তব্য কি?

সংগঠন শব্দটির আরবী প্রতিশব্দ হলো الجماعة যা তিনের অধিক একত্রিত বা সমন্বিত কিছুকে বুঝায়। অর্থাৎ সমন্বিতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে কোন কার্যক্রম পরিচালনার নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়াই হ'ল সংগঠন। মানুষ স্বভাবতঃই একাকী জীবনযাপন করতে পারে না। সামাজিক বা সামষ্টিক জীবন যাপনই তার চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীর মাঝে এই মৌলিক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছেন। সংগঠন হ'ল এই ব্যক্তিসমষ্টির একটি আনুষ্ঠানিক কাঠামো। একটি পরিবার যদি হয় ক্ষুদ্র সংগঠন তবে রাষ্ট্র হ'ল তার সর্ববৃহৎ রূপ। সীমিত অর্থে তাই প্রতিটি মানুষই এক একজন সংগঠক। কোন একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রয়োজনীয় নীতিমালার আলোকে সামষ্টিকভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করাই একটি সংগঠনের কাজ। সংগঠক হ'ল এই সংগঠনের মূল প্রাণ যার কর্তব্য হ'ল সংগঠনকে সুষ্ঠু ও সুশৃংখলভাবে পরিচালনা করা।

সংগঠকের ভূমিকার উপরই নির্ভর করে একটি সংগঠনের গতি-প্রকৃতি। তার পরিচালনা নীতিই নির্ধারণ করে দেয় সংগঠনের গন্তব্যপথ। তাই সংগঠনে সংগঠকের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। একজন সংগঠকের সাধারণ কিছু কর্তব্য হ'ল-

১. সংগঠনের লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা। লক্ষ্যকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হ'লে অথবা লক্ষ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে সংগঠক সংগঠনের জন্য কাংখিত ফলাফল নিয়ে আসতে নিশ্চিত ব্যর্থ হবে।

২. লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অটল মানসিকতা পোষণ করা। জ্ঞান, বিদ্যাবত্তা, কর্মদক্ষতা ইত্যাদি বিষয় যরূরী হ'লেও একটি সুস্থ ইতিবাচক

মানসিকতাই একজন সংগঠকের প্রধান সম্পদ যে মানসিকতার বদৌলতে সে সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে ধৈর্য ও সাহসের সাথে মোকাবিলা করে জনসমষ্টিকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে অবিচল থাকে। স্বার্থের টান, বিপদের হুমকি, অপ্রাপ্তির হতাশা তাকে কুণ্ঠিত করে না। ব্যর্থতার গ্লানিকে অতিক্রম করে সম্ভবনার নতুন দুয়ার উন্মোচনের দৃঢ়চিত্ততা তাকে একমুহূর্তের জন্যও লক্ষ্য অর্জনে পিছপা করে না।

৩. নিয়ন্ত্রণাধীন বলয়কে একটি পরিবার, একটি টীম বা একটি রাষ্ট্রের মত মনে করা; যার প্রতিটি অঙ্গকে সংগঠক সমানভাবে একই লক্ষ্যে পরিচালিত করে। একজন অনুঘটক, একজন প্রণোদনাদাতা হিসাবে প্রত্যেকের মাঝে সে কর্তব্যের চরম তৃষ্ণাবোধ জাগিয়ে দেয়। কাংখিত লক্ষ্যে উজ্জীবিত করে সে লক্ষ্য অর্জনে প্রত্যেকের মাঝ থেকে সর্বোচ্চটুকু বের করে আনার প্রয়াস চালায়। সংগঠক একদিকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয়; অপরদিকে পিছনে থেকে নিয়ন্ত্রণের লাগামটি সচেতনভাবে দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসের সাথে ধারণ করে থাকে।

৪. নির্ভরতার প্রতীক হিসাবে মমতাপূর্ণ সহনশীলতা, উদারতা ও সহমর্মিতা অবলম্বন করা। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে বিশৃংখল জনগোষ্ঠীকে একটি কেন্দ্রীয় শক্তির অধীনে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা তার কর্মনীতির মূল বৈশিষ্ট্য।

৫. নিজের প্রতি, সমাজের প্রতি চেতনাপূর্ণ দায়িত্বশীলতা থাকা। দায়িত্বপরতার কঠিন সংগ্রামে সে আপন বলয়কে এমন এক বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে যাকে ইচ্ছা করলেই এড়ানো যায় না। সনিষ্ঠ দায়িত্ববোধ, নির্ভুল কর্তব্যপরায়ণতা তাকে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রতি মুহূর্তে তৎপর রাখে।

মোটকথা সার্বক্ষণিক লক্ষ্যে অবিচল থাকা, ইতিবাচক মানসিকতা বজায় রেখে অভিষ্ট লক্ষ্যে জনগোষ্ঠীকে সম্মুখপানে অগ্রসর রাখা এবং প্রতিটি সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গন্তব্যে পৌছানোর আপ্রাণ চেষ্টা করাই একজন প্রকৃত সংগঠকের মূল বৈশিষ্ট্য।

উত্তম চরিত্রগুণ, সার্বজনীন ভালবাসাবোধ, সদাচরণ, অকপট সারল্য, কর্তব্যনিষ্ঠা, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ, সৎসাহস, নিজ অধিকারের ব্যাপারে ক্ষমা, মার্জনা ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা এবং অপরের অধিকার প্রদানে সর্বোচ্চ যত্নবান হওয়া ইত্যাদি মহৎগুণগুলো একজন সংগঠককে মানবসমাজে বিশেষভাবে স্থান করে দেয়।

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি আক্বীদায়ে সালাফ ও মানহাজে সালাফের মধ্যে পার্থক্য করে থাকেন। ফলে দেখা যায় তারা সালাফী আক্বীদাসম্পন্ন হলেও প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদের অনুসারী দলের সাথে সম্পৃক্ত, অথচ কার্যক্ষেত্রে মতবাদগুলোর সাথে সালাফে ছালেহীনের মানহাজের বৈপরীত্য রয়েছে। প্রশ্ন হল, সালাফী মানহাজ বাস্তবায়ন করার জন্য আক্বীদায়ে সালাফের সাথে মানহাজে সালাফ অনুসরণ করাও কি সমভাবে অপরিহার্য?

আক্বীদায়ে সালাফ ও মানহাজে সালাফ পৃথক কিছু নয়। দু'টিরই অনুসরণ করা অপরিহার্য। ব্যবহারিক অর্থে মানহাজ আক্বীদার চেয়ে ব্যাপকতর (আম) শব্দ। আক্বীদা হ'ল অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাসকেন্দ্রিক, আর মানহাজ হ'ল দৃশ্যমান জগতকেন্দ্রিক। মানহাজ শব্দটি আক্বীদা (মৌলিক বিশ্বাস), সুলূক (আচরণবিধি), আখলাক (চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য), মু'আমালাত (পারস্পরিক সম্পর্ক ও ব্যবসায়িক লেনদেন) অর্থাৎ একজন মুসলমানের বাস্তব জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপকে পরিবেষ্টন করে। আর আক্বীদা হ'ল ঈমান ও কালেমায়ে শাহাদতের ভিত্তিমূল এবং এ দু'টির মধ্যেই আক্বীদার সীমানা পরিব্যাপ্ত। সুতরাং বলা যায়, আক্বীদা ও মানহাজ শব্দদ্বয় একই জীবনব্যবস্থার দু'টি পৃথক শাখার নাম, একটি বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত, অপরটি আমলের সাথে সম্পৃক্ত। ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রেখে একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই বা করা সম্ভব নয়।

আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী এ সংক্রান্ত একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁর ইবাদতের ক্ষেত্রে মানহাজ ও আক্বীদার সমঅবস্থান ও পৃথক অবস্থান উভয়ই বিদ্যমান। সাধারণভাবে আক্বীদা মানহাজের চেয়ে সুনির্দিষ্ট ও স্বল্প পরিসরের শব্দ। ওলামায়ে কেরাম আক্বীদা শব্দটিকে 'তাওহীদের ইলম'-এর সাথে সংযুক্ত করেছেন, যা ইসলামের মৌলিক বিষয়বস্তু। আর মানহাজ শব্দটি আক্বীদা বা তাওহীদের চেয়ে ব্যাপকার্থক শব্দ। কিন্তু যারা এখানে পার্থক্য করতে চাইছেন তাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন। তারা মূলত দাওয়াতের ময়দানে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করতে চান যা সালাফে ছালেহীনের নীতিবিরোধী, যেমন তারা হয়ত তথাকথিত গণতন্ত্র বা সামাজিক ন্যায়বিচার বা অনুরূপ কিছু প্রতিষ্ঠার কথা বলবেন। যার অর্থ তারা অবিশ্বাসী, কাফেরদের নীতি-পদ্ধতিকে অনুসরণ করার অনুমতি চান। এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হ'ল, সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের জন্য যে শরী'আত দান করেছেন তার মাধ্যমে আক্বীদা ও মানহাজের মধ্যে পার্থক্য করা এবং কাফিরদের নীতি-বিধানের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষ হয়ে

গেছে। সেসব বিধান হয়ত কাফিরদের জন্য উত্তম। কেননা তাদের এমন কোন শরী'আত নেই যার দ্বারা তারা পরিচালিত হবে। কিন্তু কোন মুসলিমের জন্য তা অনুসরণ করার বৈধতা নেই। সুতরাং একজন মুসলিমের জন্য সালাফে ছালেহীনের আক্বীদা পোষণ করা যেমন অপরিহার্য কর্তব্য, তেমনি তাদের অনুসৃত মানহাজ অনুসরণ করাও সমভাবে অপরিহার্য *(মাজাল্লাতুছ আছালাহ, ২২তম সংখ্যা)*।

অনুরূপই অনেকে বলে থাকেন যে, যেহেতু আমাদের আক্বীদা এক, সেহেতু আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, হোক না আমাদের মানহাজ ভিন্ন। এর জবাব কী হবে? শায়খ তারাহীব আদ-দাওসারী এর উত্তরে বলেন, বিষয়টি সাধারণ। মূলত আক্বীদা ও মানহাজ একই জিনিস; বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। যার মানহাজ সঠিক তার আক্বীদাও অবশ্যই সঠিক। যার মানহাজে গলদ রয়েছে তার আক্বীদাতেও গলদ রয়েছে। উদাহরণতঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হ'ল, আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীকে অবিকলভাবে সত্যায়ন করা এবং একজন পাপীকে শুধুমাত্র তার পাপের জন্য কাফির সাব্যস্ত না করা। এ বিষয়টি আক্বীদা ও মানহাজ উভয়ের সাথেই সম্পৃক্ত। সুতরাং এক্ষেত্রে কারো মানহাজ যদি ভিন্ন হয় তাহলে এটা বলার উপায় নেই যে, তার আক্বীদা বিশুদ্ধ এবং কুরআন-সুন্নাহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অনুরূপভাবে সেই ব্যক্তি যে একজন ছূফী এবং সে ইবাদতে আল্লাহ্র সাথে এমন কাউকে শরীক করে, যা আল্লাহ তার জন্য বৈধ করেননি। সুতরাং কেউ যদি সুন্নী হয় তবে সে ছূফী হতে পারে না, আবার ছূফী হ'লে সুন্নী হ'তে পারে না। অর্থাৎ একজন ছূফীর মানহাজ সুন্নী থেকে পৃথক হওয়ার সাথে সাথে আক্বীদাও পৃথক। সুতরাং আক্বীদার মিল থাকলেই যথেষ্ট, মানহাজের ভিন্নতা কোন সমস্যা নয়-এ চিন্তা ভুল এবং বাস্তবতার বিপরীত (*মানহাজ ডটকম*)।

সুতরাং ইসলামের সত্য ও সঠিক রূপকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করতে সালাফে ছালেহীনের আক্বীদা ও মানহাজ উভয়টিই সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করতে হবে। এটাই সঠিক ও চিরন্তন নীতি। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর প্রেরিত পথ অনুসরণ ও তার উপর অটল থাকার তাওফীক দান করুন- আমীন!!